সাহিত্য প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

শ্রীকালিদাস রায়

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

—পাঁচ টাকা—

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬
হইতে শ্রীবিজয়কুমার মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত

অধ্যাপক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

করকমলেষু—
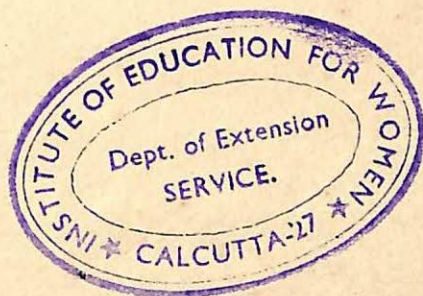
ভূমিকা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ সাহিত্যবিচারমূলক প্রবন্ধের সংকলন। দ্বিতীয় সংস্করণ দুই খণ্ড একত্র মুদ্রিত হইল। এই সংস্করণে সংকলনে কিছু যোগবিয়োগ হইয়াছে। ইতি

সন্ধ্যার কুলায়
টালিগঞ্জ

শ্রীকালিদাস রায়

সূচীপত্র

সাহিত্য-প্রসঙ্গ

প্রবন্ধসাহিত্য

বক্তব্যবিষয়ের যুক্তিমূলক বিবৃতি মাত্রই যে সাহিত্য নয়, একথা বাঙ্গালা গদ্যের শৈশবাবস্থার লেখকগণও বুঝিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় কেবল কবি ছিলেন না, বর্তমানযুগের গদ্য সাহিত্য-ধারার সূত্রপাত তাঁহার প্রভাকর হইতেই। গুপ্তকবি শব্দালঙ্কারের ঘটা ও ছটার দ্বারা সর্ববিধ বক্তব্যকে সাহিত্যে রূপান্তরিত করিতে চাহিতেন।

লোকশিক্ষক মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় নানা বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিতেন, তিনি কোন বিশিষ্ট সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই ; কিন্তু তিনিও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রবন্ধকেও সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিতে পারা যায় এবং বক্তব্যবিষয় তাহাতে সরস ও অক্ষয় হইয়াই উঠে। তাঁহার 'স্বপ্নদর্শন' পর্যায়ের নিবন্ধগুলি এই সাহিত্যবুদ্ধির ফল। তাঁহার সময়ের শিক্ষিতসম্প্রদায় ও তাহাদের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নদর্শনের ছলে রূপকের সাহায্যে মন্তব্য প্রকাশ করিলে তাহা সরস সাহিত্য হইয়া উঠিবে, ইহাই তিনি বুঝিয়াছিলেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের' লেখকের বিচারমূলক প্রবন্ধকে সাহিত্যে রূপদানের প্রয়াস স্বপ্নদর্শন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৌলিক সাহিত্যরচনার প্রয়াস বিশেষ ছিল না। 'সাহিত্য' কাহাকে বলে তাহা তিনি ভালো করিয়াই বুঝিতেন,—বুঝিতেন বলিয়াই ঈসপের রূপকাশ্রিত সাহিত্যের অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের দুই-খানি উৎকৃষ্ট নাটককে বাংলাগদ্যে রূপদান করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ-সাহিত্য-রচনার জন্যই তাঁহার প্রতিষ্ঠা নহে। ভাষাগঠনের মহাশিল্পী বিদ্যাসাগর ভাষাকে প্রবন্ধসাহিত্যগঠনের উপযোগী করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

"সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে। জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলাগদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত

করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা, অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন।"

সে যুগের লেখকদের রচনা পড়িলে মনে হয়—তাঁহাদের অনেকে বোধ হয় শব্দাড়ম্বর ও বাক্যের শাব্দিক ঐশ্বর্যকে সাহিত্যের প্রধান অঙ্গস্বরূপ মনে করিতেন। সাধারণ চিরপরিচিত সহজ কথাকে স্থূলভ অলঙ্কারে ভূষিত ও শব্দঘটায় দীর্ঘায়ত করিয়া তাই তাঁহারা সাহিত্যের রূপ দিতে প্রয়াস পাইতেন।

কাদম্বরীর অনুবাদক তারাশঙ্করও বিদ্যাসাগরকেই অনুসরণ করিয়াছেন। ইঁহাদের রচনায় যতটুকু সাহিত্য তাহা অনূদিত সাহিত্যের মূলরূপ হইতেই সঞ্চারিত।

বঙ্কিমচন্দ্র বেশ ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন—সরস করিয়া না বলিতে পারিলে কোন বক্তব্যই সাহিত্যের রূপ ধরে না। তিনিই সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষাকে আসল সাহিত্যের কাজে লাগাইলেন। বঙ্কিমবাবু অবশ্য আপনার সকল বক্তব্য, মন্তব্য ও সিদ্ধান্তকেই সাহিত্যের রূপ দেন নাই,—সকল ক্ষেত্রে তাহা সম্ভবও হয় নাই।

বঙ্কিমবাবু তাঁহার বক্তব্যকে নবনব ভঙ্গীতে সরস করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার ভঙ্গীগুলির এখানে সামান্য আভাস দিই।

১। কমলাকান্তের দপ্তরের ভঙ্গী। এই ভঙ্গী যেমন সরস তেমনি অপূর্ব। বঙ্গসাহিত্যে কৌতুক-বুদ্ধির (wit) প্রয়োগে রসময়ী ব্যঞ্জনাময়ী ভঙ্গীর ইহা নব-প্রবর্তন।

২। 'গগন-পর্যটনে'র ভঙ্গী। বিজ্ঞান-রহস্য ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মত রসলেশশূন্য বিষয়কে সরস করিয়া লিখিবার এই ভঙ্গী বঙ্কিমের প্রবর্তিত।

৩। দুরূহ তত্ত্বকথাকে সরস সাহিত্যের রূপ দেওয়ার জন্য 'গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলিতে' ও ধর্মতত্ত্বে তিনি কথোপকথনের ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন।

৪। রাজনীতি ও সমাজ-তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নিবন্ধে কৌতুকরসে হৃদ্য করিয়া বক্তব্য-প্রকাশের ভঙ্গী বঙ্কিমেরই প্রবর্তিত।

৫। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের উপযুক্ত নিবন্ধকেও তিনি সরস সাহিত্যের রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'বৃষ্টি'-নামক নিবন্ধের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

৬। তিনি যে ব্যঙ্গরসাত্মক ভঙ্গীতে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের ভারতবর্ষীয় গবেষণা

ও ঐতিহাসিক সত্যাবিষ্কার-চেষ্টার সমালোচনা করিয়াছেন তাহাও সাহিত্যের রূপ ধরিয়াছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বের গদ্য-রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত এখানে উল্লেখযোগ্য—

"তখনকার বাংলা গদ্যে সাধু ভাষার অভাব ছিল না, কিন্তু ভাষার চেহারা ফোটে নাই। তখন যাঁহারা মাসিকপত্রে লিখিতেন, তাঁহারা গুরু সাজিয়া লিখিতেন, এইজন্য পাঠকদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন নাই।"

বলা বাহুল্য গুরুসম্মিত বা প্রভুসম্মিত ভঙ্গী সাহিত্যের ভঙ্গী নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিপরম্পরাকে প্রাধান্য দিয়া বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলিকে আমরা সাহিত্যের পদবীতে স্থান দিতেছি না। যেগুলি তিনি সরস, বিচিত্র ও মনোরঞ্জন ভঙ্গীতে লিখিয়াছেন, সেইগুলিকেই আমরা প্রবন্ধসাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ভঙ্গীর সরসতার হেতু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুক-রসিকতা। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"নির্মল শুভ্রসংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গ-সাহিত্যে আনয়ন করেন।"

হাস্য-রসের প্রাবল্য তারল্য ও উচ্ছলতা থাকিলেই সাহিত্য হয় না—বঙ্কিমের স্বভাবসিদ্ধ শুভ্রসংযত হাস্যরসই তাঁহার বহু প্রবন্ধকে সাহিত্যের পদবীতে উন্নীত করিয়াছে।

পূর্বে বিশ্বাস ছিল, হাস্যরস বুঝি নাটক-কবিতা-উপন্যাসাদি মূল-সাহিত্যাঙ্গেরই উপজীব্য। প্রবন্ধরচনায় যে হাস্যরস চলিতে পারে, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দেখান অর্থাৎ শুভ্রসংযত হাস্যরসে পরিষিক্ত করিলে যে সকল বক্তব্যই সাহিত্য হইয়া উঠিতে পারে, তিনিই তাহার সর্বপ্রথম সন্ধান দেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোন বিষয়ের গভীরতার গৌরব হ্রাস হয় না, কেবল তাহার সৌন্দর্য ও রমণীয়তারই বৃদ্ধি হয়, তাহার সর্বাংশের প্রাণ ও গতি যেন সুস্পষ্টরূপে দীপ্যমান হইয়া উঠে। যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিমই আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।"

সঞ্জীবচন্দ্র তাঁহার পালামৌ-প্রবাসকাহিনী যে ভঙ্গীতে বিবৃত করিয়াছেন—তাহা তাঁহার নিজস্ব। এই ভঙ্গী অভিনব এবং সরস। সে যুগে এই ভঙ্গীর কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে আবেগ, উচ্ছ্বাস ও অনুভূতির মাধুর্য যোগ করিয়া সাহিত্যরূপ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ফলে, তাঁহার রচনা অনেকস্থলে গদ্যকাব্যের মত সরস হইয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রনাথবাবুর 'ত্রিধারা' গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে ঐ ভঙ্গী বরং অধিকতর সাফল্য লাভ করিয়াছে। আচার্য অক্ষয় সরকার মহাশয়ের বহু রচনা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। তাঁহার বহু প্রবন্ধই সাহিত্যের পদবীতে আরোহণ করিয়াছে।

চন্দ্রশেখর হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসের আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহার বক্তব্যগুলিকে কৌশলে উপন্যস্ত করিয়াছেন। উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেমের এই কৌশলটি উল্লেখযোগ্য। ইহা শোকোচ্ছ্বাস মাত্র নয়, ইহাতে দেশবিদেশের দর্শন, সাহিত্য ও ইতিহাসের বহু কথাই আছে।

রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আত্মজীবনচরিতে জীবনের কথা-গুলি সরস করিয়া বলিবার চেষ্টা করিয়াছেন আর কবিবর নবীনচন্দ্রই 'আমার জীবনে' এ বিষয়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিয়াছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যাহা কিছু লিখিতেন তাহাই সরস করিয়া ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু রচনারীতি শিথিল ও তরল ছিল বলিয়া রস জমিত না। তবে তাঁহার প্রবন্ধরচনারীতিতে বৈঠকী আলাপের অনাড়ম্বর স্বচ্ছন্দতা ছিল।

তারপর আসিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইনি আপনার মন্তব্য ও বক্তব্য প্রকাশে নবনব সরস ভঙ্গীর প্রবর্তন করিয়াছেন। চিরপ্রচলিত ভঙ্গীতেও ইনি অভিনবত্ব সম্পাদন করিয়াছেন। সত্যের প্রতিষ্ঠা বা একটা ধ্রুবসিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই অনেক সময় রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে—রসসৃষ্টির দ্বারা সত্যের ইঙ্গিত দান ও পাঠক-চিত্তের চিন্তাপুঞ্জকে আলোড়িত করিয়া তোলাই তাঁহার লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক প্রবন্ধটি সরস সাহিত্য, অথচ বিষয়বস্তুর নিজস্ব উপাদানেই গঠিত কিন্তু ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ—নিঃশেষ করিয়া বক্তব্যকে বলাই লক্ষ্য নয়,—সত্যসন্ধানে আগ্রহসৃষ্টি ও প্রবৃত্তিদান এবং 'সত্যের ভূমির উপর দিয়া লঘুপদে সঞ্চরণই' লক্ষ্য। যে কথাগুলিকে সরস করিয়া বলিতে পারিবেন না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বলেন নাই, সেজন্য বক্তব্যের মাঝে মাঝে ফাঁক থাকিয়া গিয়াছে মনে হইবে। সেই ফাঁক পূরণ করিবার ভার পাঠকের উপর। পাঠকের বুদ্ধিবিদ্যার প্রতি ইহাতে তাঁহার শ্রদ্ধাই সূচিত হয়।

রবীন্দ্রনাথের রচনার প্রত্যেক পংক্তিটি সরস, অলঙ্কৃত ও সুভাষিত—কাব্যেরই সহোদর। সত্যের আবিষ্কারই তাঁহার প্রবন্ধের বড় কথা নহে—সত্যের আনন্দ-

দানই বড় কথা, এই ভঙ্গী বঙ্গসাহিত্যে নূতন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসাহিত্যের আনুক্রমিক পরম্পরা প্রধানতঃ যুক্তিমূলক—তাহার সহিত আলঙ্কারিক পরম্পরা অনুস্যূত হইয়া থাকে। যুক্তির বদলে ঔপম্যের (Analogy) দ্বারা যে প্রবন্ধকে কতটা সরস সাহিত্যে পরিণত করা যায়, তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন।

এই ভঙ্গী ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ অন্যান্য বহু ভঙ্গীরও প্রবর্তন করিয়াছেন—এখানে কয়েকটির উল্লেখ করি—

১। সাহিত্য-সমালোচনা যে নিজেই স্বতন্ত্র 'সাহিত্য' হইয়া উঠিতে পারে—রবীন্দ্রনাথ সরসভঙ্গীর সমালোচনা প্রবর্তন করিয়া তাহাও দেখাইয়াছেন। তাঁহার 'প্রাচীন সাহিত্য' 'ও লোকসাহিত্যে'র বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিতেছি।

২। তাঁহার 'পঞ্চভূতে' মিত্রসম্মিত পদ্ধতিতে কথোপকথন ও বাদানুবাদের ভঙ্গীতে বক্তব্য ও মন্তব্য প্রকাশ করার অভিনব ভঙ্গী উল্লেখযোগ্য।

৩। পত্রের ছলে যে বক্তব্যকে সরস করিয়া প্রকাশ করা যায়, তাহার প্রমাণ দিবে 'ছিন্নপত্র' ও 'পত্রধারা'।

৪। ঘটনাবৈচিত্র্যময় জীবনকথার বিবৃতি না করিয়া কেবল ভাবাঢ্য ও অনুভূতিঘন জীবনস্মৃতির বিবৃতি করিয়াছেন বলিয়া জীবনস্মৃতির ভঙ্গীকে অপূর্ব বলিতেছি না। সরস বিবৃতির পদ্ধতিটিই অপূর্ব। ঐ বিবৃতিতে যে ক্রমপারম্পর্য অনুসরণ করিয়াছেন, তাহা একটি বিরাট কবিমনের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসেরই উপযোগী। এসকল কথা চিরপ্রচলিত প্রবন্ধাকারেই ব্যক্ত করিতে হয়, পূর্বে সকলে তাহাই জানিত ও বুঝিত।

৫। কথিকার ভঙ্গী একটি অপূর্ব ভঙ্গী। ইহাকে গদ্যকাব্যের ভঙ্গী বলা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি ও পরেও নবনব সরস ভঙ্গীতে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা চলিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ও জগদানন্দ বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গকে সরস করিয়া ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধগুলি সরস, কিন্তু একটু অতিপল্লবিত, আড়ম্বরময় ও জটিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কতকটা হরপ্রসাদের অনুবর্তী।

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে সরস ভঙ্গীতে রচিত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন কোন প্রবন্ধ সাহিত্যের মর্যাদালাভ করিয়াছে।

ভৌগোলিক ও ভূবিজ্ঞানসম্বন্ধীয় তথ্যকে কতদূর সরস করিয়া প্রকাশ করা যায় জগদীশচন্দ্র তাহা দেখাইয়াছেন,—তাঁহার 'ভাগীরথীর উৎসসন্ধানে।' প্রবন্ধ-

সাহিত্য রচনায় বলেন্দ্রনাথের কবিত্বমধুর দান অসামান্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইতিবৃত্তকেই সরস করিয়া বলিবার জন্য রমেশচন্দ্র ও হরপ্রসাদের অনুসরণে উপন্যাসের ভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার শশাঙ্ক ও ধর্মপাল এই ভঙ্গীর শ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি নীরস প্রত্নতত্ত্বকেও সরস করিয়া বিবৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন —তাঁহার 'পাষাণের কথা'র কথা স্মরণ করিতে বলি।

কৌতুকরসে পরিষিক্ত করিয়া ও আলঙ্কারিক ক্রম অনুসরণ করিয়া নিবন্ধ-রচনার অপূর্ব ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই বীরবলের রচনায়। ভাষার দিক হইতে বীর-বলের রচনায় অপূর্বতা আছে। তাঁহার অপূর্ব ভাষার সহিত অভিনব সরস ভঙ্গীর সংযোগের ফলে বঙ্গসাহিত্যে গদ্য-রচনার অভিনব রীতি-পদ্ধতিরই প্রবর্তন হইয়াছে। সাধারণভাবে তাঁহার রচনাভঙ্গীকে antithetical diction বলা যাইতে পারে। ব্যঙ্গাত্মক, কৌতুকরস-ভূয়িষ্ঠ, শ্লেষাঢ্য অলঙ্কৃত ভঙ্গীতে প্রবন্ধের বক্তব্য যে কতটা সরস ও হৃদ্য হইয়া উঠিতে পারে, বীরবল তাহা দেখাইয়াছেন। এই ভঙ্গীতে শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের অপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়াছে।

নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের মৃতের কথোপকথনে একটি অভিনব ভঙ্গীর সাক্ষাৎ পাই। Landor-এর Imaginary Conversation এই শ্রেণীর।

চারুচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'কমলাকান্তের পত্রে'র রচনা-ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে। অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই অনুসরণ, কিন্তু সার্থক অনুসরণ বটে।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনাভঙ্গীর সহিত বীরবলের রচনাভঙ্গীর কিছু মিল আছে। কেদারবাবুর ভঙ্গীটি কৌতুকমধুর ও শব্দালঙ্কারভূয়িষ্ঠ। নির্বাসিতের আত্মকথার লেখক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাময়িক প্রসঙ্গকে সরস করিবার বিবৃত করিবার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য।

সতীশচন্দ্রের 'গাছের কথা'র কথা ভুলি নাই। বৈজ্ঞানিক বিষয়কে এরূপ সরস ভঙ্গীতে প্রকাশ করিবার চেষ্টা আজকাল বড় দেখা যায় না। রাজশেখরবাবুর প্রবন্ধ হাসির গল্পের রূপ ধারণ করে।

এযুগে প্রবন্ধসাহিত্যে শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি বিবিধ সরস ভঙ্গীতে প্রবন্ধ সাহিত্য রচনা করিতেছেন, একটি ভঙ্গী Landor-এর Imaginary Conversation এর অনুবর্তিতা।

ইদানীং জীবনচরিত, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী সরস ভঙ্গীতে রচিত হইতেছে —এইগুলিকে প্রবন্ধসাহিত্যের মধ্যেই ধরা যাইতে পারে। আজকাল প্রবন্ধ-সাহিত্য তথাকথিত রম্যরচনার রূপ ধরিয়াছে। ইহাতে সাহিত্য কিছু থাকিতে

পারে, প্রবন্ধত্ব বিশেষ কিছু নাই। রম্যরচনায় কিছু কিছু তথ্য আছে—তত্ত্ব নাই। ইহাতে বাগ্‌বিন্যাসের কৌশল আছে, সত্যানুসন্ধিৎসা নাই। ভাষায় ধার আছে, ভাবের ভার বা সার নাই। এইগুলি কথাসাহিত্য ও সাংবাদিকতার (Journalism) মাঝামাঝি একটা বস্তু। এইগুলিতে প্রবন্ধকারের দায়িত্ব-বোধ নাই, কথাসাহিত্যিকের স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতা আছে। বোধ হয় সরস বাক্‌-চাতুর্যের জন্য এইগুলি 'রম্য' বিশেষণ লাভ করিয়াছে

মিত্রাক্ষর

মিত্রাক্ষর বাংলা কবিতার একটি অপূর্ব অলঙ্কার—শুধু অলঙ্কার নয়, দাতাকর্ণের কবচকুণ্ডলের মত ইহা বাংলা কবিতার অঙ্গীভূত। শ্রুতিরঞ্জনী মাধুরীর জন্য মিত্রাক্ষর যুগ্মকে বঙ্গকাব্য-সরস্বতীর শ্রুতিযুগলে কুণ্ডল-যুগল বলা যাইতে পারে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত ইহাই ছিল সত্য।

সংস্কৃতে মাত্রাসমক-শ্রেণীর পাদাকুলক, পজ্ঝটিকা ইত্যাদি ছন্দ ও গীত্যার্যা ও গাথা-শ্রেণীর কয়েকটি ছন্দ ছাড়া অন্যান্য ছন্দে মিল নাই। কিন্তু সংস্কৃতে হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ-বৈষম্যের জন্য এবং তালমান ও যতি অনুযায়ী বিধিবদ্ধ স্বরসন্নিবেশের জন্য এমন একটি ছন্দঃস্পন্দের সৃষ্টি হয় এবং এমন একটি তরঙ্গায়িত লীলা চরণের মধ্য দিয়া বিলসিত হয় যাহার জন্য মিলের অভাবে মাধুর্যের অভাব হয় না। পংক্তিশেষে কেবল অক্ষর-সাম্যই নাই—কিন্তু প্রত্যেক চরণের প্রত্যেক অক্ষরের স্বর-মাত্রার সহিত অন্যান্য চরণগুলির তৎস্থানীয় অক্ষরের স্বরমাত্রার অক্ষুণ্ণ মিল ও সাম্য থাকে। ইহা ছাড়া অনুপ্রাস যমকাদি শব্দালঙ্কারের প্রাচুর্যও থাকে। স্বরমাত্রার সামঞ্জস্য, সুসন্নিবেশ ও শৃঙ্খলিত বিন্যাসের ফলে সংস্কৃত ছন্দে যে স্বরস্পন্দ ও মধুস্যন্দ ঘটিয়া থাকে—অনুপ্রাস-বাহুল্য সত্ত্বেও বাংলা ছন্দে তাহা সম্ভব হয় না। মিল বাংলা ছন্দে সেই অভাব কতকটা দূর করিয়াছে। তাই বাংলা ভাষার সম্পূর্ণ নিজস্ব ছন্দগুলির জন্য মিল অপরিহার্য।

মিলই বাংলা কবিতার তাল, মান, লয়, যতি, বিরতি—সবই নিয়মিত করে,—পদ্যকে গদ্যাত্মকতা হইতে রক্ষা করে,—কবির লেখনীকে বিরাম দেয় ও সংযত

করে, আবৃত্তিকালে পাঠকের কণ্ঠস্বরকে উঠা-নামায় সাহায্য করে,—স্নেহাক্ত করিয়া তাহার বাগ্‌যন্ত্রকে অবাধে চলিবার বেগ দান করে। মিল রচনার গতিক্লিষ্টতা হরণ করে,—সুরকে বারবার নবীভূত করিয়া দেয়—ধ্বনিক্লান্ত কর্ণের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া নব নব উত্তেজনা দেয়, দীর্ঘ ছন্দের পথে 'মিল' গুলি যেন পদ-পদাতিকদের মিলনের পান্থনিবাস।

গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া মিল ছন্দকে নব নব রূপ ও সৌষ্ঠব দান করে। তাই বাংলা ছন্দের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বহুল পরিমাণে মিলের উপরই নির্ভর করে। মিলের সংস্থানই অনেক সময় এক ছন্দ হইতে অন্য ছন্দকে স্বাতন্ত্র্য দান করে। মিলই বহু পদ ও পদাংশে গুচ্ছ বাঁধে ও শ্লোকের স্তবক রচনা করে—ধ্রুবপদকে বার বার ফিরাইয়া আনিয়া দেয় এবং সমগ্র রচনার মাধুর্য, লালিত্য, সৌষ্ঠব ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে। মিল সংযমের বল্গা ধরিয়া পদান্তে বিরাজ করে এবং কোন পংক্তিকেই উচ্ছৃঙ্খল হইতে দেয় না। দুইটি মাত্র অক্ষরকে অবলম্বন করিয়া মিল চরণযুগ্মের গতি নিয়ন্ত্রিত করে।

অর্থমর্যাদা ও রস-সৌকর্য রক্ষা করিয়া গদ্য বা গদিত বাক্যকে গাওয়া যায় না। তাই সঙ্গীতের জন্য ছন্দোবদ্ধ বাণীর এত প্রয়োজন। এই ছন্দোবদ্ধ বাণী যদি মিলের দ্বারা ঝঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে উহা সঙ্গীতের অনেকটা নিকটবর্তী হইয়া উঠে—গায়ককে গাহিতেও ক্লেশ পাইতে হয় না। মিল তাহার রাগ-রাগিণীর তরঙ্গলীলা ও স্বরবৈচিত্র্যসৃষ্টির সহায়তা করে—যতি, বিরতির ও সমের সংস্থান নির্দেশ করিয়া সুরের যাত্রাপথকে সুগম করিয়া দেয়।

বাংলা কবিতায় মিলের সৃষ্টি যেমন শ্রুতিবিনোদন করে—অন্য কোনপ্রকার বর্ণবিন্যাস বা শব্দচাতুর্য তেমনটি করিতে পারে না। শ্রুতিবিনোদন করে বলিয়াই উহা স্মৃতিবিনোদনও করে। তাই মিত্রাক্ষরান্ত পংক্তি সহজেই স্মৃতিগত হইয়া যায়, এবং ধৃতিক্ষেত্রে স্থায়ী আসন লাভ করে। ছন্দোগতি, একটি শব্দের পর অন্য শব্দটিকে মনে পড়ায়,—মিল একটি পংক্তির পর তাহার মিত্র-পংক্তিকে মনে পড়ায়। সম তৎসমকে মনে পড়ায়—মনস্তত্ত্বের Law of Association by Similarity and Contiguity এক্ষেত্রে কাজ করে।

মিলের আকর্ষণী শক্তি উদাসীন পাঠককেও কবিতার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া লইয়া যায়। মিল কবিতার ছন্দে তরঙ্গের সৃষ্টি করে—যাহাতে পাঠকের কান ও প্রাণ দুলিতে বাধ্য হয়। ইহা এমন একটি নৃত্য-হিল্লোলের সৃষ্টি করে যে নৃত্যের আবেশ পাঠকের কানে ও প্রাণে লাগিয়া যায়,—কানের সঙ্গে প্রাণও নাচিতে

নাচিতে কবিতার দোলযাত্রায় যোগ দেয়। একবার নাচন পাইলে সে নাচন হইতে আর সহজে বাঁচন নাই। নৃত্যের একটি নির্দিষ্ট বেগ আছে—তাহার একটি পরিমিত তৃষ্ণা আছে। সে তৃষ্ণা মিটিবার আগে যদি নাচন থামিতে বাধ্য হয়, তবে নর্তক বসিয়া বসিয়াও নাচে—শুইয়া শুইয়াও খানিকক্ষণ নাচিয়া লয়। মিলও কবিতায় যে নাচনের সৃষ্টি করে, তাহার বেগ ও তৃষ্ণার টানে পাঠকের কান ও প্রাণ নাচিতে নাচিতে চলে—ক্লান্তি জন্মিবার আগেই যদি কবিতা থামিয়া যায়,—তবু সে নাচন থামে না—আরো খানিকক্ষণ অনিচ্ছাতেও reflexively নাচিতে থাকে। কাজেই ছন্দ ও মিলের রেশের সঙ্গে আবোল-তাবোল অর্থহীন কথায়, মনে-মনে মিল দিয়াও নাচন চলিতে থাকে।

দুইটি পদকে মিল একবৃন্তে দুইটি পুষ্পের মত ফুটাইয়া তুলে, ছন্দ তাহাকে বর্ণসৌষ্ঠব দেয়, রসালঙ্কার মধু ও সৌরভ যোগায়।—এই জন্য মিলান্ত পদগুলি এত লোককান্ত। সর্বপ্রকার লোকসাহিত্য এই মিলান্ত ছন্দেই রচিত হইয়া আসিতেছে। সকলদেশের জনসাধারণ তাই মিলের ভক্ত। তাই দেশের অধিকাংশ প্রবাদ-প্রবচন, 'বচন', অনুশাসন, মিলান্ত ছন্দে লোকমুখে মুখে রচিত হইয়া জনপরম্পরায় এত সহজে ও অবিকৃতরূপে চলিয়া আসিতেছে। আপনার অক্ষম দুর্বল বচনে যখন আর কুলায় না—আপনার যুক্তিতর্কে যখন চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না—যখন আপনার নীরস বাক্যজাল প্রাণপণে বিস্তার করিয়াও তৃপ্তি হয় না, তখন যে কোন অজ্ঞাতনামগোত্র লোককান্ত কবির সমিল বচন প্রয়োগ করিয়া বক্তা আপন বক্তব্য শেষ করে।

মিল-বন্ধনের এমনি প্রতাপ যে সমিল বচনপ্রবচনগুলিই জনসাধারণের বেদ-পুরাণ, স্মৃতিশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ও রীতিশাস্ত্র হইয়া উঠিয়াছে। সমিল বচনে এমনি একটা রহস্য বিজড়িত আছে যে জনসাধারণের চিত্তে উহা যুগপৎ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস উৎপাদন করে। জনসাধারণের বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলি যুগ হইতে যুগান্তরে মিলের সূত্রেই গ্রথিত আছে। মিল যে অপূর্ব লোকসাহিত্য রচনা করিয়া রাখিয়াছে—সেই সাহিত্য, সেই অনুশাসন মালা—সেই অগ্রন্থলব্ধ বিদ্যা,—নিরক্ষর ও বর্ণজ্ঞানমাত্রসম্বল জনসাধারণের একমাত্র অবলম্বন, চরিত্রগঠনের সহায়, জীবনের যাত্রাপথের পাথেয়।

গ্রন্থের বিদ্যা সহজে পুরুষ-পরম্পরায়,—অতীত হইতে বর্তমানে—বর্তমান হইতে ভবিষ্যতে বিতত হয় না, লোকপরম্পরায় মুখে মুখে সহজে অনায়াসে জন-সাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয় না এবং কোন দিনই সর্বজনাধিগম্য হয় না। কৌতূহল

ও কৌতুকের দুটি পাখার উপর ভর করিয়া পাখীর ঝাঁকের মত, জনারণ্যের সমিল বচনগুলি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যায়, বিনাক্লেশে—বিনা অবধানেই ধরা পড়ে,—পোষা পাখীর মতই যেন হাতে হাতে উড়িয়া বসে।

সমিল প্রবাদ-প্রবচনগুলি যে বিদ্যা বহন করে তাহার আদানপ্রদানেও বেশ একটা সাধারণতন্ত্রতা (Democracy) আছে, মঠ-চতুষ্পাঠীর চতুষ্কোণের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়।

এই সংক্ষিপ্ত সমিল সানুপ্রাস বচনগুলি কর্মীদের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার ফল —কর্মক্ষেত্রেরই আবিষ্কার—কর্মশ্রুতির গৃহসূত্র। কর্মজীবন স্বেদসিক্ত,—কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার ফল মিলের গুণে রসসিক্ত। এগুলি খনার বচন, ডাকের বচন ইত্যাদি নানারূপ ধারণ করিয়া কুটীরে কুটীরে কর্মীদের শ্রমযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে —পল্লীসংসার ও পল্লীক্ষেত্রের সকল জীবন-ধারাকেই নিয়মিত করিতেছে। মিলই এই বচনগুলিকে সাধারণ অমার্জিত ও প্রাকৃত বাক্যাবলী হইতে স্বাতন্ত্র্যদান করিয়া অনাবশ্যক শব্দপুঞ্জকে বর্জন করিয়া সূত্রাকারে রহস্যময় মন্ত্রসূক্ত করিয়া তুলিয়াছে। সেগুলির রচনা শিষ্ট বা সুষ্ঠু নয়, রুচি তেমন মার্জিত বা সমুন্নত নয়—একমাত্র মিলই তাহাদিগকে গৌরব ও বৈশিষ্ট্যদানে শ্রদ্ধার্হ করিয়া রাখিয়াছে।

পল্লীবাসিগণের ভাষাসম্পদ প্রচুর নয়—মিল দেওয়ার কৌশলও তাহারা জ্ঞাতসারে আয়ত্ত করে নাই—অথচ মিল না দিলে তাহাদের তৃপ্তি হয় না—নিজের বচনকে অমর করিতে পারে না। তাহাদের অমার্জিত ও অসম্যক্ মিলে (Uncouth Rhyme) মিলের আগ্রহটুকু এমনি উন্মুখ হইয়া আছে যে, যাহারা উচ্চারণ করে তাহারা মিলের ত্রুটী সারিয়া লয়। শ্রদ্ধা ও আগ্রহ চিরকালই এমনি করিয়া সকল দোষ ত্রুটী উপেক্ষা করিয়াই চলে।

“রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়—উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়—” এখানে ‘যায়’ ও ‘হয়’—ঠিক মিল হইল না। অনায়াসে—‘রাজায় রাজায় যুদ্ধে হায়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়,” এইরূপ মিল কেহ চালাইতে পারিত—কিন্তু তাহা কেহ করে নাই বা করিতে সাহস করে নাই। সিন্দূর-চন্দনলিপ্ত ভগ্নপাণি দারুবিগ্রহের ন্যায় ঐ প্রকার অশিষ্ট-মিল বচনগুলি অমার্জিত অসংস্কৃত রূপেই আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে।—মিলে ত্রুটী থাকুক—মিলের আগ্রহে ও উচ্চারকের শ্রদ্ধায় কোন ত্রুটী নাই। পূর্ণাঙ্গ মিল বাণীকে ত অমর করেই, মিলের আগ্রহনিষ্ঠাও বাণীর জীবনীশক্তি বাড়াইয়া দেয়—মিলের সম্পূর্ণ দায়িত্বময় কর্তব্য অশিষ্ট মিলও সম্পাদন করিতে পারে।

মিল আমাদের জনসাধারণের জন্য শুধু শাস্ত্র গড়ে নাই,—শস্ত্রও গড়িয়াছে।

তাহারা জানিত,—সাধারণ অমিল গদ্য গদার মত কাষ্ঠখণ্ড মাত্র, দেহের মাংস-পেশীর উপরই তাহার যত পরাক্রম। মিলের ফলা-লাগানো পদ্যের শর ভিন্ন মর্মস্থল ভেদ করা যায় না। তাই তাহারা ঐ প্রকারের তীক্ষ্ণ শরে তূণগুলি ভরিয়া রাখিয়াছে। প্রতিপক্ষকে নির্বাক করিতে ঐ শর-প্রয়োগের ব্যবস্থা বরাবর চলিয়া আসিতেছে।

এমন কতকগুলি ছড়া প্রবচন আমাদের পল্লীসমাজে প্রচলিত আছে,—যাহাদের অন্তরে মিলের শুক্তিপুটে শতসহস্র বৃশ্চিকের বিষ পুঞ্জীভূত আছে! এগুলির প্রয়োগ বড়ই মর্মান্তিক।

পল্লীগ্রামে দুইজন পাড়া-কুঁদুলী যখন ঝগড়া জুড়িয়া দেয়, তখন গ্লানির ভাষা একেবারে নিঃশেষ করিয়া প্রয়োগ করে—কিন্তু কিছুতেই হার-জিতের মীমাংসা হয় না, উত্তেজনারও উপশম হয় না, পুনঃ পুনঃ গালাগালির পুনরাবৃত্তি করিয়া রসনার ক্লান্তি আসে, কিন্তু রোষণার শান্তি হয় না। তখন ভামিনীরা ছড়া কাটিতে আরম্ভ করে। তখন বুঝা যায়, এইবার শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রোতাদেরও কর্ণপীড়ার তখন একটু উপশম হয়—বিরক্তি ক্রমে কৌতুকে পরিণত হয়। দুইটি নারীর নরীনৃত্যও যে রসসঞ্চার করিতে পারে নাই, মিল সেই রসের সঞ্চার করিয়া ফেলে। তখন চণ্ডীদ্বয়ের চণ্ডিমায় যে রসের আমেজ লাগে, তাহাতে কলহে ক্রমভঙ্গ হইয়া যায়, ছড়াও মুহুর্মুহুঃ জুটিয়া উঠে না,—তখন নূতন নূতন ছড়ার কথা ভাবিতে তাহাদের রান্নাঘরে ফিরিয়া যাইতে হয়।

রাঢ়-দেশের বালিকারা ভাদু বা ভাজোর গানের ছড়া কাটাকাটি করিতে গিয়া তীব্র শাণিত মর্মান্তিক ও গ্লানিকর বাক্য নিঃশেষ করিয়াই প্রয়োগ করে—কিন্তু মিলের এমনি মাধুরী ও মহিমা যে শত অমিলের মধ্যেও বিবদমানাদের ভিতর একটা রসের মিল ঘটাইয়া ফেলে। পূর্বে পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে সকল বিবাদেরই এমনিতর 'মধুরেণ সমাপন' হইত। এই শ্রেণীর অপূর্ব সরস বিবাদে বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রকট হইয়া উঠে।

দুই পাড়া বা দুই গ্রামের কবির দলের লড়াই লাগিয়া যাইত। নিরঙ্কুশ কবি-সৈন্যগণ মুখে মুখে মিল দিয়া শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করিত—গাহিয়া সুরের শাণে আরো শাণিত করিয়া তুলিত। সত্য অসত্য অনেক গ্লানিনিন্দা মিলের গুণে মুখরোচক হইয়া উঠিত—প্রতিহিংসা ক্রমে 'মিলে মিলে' মিলই বাড়াইত। বিবাদটা কিল বা ঢিলের বদলে মিলের সাহায্যেই অগ্রসর হইত। মিলই যেখানে বিবাদের অস্ত্র—সেখানে অমিলটা আর স্থায়ী হইতে পারিত না। নিন্দা গ্লানি অপবাদ

যতই তীব্র হউক, একমাত্র মিলই প্রতিপক্ষের অন্তরে ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার সৃষ্টি করিত। নিতান্ত অরসিক ব্যক্তি, যে মিল-দেওয়া বচনে উত্তর দিতে জানে না, সে ছাড়া অন্য কেহই অসহিষ্ণু হইত না। কবির দলে অবশ্য সে শ্রেণীর অরসিকের ঠাঁইও ছিল না। মিলের মধ্যস্থতায় গ্রাম্য বিবাদগুলিতে যে সন্ধি-স্থাপিত হইত —সে সন্ধিসূত্র সভ্যসমাজের অনেক সুস্বাক্ষরিত সুরচিত সুচিন্তিত সন্ধিপত্র অপেক্ষা মৈত্রী-বলে অধিকতর বলীয়ানই হইত।

দারুণ অভিমান অনেক সময় শ্লিষ্ট সমিল বচনের আকার লাভ করে, কিন্তু মিলের খাতিরে বচনের লক্ষ্য ব্যক্তি সে শ্লেষের জন্য ক্লেশ অনুভব করে না। উদাহরণ স্বরূপ, "যম (কোথাও কোথাও জন) জামাই ভাগ্‌না—তিন নয় আপনা"—ইহা অভিমানের বাণী এবং রীতিমত তীব্র।

এক ঢিলে দুই পাখীকে যমের বাড়ী পাঠানোর মতন এক মিলে জামাই ও ভাগনেকে যমের পাংক্তেয়ও করা হইয়াছে। কিন্তু এত বড় মর্মান্তিক কথাতে যে জামাই বা ভাগিনা রাগ করে না, তাহার কারণ বচনটিতে মিল আছে,—অমিল গদ্যে বলিলে কি অনর্থই না ঘটিতে পারে!

বাংলা দেশে পুরুষদের সংস্কৃত শ্লোকে দেবপূজা ও গার্হস্থ্য ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদেরও বাংলা ছড়ায় একটা পূজাব্রতাদির প্রথা চলিয়া আসিতেছে। এ সকলের জন্য একটা বিরাট শাস্ত্রসংহিতা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার সবই বাংলা ভাষায় মিল-দেওয়া ছন্দে রচিত। ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, শীতলা, চণ্ডী, মনসা, সুবচনী (শুভচণ্ডী?) ইত্যাদি যে সকল দেবতা অন্তঃপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের উপাসনার ব্যবস্থা সমিল বাংলা ছন্দে।

আমাদের শুদ্ধান্তচারিণী উপাসিকারা প্রত্যাশা করেন মিল-দেওয়া বচন দেবতার চিত্ত সহজে বিগলিত করিবে।

মিল না থাকিলে ছড়াবচনগুলি মন্ত্রের মর্যাদা লাভ করিত না,—সহজে শিখিয়া অপরকে শিখানো বা সহজে মনে রাখাও সম্ভব হইত না।

বালিকা-বয়স হইতেই আমাদের গৃহিণীদের মিলের অনুশীলন চলিয়া আসিতেছে। বালিকারা সমিল বচনেই পুণ্যিপুকুর, গোকল, যমপুকুর ও সাঁজ-পূজুনীর ব্রত করে—পুতুলের সোহাগ করে,—ছোটভাইকে ঘুম পাড়ায়, ভাইএর কপালে ফোঁটা দেয়, শিবঠাকুরের তিন বৌএর ভাগ্যাভাগ্যের কাহিনী শোনে, আপন আপন ভবিষ্যৎসংসার ও গৃহস্থালির পূর্বাভাস লাভ করে। জীবনের মিলটা তাহাদের তাড়াতাড়িই জুটিত, তাই শিশুকাল হইতে মিলের চর্চা করিত—শুধু

পুতুলের বিবাহ দিয়া নয়—কথায় কথায় বিবাহ দিয়াও। তাহারা মিলের মাল-মশলায় একটা স্বপ্নপুরী গড়িয়া রাখে, বিবাহের আগে ভাবে, ঐ স্বপ্নপুরীরই বুঝি তাহারা পরী বা রাণী হইবে। বিবাহের পর তাহার সে স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়। বিবাহের পর নববধূ শ্বশুর-বাড়ী যাইবার সময় রাশি রাশি যৌতুকের সঙ্গে রাশি রাশি মিলের কৌতুক সঙ্গে লইয়া যায়। যৌতুকগুলি সকলে লুটিয়া লয়—সম্বল থাকে ঐ কৌতুকগুলি। অপরিচয়ের মাঝখানে নূতন সংসারে বিজনে বসিয়া সেইগুলিকে মৃদুগুঞ্জনে সে আবৃত্তি করে অথবা শিশুদেবরকে সেগুলি শুনাইয়া নীরস নিরানন্দ সন্ধ্যাগুলি কাটাইয়া দেয়। স্বামীর সহিত হৃদয়ের মিল হওয়ার আগে পর্যন্ত শব্দের মিলই তাহার জীবনটিকে সরস রাখে।

জানি না শিশু কোন্ চিরমিলনের দেশ হইতে এই অমিলের দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। এখনো সেই দেশের স্মৃতি তাহার প্রীতি ও শ্রুতি ভরিয়া আছে। মিল পাইলেই তাহার দিল খুশী হইয়া উঠে। সে অবাক হইয়া ভাবে এখানে এত অমিল কেন? এত অমিলের মধ্যেও শিশু একটা মিলের জগৎ সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার ভাবের অভাব নাই—কিন্তু ভাষার পুঁজি বড় কম। শিশুর কাছে সকল শব্দই প্রায় সমান, সকলগুলিই ধ্বনিধনে সমান ধনী, লোকে কতকগুলির অর্থ দিয়াছে—কতকগুলির দেয় নাই অথবা কতকগুলির অর্থ বোঝে, কতকগুলির বোঝে না। তাহাতে শব্দের বা ধ্বনির অপরাধ নাই। ধ্বনি মাত্রেই শিশুর কাছে সার্থক—অর্থের জন্য নহে, মাধুর্যের জন্য। শিশু-কবি মিল-ঝঙ্কারের এত পক্ষপাতী যে, মিলটি বজায় রাখিয়া যে কোন ধ্বনির দ্বারাই সে ছন্দ পূরণ করিয়া লইয়াছে—অর্থের জন্য একটুও চিন্তা করে নাই।

"ঘণ্টা কাঁসর সানাই বাজে"—এমন যে বাদ্য বাজে—নিশ্চয়ই কেউ সাজে,—নতুবা এত বাদ্য কেন? কিন্তু কে সাজে? শিশু নিঃসঙ্কোচে বলে 'আগাডুম বাঘাডুম ঘোড়াডুম' সাজে। আগাডুম ঘোড়াডুমের অর্থ থাক্ আর নাই থাক—ধ্বনি তো আছে, মিলের প্রয়োজন সাধন করিয়াছে ইহাই যথেষ্ট।

বাঁশ যে—"ছোটবেলায় কাপড় পরে—বড় হলে ন্যাংটা" এ বড়ই অদ্ভুত—নগ্নশিশুর পক্ষে এ বড় মজার কথা। ইহাতে শিশুর প্রাণে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠে। শিশু বলিয়া উঠে—'ড্যাং ড্যাং ড্যাং ড্যাংটা'। মিলের জন্য একটি নিরর্থক 'টা'এর আমদানি হইয়াছে, আর আনন্দের ধ্বনি—ঐ 'ড্যাং'কেই চারিবার উচ্চারণ করিয়া পদপূরণ করিয়া লইয়াছে।

শিশু সব সময় দুই পংক্তি পূরণ করিয়া লইবারও প্রয়োজন বোধ করে নাই—

মিল হইলেই যথেষ্ট। "মোষ,—তোর গোদা পায়ে খোস", "হাতী,—তোর গোদা পায়ে লাথি।" মহিষ যদি বলে—"তুমি অন্যায় বল্‌ছ—আমার পা একটু গোদা বটে, কিন্তু আমার পায়ে খোস ত নাই, গাল দেবে দাও, মিথ্যা কথা বলো না।" শিশু বলিবে—"তোমার খোস হয়েছে কি না হয়েছে তা' আমি জানি না, তুমি যখন মোষ,—তখন অবশ্যই তোমার পায়ে খোস—তোমার পায়ে খোস না থাকাটাই সত্য হলো—তোমার সঙ্গে খোসের যে এমন মিল হয়, সেটা বুঝি মিথ্যে ?—তুমি গোরু হ'লে নিশ্চয়ই ও কথা বল্‌তাম না।"

হাতী কিছুই না বলিতে পারে—সে শিশুর কচি পায়ের লাথি পাইয়া ধন্য হইয়া বুঝিয়া ফেলে, মিলের লোভই শিশুকে এতটা সাহসী করিয়াছে। তবে বাদুড় বলিতে পারে—"আমি যা খাই—তা তেঁত না হয় হলো, কিন্তু খুকুমণি, তোমার 'মেঁতো'টা কি ?" শিশু বলিবে—"'মেঁতো'টা যে কি তা' আমি জানি না—তবে ওটা খুবই দরকারী। ওটা ছাড়া আমি তোমার মিষ্টি মিষ্টি আম-তাল-লিচুকে কিছুতে যে তেঁতো করতে পারি না।"

হনুমানকে শিশু যে সম্ভাষণ করিয়াছে—তাহাতে অক্ষরের মিলই আছে, বক্তব্যবিষয়গুলিতে আদৌ মিল নাই। কলা খাওয়ার সঙ্গে জগন্নাথ দেখিতে যাওয়ার—বিশেষতঃ 'মাইতো বৌএর' বাবা হওয়ার কোন সম্বন্ধ বা অর্থসঙ্গতি না থাকিলেও পশু-কপিবর শিশু-কবিবরের কবিত্ব নীরবে উপভোগ করে।

এক ঢিলে দুই পাখী মারার কথা আছে। শিশু কিন্তু এক মিলে একটিকে ঘায়েল করিয়াছে—অন্যটিকে আদর করিয়াছে।

"শঙ্খচিলের মাথায় ছাতি—গোদা চিলের মাথায় লাথি।" গোদাচিল যতই চীৎকার করুক, মিল যখন ঠিক আছে, তখন শিশুর রায় বদলাইবে না।

সূর্য্যিমামা ও চাঁদামামা ছাড়া শিশুর যে মানুষ-মামা আছে, তাহার বাড়ী যাওয়ার জন্য শিশু তিনবার 'তাই' দিয়াছে, একবার 'তাই'-এ মামার বাড়ীর সম্ভাবিত আদরের উল্লাস সম্পূর্ণ প্রকাশ পাইতে পারে না। 'মামার বাড়ী যাই',—তার পরই মামীর অনাদরের প্রতিফলস্বরূপ তাহার দুয়ার অপবিত্র করিয়া 'ঘাই'! 'তাই'-এর এখানে দুইবার 'যাই' এর সঙ্গে মিল আছে। 'যাই'এর সঙ্গে 'যাই' এর আবার মিল কি ? আমরা দোষ ধরিতে পারি, কিন্তু শিশুরও উত্তর আছে—"এই দুই 'যাই'-ত এক নহে—একবার সোল্লাসে মামার বাড়ী যাই—তারপর ক্ষুণ্ণ হইয়া মামার বাড়ী হইতে আমার নিজের বাড়ী যাই। এই দুই যাওয়া ত এক নহে।"

শিশু—চন্দ্র, সূর্য, মেঘ, বাদল, বৃষ্টি, ঝড়, তরুলতা, পশুপক্ষী—এক কথায় প্রকৃতির সংসারের সকল পরিজনের সঙ্গেই সমিল প্রলাপে (?) আলাপপরিচয় করিয়া থাকে। সে বচনে না আছে অর্থসঙ্গতি—না আছে ভাবসামঞ্জস্য, না আছে সাহিত্য ব্যাকরণের সম্বন্ধ,—আছে কেবল মিলের ধ্বনিরই প্রাধান্য।

শিশু যে দিনান্তে মাতৃঅঙ্কে ঘুমাইয়া পড়ে, তাহা ঐতিহাসিক বর্গীর ভয়েও নয়—কাল্পনিক জুজুর ভয়েও নয়—আধিভৌতিক 'ল্যাজ-ঝোলার' ভয়েও নয়—মিলের মাধুরীই কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া তাহার নয়ন মুদাইয়া দেয়। শিশু খেলায় মাতে মিলের কৌতুকে, প্রথম পা ফেলিতে শেখে মিলের তালে তালে—নৃত্য করে মিলের করতালিতে। মিলই প্রথম তাহার হাতে-খড়ি দিয়া বর্ণপরিচয় করায়। মিলের মাধুর্যেই মসীর বর্ণমালা শিশুর কণ্ঠে শশীর স্বর্ণমালা হইয়া শোভা পায়।

ভাষার মিলন-ঝঙ্কারের প্রতি শিশুর অহৈতুকী মমতা দেখিয়া মনে হয়—এই মাধুর্যবোধক্ষমতা, সৌন্দর্যবোধ-শক্তির ন্যায় মানুষের সহজাত। শিশুর অঙ্কুরিত চিত্তে উহা প্রচ্ছন্ন থাকে—উহা তাহার আত্মার অঙ্গীভূত। অনুশীলন করিলে বয়োবৃদ্ধির সহিত ঐ শক্তি বিকাশ লাভ করিতে পারে—ক্রমে ছন্দোজ্ঞানে পরিণত হইয়া কবিত্বে পূর্ণাঙ্গ হইতে পারে।—প্রত্যেক শিশুর অন্তরে মিলের প্রীতির অন্তরালে কবিত্বশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকে—অনুকূল অবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, দীক্ষার সুযোগ-সুবিধা ঘটিলে কালে উহা প্রবুদ্ধ হইতে পারে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রথম কবিতার আস্বাদ পান—জল পড়ে পাতা নড়ে এই চারিটি শব্দে। পাতা কাঁপে হইলে তাহা সম্ভব হইত না।

মানুষ কণ্ঠস্বরলাভের সঙ্গে সঙ্গে স্বরের বৈচিত্র্য অনুভব করিতে শিখিয়াছে। শ্রুতিশক্তির ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে বৈচিত্র্যর মাধুর্যও উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যবোধের ফলে যখন তাহার ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে—তখনই সে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলে অজ্ঞাতসারে আনন্দ অনুভব করিয়াছে।

বর্বরতা হইতে মানবসভ্যতার উদ্বর্তনের সকল স্তরেই সঙ্গীতমাধুর্যবোধের সঙ্গে সঙ্গে ছন্দ ও মিলের প্রতি আজন্মসিদ্ধ প্রীতি দৃষ্ট হয়। ধ্বনির সহিত অর্থের ধ্রুবসম্বন্ধনির্ণয়ের আগে, বাগর্থের সংপৃক্তি-নির্দেশের আগে—অক্ষর ও লিখন পদ্ধতি আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ যেমন গান গাহিতে জানিত, ঝঙ্কার-মাধুরী উপলব্ধি করিত, তেমনি ছন্দের মাধুর্যও বুঝিত, মিলের মাধুর্যও উপভোগ করিতে পারিত।

আমরা যেমন করিয়া শব্দবিন্যাসে ছন্দ গঠন করি, ঠিক তেমনই করিয়া তাহারা ছন্দোগঠন করিতে পারিত না সত্য—কিন্তু পাখীর গানে, পশুর কণ্ঠস্বরে, নদীর কলধ্বনিতে, বাতাসের প্রবাহে,—ভ্রমরাদির গুঞ্জনে, প্রকৃতির রাজ্যের সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে যে সকল ছন্দ অনবরত ঝঙ্কৃত, সেগুলিকে তাহাদের কর্ণকুহর অবশ্যই ধরিয়া ফেলিত। কেবল শ্রবণপুটে তাহার মাধুর্যটুকু পান করিয়াই নিরস্ত হইত না, মাধুর্যটুকু বার বার লাভ করিবার জন্য—অর্থহীন ভাষায় মুহূর্মুহুঃ তাহার অনুকরণ করিত।

শিশু যেমন কোকিলের কুহুধ্বনি শুনিয়া উচ্চকণ্ঠে তাহার অনুকরণ করে—অসভ্য মানুষ তেমনি প্রকৃতির সকল ছন্দই উচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিত। বাক্‌শক্তি লাভের পর কথা কহিতে কহিতে কতকগুলি ধ্বনির আকস্মিক মিলন যখন শ্রুতিসুভগ হইয়া উঠিত—তখন তাহারা সহসা-সংঘটিত সেই আক্ষরিক মিতালির মধ্যে অবশ্যই বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুভব করিত। তখন তাহা শ্রুতি হইতে স্মৃতিতে যাইয়া প্রীতির স্থায়ী আসন লাভ করিত। তাহারা সেই ধ্বনি-সমবায়কে উচ্চকণ্ঠে গাহিয়া অমর করিয়া ফেলিত। শব্দান্ত ধ্বনির আকস্মিক সমবায়ে শব্দে শব্দে যখন সহসা মিলিয়া যাইত—তখন তাহারা সে মিলনকে উপেক্ষা করিতে পারিত না, যে বাক্যগুলিতে ঐ মিল থাকিত সে বাক্যগুলিকে দুর্লভ সুভাষিত মনে করিয়া মুখে মুখে বাঁচাইয়া রাখিত।

এইভাবে নিরক্ষর অসভ্য মানুষের মধ্যে সর্বদেশে এবং সর্বকালে একটা অলিখিত অপঠিত অমার্জিত সহসা-ঘটিত অযত্নলব্ধ কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ মিলকেই অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। সেগুলি চিরজীবনের সঙ্গী হইয়া অন্ধকারে জোনাকীর মত তাহাদিগকে যুগপৎ আনন্দ ও আলোক দান করিয়াছে। মানবাত্মার সহজাত মিলনতৃষ্ণা যেমন মানবজাতির কুল-গোষ্ঠী-সমাজ-রাষ্ট্রাদি গঠনে অভিব্যক্ত হইয়াছে—মানবচিত্তের সহজাত শাব্দিক মিল-প্রীতিই তেমনি ক্রমে সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া মানব-সভ্যতাকে এত রসৈশ্বর্যশালিনী করিয়াছে।

কাব্যের আবৃত্তি

"আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী।"

শাস্ত্রের আবৃত্তিকে 'বোধ' হইতেও গরীয়সী বলা হইয়াছে। শুধু বার বার অধ্যয়ন অর্থেই এই আবৃত্তি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, বলিয়া মনে হয় না—ছন্দোবদ্ধ বাণীর পক্ষে সুবিহিত সুসমঞ্জস উদীরণ আবৃত্তি শব্দের মর্মার্থের অন্তর্গত। সর্ব-শাস্ত্রের কথা বলিতে পারি না, কাব্য সম্বন্ধে যে এ কথা সম্পূর্ণ সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। যখন সর্বশাস্ত্র কাব্যেই রচিত হইত, তখন বোধ হয় সর্বশাস্ত্র সম্বন্ধেই এ কথা খাটিত।

উদাবৃত্ত না হইলে বেদের কোন বিশিষ্ট মূল্যই থাকে না। বেদসূক্তের,—উকৃথের বা উদ্গীথের মধ্যে যে অর্থ নিহিত আছে, তাহাই বেদের সর্বস্ব হইলে বেদ ভারতের মনোজগতের চিরানুশাসক হইত না। উদাবৃত্তি বা উদীরণকালে গাথা, সাম ও উকৃথের যে অপূর্ব মন্ত্রশক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাই মনোলোকে অলৌকিক ক্রিয়া সাধন করে। "পাদাক্ষর-সমাস-স্বরলক্ষণ জ্ঞান-সমন্বিত" আবৃত্তি সম্ভব হইলে, তাহা যে "বোধাদপি গরীয়সী" হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? এ যুগে সে আবৃত্তি সম্ভব হইলে যাহারা বেদার্থজ্ঞানরহিত তাহাদিগকেও বেদমন্ত্র উচ্চারণ করাইয়া বা শুনাইয়া বেদের মর্যাদা কতকটা রক্ষিত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাজক ও যজমান উভয়েই বেদমন্ত্রের শ্রুতিসঙ্গত আবৃত্তি করিতে পারেন না বলিয়া সমস্ত বৈদিক অনুষ্ঠানই পণ্ড হইয়া যায়।

কবিতার শব্দ-সমূহে বৈদিক গাথার মত মন্ত্রশক্তি না থাকিলেও মন্ত্রমুগ্ধ করিবার শক্তি আছে। যাহাকে "কানের ভিতর দিয়াই মরমে" প্রবেশ করিতে হইবে তাহাকে আগেই কর্ণরাজ্য জয় করিতে হইবে। কবি এমনভাবে অক্ষরের উপর অক্ষর সাজাইয়া যান যে, তাহাদের মিলিত কলধ্বনি শ্রুতিকে সহজেই বশীভূত করিয়া ফেলে। কর্ণও বিনা লাভে বশ্যতা স্বীকার করে না। লীলা-হিল্লোলিত ছন্দোঝঙ্কার কর্ণের স্নায়ুমণ্ডলকে এমনি তালে তালে স্পন্দিত করে যে, তাহাতে প্রাণমূলে একটি সুখানুভূতি হয়। এই সুখানুভূতিই পাঠক বা শ্রোতার পক্ষে যথেষ্ট লাভ। বিনা অর্থবোধে যে আনন্দ-সঞ্চার, তাহার সম্ভোগকে বলে "অপ্রবুদ্ধ উপভোগ।" সাহিত্য-দর্পণকার বলিয়াছেন,—"অবিদিতগুণাপি সৎকবি-ভণিতিঃ

বমতি হি কর্ণেষু মধুধারাম্।" রস-রচনা 'অবিদিতগুণা' হইলেও কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে।

অর্থই যে বড় একটা লাভ নয়, তাহাও ইংরাজ কবি Wordsworth তাঁহার The Solitary Reaper নামক কবিতায় স্পষ্টই ইঙ্গিত করিয়াছেন। দুর্বোধ ভাষায় বা বিদেশী ভাষায় রচিত সঙ্গীত বা শুধু সা-রে-গা-মায় সাধা সঙ্গীতের প্রভাব প্রাঞ্জলার্থক সঙ্গীতের প্রভাব হইতে কিছুমাত্র অল্প নহে। আবৃত্তি স্বর-তাল-মান-লয়-যুক্ত 'সঙ্গীত' নহে বটে, কিন্তু উহা স্বর-গ্রামের স্বর-পর্যায়ে পাঠ ও সঙ্গীতের মাঝামাঝি,—এমন কি, সঙ্গীতের কতকটা সমীপবর্তী, সেজন্য আবৃত্তি সঙ্গীতের ধর্ম ও মর্মপ্রভাব অনেকটাই লাভ করিয়াছে। যাঁহারা বলেন কবিতার অর্থ না বুঝিলেই কবিতাপাঠ একেবারে ব্যর্থ হইল, তাঁহারা ভ্রান্ত। তাঁহারা কেবলমাত্র সুবিহিত আবৃত্তি হইতেই যে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে, সে বিষয়ে অজ্ঞ। মেঘদূতের—

"বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ।
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্॥"

বা রবীন্দ্রনাথের—

"ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে—
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা,—
শ্যামগম্ভীর সরসা॥"

ইত্যাদি আবৃত্তি করিলে অন্তর স্বতঃই 'মেঘৈর্মেদুরং' হইয়া উঠে, নয়নে ঘন-জাল ঘনাইয়া আসে। জয়দেবের—

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে,
মধুকরনিকর-করম্বিতকোকিল কূজিতকুঞ্জ-কুটীরে।"

ইত্যাদির আবৃত্তি বসন্তকে প্রমূর্ত করিয়া নয়নসম্মুখে আনিয়া দেয়। সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' আবৃত্তির গুণে যেন আমাদের চারিপাশে নাচিয়া বেড়ায়। তাঁহার 'দূরের পাল্লায়' যেন নৌকার দাঁড় হইতে জলের ছিটে গায়ে লাগে। এ সকল কবিতার অর্থ জানাই কি একমাত্র লাভ? যাহাদের সহিত আবৃত্তি সাহায্যে 'প্রত্যক্ষ' পরিচয় ঘটিয়া যাইতেছে, তাহাদের সহিত জ্ঞানগত 'পরোক্ষ' পরিচয় হয়, ভালই,—না হয় তাহাতেও বিশেষ ক্ষতি নাই।

শ্রুতিসুখদানেই আবৃত্তির মূল্য পরিচ্ছিন্ন হয় না। আবৃত্তি অর্থবোধেরও যথেষ্ট সাহায্য করে। যে অর্থ সাধারণ পাঠে বিশদ হয় না, তাহা উদাবৃত্তিতে অনেক

সময় সুবোধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু আবৃত্তির সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয়তা রসবোধে। অন্তর্নিহিত রসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই কবি ছন্দোনির্বাচন ও পদবিন্যাস করেন,—সে জন্য সম্পূর্ণ অর্থবোধ না হইলেও ছন্দের রসানুগত আবৃত্তি মাত্রই শ্রোতার চিত্তে রসসঞ্চার করিয়া থাকে। যেখানে অর্থগত রস অনায়াসগম্য, সেখানে আবৃত্তি, রসকে ঘনায়িত ও সুগম্য করিয়া তুলে।

রসসৃষ্টির পক্ষে "কাকু"র প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নহে, অর্থবোধেও 'কাকু' যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়া থাকে। এই 'কাকু'ই আবৃত্তির একটি অঙ্গ। আবৃত্তি-কালে স্বর-ভঙ্গীই মৃদু হাস্যকে অট্টহাস্যে উচ্ছ্বসিত করে, কণ্ঠের গদ্‌গদ্‌ ভাবেই কারুণ্যকে অশ্রুতে উচ্ছলিত করিয়া তুলে। স্তবপাঠ বা মন্ত্রোচ্চারণকালে ধীরগম্ভীর স্বরতরঙ্গ অর্থানভিজ্ঞ ব্যক্তিরও শীর্ষকে স্বতঃই অবনত করিয়া দেয়, ধর্মদ্রোহীর চিত্তকে বিগলিত করিয়া দেয়, রোষের অরুণকেও রসের বরুণের বশাধীন করিয়া তুলে। নাট্যাভিনয় দেখিয়া লোকে যে হর্ষ, সংক্ষোভ, ভাবোন্মাদনা, সমবেদনা ইত্যাদিতে অভিভূত বা উত্তেজিত হইয়া পড়ে—অথচ নাটক-পাঠে অবিচলিত থাকে, তাহার একটি কারণ নাটকীয় রচনার ভাবানুগত আবৃত্তি।

শিশুর চিত্তে আবৃত্তি যে কি প্রভাব সঞ্চার করে, তাহা সর্বদেশের ঠাকুরমা-রা জানেন, শিশুরাও জানে, তাই তাহারা অর্থহীন 'আগাডুম বাগাডুম' ছড়া শ্লোকও যখন তখন আবৃত্তি করিয়া থাকে। শিশুগণ যখন আবৃত্তি করে, তখন প্রয়োজন-মত ভাবানুযায়ী অঙ্গভঙ্গী না করিয়া থাকিতে পারে না—এমন কি তালে তালে তাহাদের সর্বাঙ্গ লীলায়িত ও চরণদুটি নৃত্যচপল হইয়া উঠে। শিশুগণের আবৃত্তি শুনিয়া ও 'দেখিয়া (?)' মনে হয় আবৃত্তির মধ্যে একাধিক কারুকলা মিলিয়া-মিশিয়া একটি অপরূপ মিশ্র চারুকলার সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতা, সঙ্গীত, অভিনয়-বিদ্যা নৃত্যকলা এই চারিটি কলা-বিদ্যাই—কোনটি স্ফুট, কোনটি অস্ফুটরূপে সচিত্র 'সরূপ' আবৃত্তি-শিল্পের মধ্যে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত!

রসনাগত বৈচিত্র্য ও ভাবানুগত অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে আবৃত্তি করিলে আমরা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে উপহাস করিয়া থাকি। কিন্তু—শোভনাঙ্গী তরুণী ও সুকুমার বালক যখন আবৃত্তিকালে অঙ্গভঙ্গী করে, তখন আমরা আনন্দলাভ করি। যদি কোন বালিকা বিদ্যাপতির—

"হাতক দরপণ, মাথক ফুল।
নয়নক অঞ্জন, মুখক তাম্বুল॥

হৃদয়ক মৃগমদ, গীমক হার।
দেহক সরবস, গেহক সার॥
পাখীক পাখ, মীনক পাণি।
জীবক জীবন হম তুঁহু জানি॥

এই পদ্যাংশটির অঙ্গভঙ্গীসহকারে আবৃত্তি করে, প্রয়োজন-মত তাহার ক্ষুদ্র পাণি ও অঙ্গুলিগুলিকে একবার দর্পণ, একবার অঞ্জন-শলাকা, একবার তাম্বূল, একবার পাখীর পাখায় পরিণত করিতে থাকে—তবে সে আবৃত্তি আমাদের চিত্তহরণ করিতে বাধ্য। ঐরূপ আবৃত্তিভঙ্গী মনে কল্পনা করিতেই আনন্দ হয়। আমাদের রাঢ়দেশের বালিকাদের ভাদু বা ভাজোর ছড়া আবৃত্তির কথা মনে পড়ে। আবৃত্তি স্বতই অঙ্গের লাসবিলাসে প্রমূর্ত ও সম্পূর্ণাঙ্গ হইতে চায়। আমরাও ভাবকে ভঙ্গীতে ও রসকে রূপে অভিব্যক্ত দেখিতে ভালবাসি। সঙ্গীত, অভিনয়-বিদ্যা, নৃত্যকলাও আবৃত্তির মতই ঐরূপ প্রত্যাশা করে। তিথ্যাদিতত্ত্বে আবৃত্তি কিরূপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে বিধান আছে।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বর-সমাযুক্তং রসভাব-সমন্বিতং॥
সপ্তস্বর-সমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ রসান্ সর্বান্ বাচয়েদ্বাচকোনৃপ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণে আবৃত্তির দোষেরও বিবৃতি আছে।

"শঙ্কিতং ভীতমুদ্‌ঘুষ্টমব্যক্তমনুনাসিকং।
বিস্বরং বিরসঞ্চৈব বিশ্লিষ্টং বিসমাহতং॥
কাকস্বরং শিরসিতং তথা স্থানবিবর্জিতং।
ব্যাকুলং তালহীনঞ্চ পাঠদোষাশ্চতুর্দশ।
সংগীতং শিরসঃ কম্পমল্পকণ্ঠমনর্থকম্।"

কবির রচনায় কোন ত্রুটি থাকিলে আবৃত্তিকালে ধরা পড়িয়া যায়। পক্ষান্তরে, নির্দোষ আবৃত্তি না হইলে কবির রচনার গুণগুলিও অলক্ষিত রহিয়া যায়, কবির শব্দালঙ্কারগত অনেক প্রয়াস ও অনেক কলাচাতুর্যই ব্যর্থ হইয়া যায়—অনুপ্রাস, যমক, ছন্দঃস্পন্দ, মিল, পদ-বিন্যাসগত কলা-কৌশল অনুপভুক্ত ও অনাদৃত রহিয়া যায়।

সংস্কৃতে হ্রস্ব ও দীর্ঘের উচ্চারণের প্রভেদ থাকায় স্বতঃই স্বরবৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। সুরচিত সংস্কৃত শ্লোকের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃত মূল্য আবৃত্তির উপরই নির্ভর

করে। সেজন্য সংস্কৃতের প্রায় সর্বশাস্ত্রই আবৃত্তি করিয়া পড়িবার নিয়ম ছিল। বেদের কথাত পূর্বেই বলিয়াছি। চতুষ্পাঠীর বালক ছাত্রগণকে ব্যাখ্যা না করাইয়া ব্যাকরণ, অভিধান, আয়ুর্বেদ পর্যন্ত কেবল আবৃত্তি করানো হইত। বালকের মেধা তীক্ষ্ণ ও অক্ষুণ্ণ, কিন্তু বাল্যে ধী-শক্তির উন্মেষ হয় না। আবৃত্তি সহজেই আবৃত্ত গ্রন্থকে স্মৃতির বশীভূত ও ধৃতির অধিগত করিয়া তুলে। আবৃত্তির দ্বারা বালকের মেধাশক্তির সদ্ব্যবহার হইলে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ও গুরুর উপদেশে বোধের উন্মেষ হইতে থাকে। যখন গ্রন্থ দুর্লভ ছিল তখন স্মৃতিকে সর্ববিদ্যা সংরক্ষণের ভার দেওয়া হইত।

আবৃত্তি মানব-মনের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে, দেবতার মনের উপরও সেই প্রভাব সঞ্চার করিবে,—এই প্রত্যাশায় আর্যগণ আপনাদের প্রার্থনা ছন্দে আবৃত্তি করিতেন—তাই পজ্ঝটিকা, তোটক, দোধক, স্রগ্ধরা ইত্যাদি শ্রুতিসুভগ ছন্দে বহু স্তোত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। স্তবের নির্দোষ আবৃত্তি না হইলে তাঁহারা আপনাদিগকে অপরাধী ভাবিতেন, তাই স্তবান্তে বলিতেন—

"যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রাসাদাৎ মহেশ্বরি।
যদত্র পাঠে জগদম্বিকে ময়া বিসর্গবিন্দ্বক্ষরহীনমীরিতং।
পূর্ণং তদেবাস্তু তব প্রসাদতঃ সঙ্কল্পসিদ্ধিশ্চ সদৈব জায়তাং॥
যন্মাত্রাবিন্দুবিন্দুদ্বিতয়পদপদদ্বন্দ্ববর্ণাদিহীনং।
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রভবকৃতিবশাদ্ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতন্তে স্তবেহস্মিন্।
তৎসর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎপ্রসাদাৎ প্রসীদ॥
"যোহসৌ ধন্যোমুনিনিগদিতং পঠ্যতে ভক্তিভাবান্
মাত্রাহীনং পদমধিগতং পাদগাথাক্ষরং বা॥
জিহ্বাদোষৈঃ পবনরহিতৈঃ শ্লেষ্মাদোষৈঃ প্রকারৈ
যূয়ং দেব্যস্ত্রিভুবনগতা মাতৃরূপাঃ ক্ষমধ্বং॥"
ইত্যাদি।

স্তবাদির আবৃত্তিতে ত্রুটি হইলে কেবল দেবতার কাছে নয়, মানুষের কাছেও অপরাধী হইতে হয়। স্তোতা ও শ্রোতা উভয়েরই অকল্যাণ হয়। চণ্ডীপাঠ ও গীতাপাঠ ইত্যাদির প্রসঙ্গে অপরাধ ও তাহার আশঙ্কিত দণ্ডের কথা শাস্ত্রে আছে।

ধর্মের প্রসঙ্গ থাকুক। বর্তমান যুগে তাহার মূল্য নাই। সকল প্রকার আবৃত্তির

সম্বন্ধেই প্রকারান্তরে একথাটা খাটে। নির্দোষ সুবিহিত আবৃত্তি না হইলে অভিজ্ঞ শ্রোতামাত্রেই আবৃত্তিকারকে অপরাধী মনে করেন। শ্রদ্ধাশীল শ্রোতা তাহার বন্দনীয় কবির ছন্দের বিরূপ, বিকৃত ও বিরস আবৃত্তি সহ্য করে না—কাব্য-সরস্বতীর কোন সেবকই সে অপরাধ ক্ষমা করে না। আবৃত্তিকার নিজের কাছেও নিজে অপরাধী। নির্দোষ সুসঙ্গত আবৃত্তিতে যে নির্মল আত্মপ্রসাদ অন্তর হইতে পুরস্কারস্বরূপ পাইবার কথা, তাহা তিনি পান না।

বৈতালিকগণ প্রভাতে সন্ধ্যায় স্রগ্ধরা, মন্দাক্রান্তা ইত্যাদি ছন্দে রাজবন্দনা আবৃত্তি করিত। মুদ্রারাক্ষস নাটকে চন্দ্রগুপ্তের চারণদ্বয়ের রাজপ্রশস্তি আবৃত্তির প্রভাব যে কত, কবি তাহা দেখাইয়াছেন। বন্দী বৈতালিকের মুখে আপনার মহিমা কীর্তন শুনিয়া রাজার রাজোচিত গৌরব, আত্মনির্ভরতা ও ওজঃশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত। পরবর্তী যুগে ভাট ও নকীবগণ বৈতালিকের কাজ করিত। নান্দী, মঙ্গলাচরণ, স্বস্তিবাচন, ভরতবচন, প্রণতি, আশীর্বাদ ইত্যাদি সমস্তই আবৃত্তি দ্বারা নিষ্পন্ন হইত। কবিপণ্ডিতগণ রাজসভায় আবৃত্তি করিয়া পুরস্কার লইয়া আসিতেন। ব্যাখ্যার জন্য নহে, কেবলমাত্র আবৃত্তির জন্য আজও অনুষ্ঠানবিশেষে চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ, বিরাটপাঠ চলিয়া আসিতেছে। নির্দোষ আবৃত্তি আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত—মন্ত্রোচ্চারণের ও সূক্তশ্লোকের আবৃত্তিতে কোন দোষ থাকিলে অনুষ্ঠানের অঙ্গহানি হইত।

কাব্যের ত কথাই নাই। বিনা আবৃত্তিতে মেঘদূত মেঘদূত-বধে কুমারসম্ভব কুমারসংহারে ও ঋতু-সংহার সত্যসত্যই ঋতুর সংহারে দাঁড়াইবে। নৈষধের যাহা প্রাণস্বরূপ, সেই পদলালিত্য, আবৃত্তির উপরই নির্ভর করিতেছে। সুরজ্ঞান না থাকিলে গান গাওয়া যায় না, কিন্তু সামান্য ছন্দোজ্ঞান থাকিলেও গীতগোবিন্দ আবৃত্তি করা চলে। কেবলমাত্র আবৃত্তিই গীতগোবিন্দকে এত শ্রুতিসুভগ করিয়া তুলে যে, সুরতানে পরিগীত না হইলেও গীতগোবিন্দের গীত বা গোবিন্দের অমর্যাদা হয় না—স্বর-তরঙ্গের হিন্দোলায় দুলিয়া দোলগোবিন্দও অপ্রসন্ন হন না।

অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিগণ ব্রজবুলিতে পদরচনা করিয়াছেন; ব্রজবুলিতেও সংস্কৃতের মতই হ্রস্বদীর্ঘ স্বরের প্রভেদ রক্ষার নিয়ম ছিল, সেজন্য বৈষ্ণবপদগুলি আবৃত্তির উপযোগী। কীর্তনিয়াগণ কীর্তনগান-কালে কতক গাহিয়া, কতক কেবলমাত্র আবৃত্তি করিয়া আমাদের চিত্তরঞ্জন করেন। "মঙ্গলকাব্য"গুলিও পালা হিসাবে কতক 'গীত', কতক আবৃত্ত হইত। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত সুর-সংযোগে আবৃত্তি করিয়া পাঠ করা হইত বলিয়াই ঐ দুই গ্রন্থ বাঙ্গালী নরনারীর

চিত্তগঠনে এত সাহায্য করিয়াছে।

মনসার ভাসান, মানিকপীরের গান ইত্যাদি নামে মাত্র গান, উহা সুর করিয়া আবৃত্তিমাত্র। সত্যনারায়ণের পাঁচালী হইতে ছেলে-ভুলানো ছড়া পর্যন্ত সমস্ত লোক-সাহিত্য এবং ব্রতপার্বনের অঙ্গস্বরূপ সমস্ত অন্তঃপুর-সাহিত্যই আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়াছে। আবৃত্তিকেই আশ্রয় করিয়া কথকতা বহুকাল আমাদের দেশের লোক-শিক্ষার ভার লইয়াছিল। আজও অনেক বাঙ্গালী পল্লী-বাসিনী পুণ্যশ্লোক-গণের নামের পুণ্য শ্লোকমালার সহিত নরোত্তম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণের শত নাম' প্রভাতে আবৃত্তি করিয়া গাত্রোত্থান করেন। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কণ্ঠস্বরে স্তোত্র, ছড়া, পাঁচালী, শ্লোক ও শিশুরঞ্জন ছন্দের মিলিত ঝঙ্কারে পল্লীসন্ধ্যাগুলি কলমুখরিত হইয়া উঠিত।

বর্তমান কাব্যসাহিত্যের মধ্যে মেঘনাদবধ মেঘনাদে আবৃত্তি করিয়া না পড়িলে কবির প্রতি অবিচার করা হইবে। বাঙলাকাব্যে সংস্কৃতের ন্যায় স্বরবৈচিত্র্যের ও হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদের অভাব ছিল, সে জন্য ব্রজবুলি ভাষার কবিদের পর মাইকেলের পূর্ব পর্যন্ত বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্য বৈচিত্র্যহীনতার জন্য আবৃত্তির কতকটা অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছিল। তাই, মাইকেল যখন বহুদিন পরে বঙ্গ-কাব্য-সাহিত্যকে আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিলেন, বঙ্গীয় পাঠক প্রথমটা তাঁহার সৃষ্টি-মর্যাদা উপলব্ধি করিতে পারে নাই।

অনেকে তাঁহার প্রবর্তিত রচনাভঙ্গীকে ব্যঙ্গ করিয়া অনেক কুকাব্য অকাব্য রচনা করেন এবং ব্যঙ্গাত্মক বিকৃত আবৃত্তি করিয়া মেঘনাদবধকেই বধ করিবার চেষ্টা করেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করিয়া একটি অপূর্ব স্বর-তরঙ্গের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিলেন, ওজস্বিতা ও তেজস্বিতায় বলিষ্ঠ করিয়া ভাষার 'পদবিক্রমকে' পৌরুষশক্তিসম্পন্ন করিয়া তুলিলেন। মাইকেলের ছন্দোভঙ্গী আবৃত্তির উপযোগী হওয়ার পরে উহা বঙ্গদেশের কাব্য ও নাট্যে সাগ্রহে অনুকৃত হইতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ বহু বিচিত্র, শ্রুতিসুভগ, সম্পূর্ণ রসানুগত ভাব-সমঞ্জস ছন্দের প্রবর্তন করিলেন এবং যুক্তাক্ষরের জন্য দীর্ঘমাত্রার মর্যাদার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। নানা-কৌশলে ছন্দঃস্পন্দ-সৃজনে রচনাকে তরঙ্গায়িত করিয়া শিশুরঞ্জন ও জনরঞ্জন হসন্ত-বহুল ছড়ার ছন্দকে ভাবগর্ভ সৎকাব্যে আভিজাত্য-গৌরবদান করিয়া এবং অসমমাত্রিক স্বচ্ছন্দগতি 'তাজমহলী' ছন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গকাব্য-সাহিত্যকে সর্বাঙ্গসুন্দর আবৃত্তির উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন।

তাঁহার প্রধান শিষ্য, ছন্দের জাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ হসন্ত ও স্বরান্ত অক্ষরের মিলনমাধুর্য লক্ষ্য করিয়া তাহাদের সন্নিবেশ-ব্যবধানকে নিয়মিত করিলেন। তাহার ফলে বঙ্গকাব্যসাহিত্যে অপূর্ব ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হইয়াছে। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালও ঐ হসন্ত-বহুল ছড়ার ছন্দে নানাবিচিত্র ভঙ্গী সৃষ্টি করিয়া কৌতুক-কবিতাগুলিকে আবৃত্তির সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া তুলিয়াছেন।

আমাদের কাব্যসাহিত্য এখন আবৃত্তির উপযোগিতায় সংস্কৃত, পারসী, ইংরাজী ইত্যাদি ভাষার কাব্যসাহিত্য হইতে হীন নহে,—বরং ছন্দোবৈচিত্র্যের এবং নবপ্রবর্তিত ছন্দোহিল্লোলের জন্য ইংরাজীকেও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

কবিরা ত তাঁহাদের কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন—কিন্তু "একাকী গায়কের নহে ত গান!"—

"তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে ত কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে ত মর্মর ফুটে।"

রসপিপাসু পাঠকেরও কর্তব্য আছে। তাহাকেও প্রস্তুত হইতে হইবে, নতুবা তাহার পক্ষে রবীন্দ্রযুগের বাংলা কবিতাপাঠ ব্যর্থ হইবে। সকল শাস্ত্রেরই মর্মজ্ঞকে, সকল জ্ঞান-শাখার রসজ্ঞকে সাধনা করিয়া শিক্ষার্থী হইয়া পূর্বেই যোগ্যতা ও অধিকার অর্জন করিতে হয়। কাব্যের বেলায় অন্যথা হইতে পারে না। অথচ আমাদের পাঠকগণের বিশ্বাস কাব্যের রসগ্রহণের জন্য কোনপ্রকার পূর্বতন শিক্ষাসংস্কারের প্রয়োজন নাই। সেজন্য পল্লীবিপণির গন্ধবণিক হইতে নগরের গ্রন্থবণিক পর্যন্ত সকলেই নিঃসঙ্কোচে কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে দায়িত্বশূন্য মতামত ব্যক্ত করেন। সেজন্য এদেশে রবীন্দ্রনাথের কাব্যেরও যথাযোগ্য সমাদর হয় নাই।

পাঠককে বর্তমান যুগের ছন্দোনুগ কাব্যের ছন্দ, যমক, অনুপ্রাস, ছন্দঃস্পন্দ, যতি, মাত্রা, মিল ও কাব্যের অন্যান্য কারুকৌশলসম্বন্ধে কতকটা জ্ঞান অর্জন করিতে হইবে—শ্রুতি ও মতিকে রসগ্রহণের অধিকারী ও উপযোগী করিয়া তুলিতে হইবে। বাগ্‌যন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সৌকণ্ঠ্যের সৌভাগ্য সকলের না থাকিতে পারে, কিন্তু শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা সকলেই ছন্দোবোধ অর্জন করিতে পারেন।

আবৃত্তির পক্ষে স্বরব্যঞ্জনের মাত্রাজ্ঞান, গুরুলঘুবোধ, হ্রস্বদীর্ঘবোধ বিশেষ প্রয়োজনীয়। যতিজ্ঞান আবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। শব্দান্তে যতি ধরা সহজ, সংস্কৃত শ্লোকে শব্দের মধ্যে মধ্যে যতি থাকে—যতিজ্ঞান না থাকিলে সংস্কৃত

ছন্দের আবৃত্তি অসম্ভব। বাংলা কবিতাতেও অনেক সময় শব্দের মধ্যে যতি থাকে।

"চরণ পদ্মে। মম চিত নিস্। পন্দিত করহে।
নন্দিত কর। নন্দিত কর। নন্দিত করহে॥"

উপরের পংক্তিতে 'নিস্' এর পর যতি দিতে না পারিলে 'নিস্পন্দিত' শব্দটি দেবতার পদে ও কবিতার পদে—দুইয়েতেই নিস্পন্দিত রহিয়া থাকিবে।

গল্প-সাহিত্যের গোড়ার কথা

জীবনের যে আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার সামর্থ্য আমাদের নাই, আমরা কল্পনায় সেই আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে চাই। সে আকাঙ্ক্ষা যে মিটাইতে পারিয়াছে, তাহার গল্প শুনিতে আমরা ভালবাসি। এ সংসারে মানুষের সকল সাধ মিটে না, পীড়া আছে, দৈন্য আছে, জরা আছে, মরণ আছে, আরো কত কি বাধা আছে। মানুষ তাই মরণের পারে স্বর্গ কল্পনা করিয়াছে, যেখানে জরা-পীড়া কিছুই নাই, জীবিকা অর্জনের ক্লেশস্বীকার করিতে হয় না। সেখানে অফুরন্ত ভোগ্য বস্তু, অফুরন্ত সম্ভোগের অধিকার, ভোগের ধারায় কোন দিন ছেদবিরাম পড়িবে না। মানুষ এই স্বর্গকে কল্পনায় মনের মত করিয়া সাজাইয়াছে। বাসনাই বিশ্বাসের জননী। কল্পনাকে তাই সে সত্য করিয়া তুলিয়াছে, সত্য বলিয়া যে নিজে বুঝে নাই—সেও সত্য বলিয়া পরকে বুঝাইয়াছে। শেষে স্বর্গ এমনি কাম্যবস্তু হইয়া উঠিয়াছে, যে তাহার আশায় মানুষ ইহসংসারের ভোগ্যকেও পায়ে ঠেলিতে শিখিয়াছে। মানুষের সমাজ-গঠন-রক্ষণে ও নীতিধর্মের অনুশীলনে এই কল্পনাসৃষ্ট 'স্বর্গ' কতই না যুগে যুগে সাহায্য করিয়াছে।

মানুষের অপরিতৃপ্ত বাসনা এমনি করিয়া কল্পতরু, উচ্চৈঃশ্রবা, পক্ষিরাজ ইত্যাদি কত সৃষ্টিই না করিয়াছে! স্বপ্নকে সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য স্বপ্নবিলাসীর দল কত তর্কই না করে, কত শ্লোকই না রচনা করে অথবা আবৃত্তি করে,—কত চেষ্টাই না করে!

যে সকল কাণ্ড মানুষের ক্ষমতার অতীত—মানুষ যে সকল কাণ্ড ঘটাইতে

পারে না বলিয়া ক্ষুণ্ণ—সে-সকল কাণ্ডের অতিরঞ্জিত বা রসমণ্ডিত গল্প শুনিয়া সে অসম্পূর্ণ শক্তির ক্ষোভ নিবৃত্তি করে। সেই জন্য কত দেবদেবী, দৈত্যদানব, অপ্সর-কিন্নর, হুরী-পরী, ভূত-প্রেত, যক্ষরক্ষঃ, অতিকায় জীবজন্তু, বিকৃতাঙ্গ নর-বানরের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের লইয়া কত অলৌকিক গল্পেরই না সৃষ্টি হইয়াছে! কত অপরূপ রূপলাবণ্যের কথা, কত শতহস্তীর মত বলবীর্যের কথা, কত কুবেরের ভাণ্ডারের কথা, মণিমুক্তা-সোনাদানার ছড়াছড়ি—বৈজ্ঞানিকযুগের আগের মানুষকে তৃপ্তি দিয়াছে।

দুর্বল শিশুর আকাঙ্ক্ষার সীমা খুব বিস্তৃত নয়—কিন্তু যে সকল সাধ আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে জাগে, তাহার কোনটিরই পরিতৃপ্তিসাধনের ক্ষমতা শিশুর নাই। শিশুর মূঢ়মনে যে সব সাধ জাগে, তাহা যেমন চাঁদ ধরার মতো আজগুবি, তাহার জন্য রচিত গল্প তেমনি সবই আজগুবি। শিশুর গল্প শুনিবার তৃষ্ণাও অফুরন্ত। নিজের সাধ্যাতীত বলিয়া, যে কোন কাণ্ডকারখানা অবলম্বনে রচিত গল্পই তাহার প্রীতি উৎপাদন করে। বিশ্বাস করিবার ক্ষমতা তাহার অসীম, তাহাকে ভুলাইবার, তাহার দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে স্তম্ভিত ও চমকিত করিবার জন্য অনেক গল্পের উদ্ভাবন করিতে হইয়াছে।

দরিদ্র ব্যক্তি ধনরত্নের ছড়াছড়ির, ভোজন-লোলুপ ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্যের, কাপুরুষ অলৌকিক শৌর্যের কল্পনা করিতে ও গল্প শুনিতে ভালবাসে।

শিশু যত বড় হইতে থাকে—যত তাহার জ্ঞানোদয় হয়—তাহার অদ্ভুত অসম্ভব আজগুবি সাধ আর থাকে না সত্য, কিন্তু নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা তাহার মনে অঙ্কুরিত হইতে থাকে—সকল আকাঙ্ক্ষা তাহারও মিটে না—তাহার শ্রোতব্য গল্পেরও তাই রূপান্তর হয়, কিন্তু গল্প শুনিবার তৃষ্ণা তাহার কমে না।

এ-সংসারে আদর্শ-পুরুষ খুব অল্পই মিলে। আদর্শ পতিব্রতা নারীও পথে ঘাটে পাতিব্রত্যের চরম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াও ঘুরে না—অথচ মানুষের বড়ই ইচ্ছা আদর্শ নরনারী দেখিতে। নিজে যাহা সে হইতে পারে নাই তাহাই চায় সে গল্পে দেখিতে। মানুষ নিজে যতই পাপ করুক—তাহার বড়ই ইচ্ছা ধর্ম পুরস্কৃত হউক—পাপ লাঞ্ছিত হউক, ধর্মের সহিত অধর্মের সংগ্রামে ধর্মই জয়ী হউক। কিন্তু হায় এ সংসারে তাহা তো হয় মা। মানুষের এ জন্য ক্ষোভের অন্ত নাই। এই ক্ষোভ সে মিটায় গল্পের নায়কনায়িকার জীবনে। যদি ধর্মের যথোচিত পুরস্কার ও অধর্মের যথোচিত শাস্তি না হইল তবে গল্প শোনা কেন? অধর্মের দণ্ড হইতে অব্যাহতি তো চোখের সামনেই সে দেখিতে পাইতেছে!

ইতিহাসের মানুষগুলির যদি শক্তিসামর্থ্য আমাদেরই মত অসম্পূর্ণ হয়, তবে তাহাদের কথা শুনিয়া কিশোর মনের তৃপ্তি হয় না। তবে আমাদের চেয়ে শক্তিমত্তর ব্যক্তি কেহ যদি, আমরা যাহা পারি না তাহাই পারিয়া থাকে, তবে তাহাদের ইতিহাসটা কিশোরদের ভাল লাগে। তাই অশোকের কাহিনীর চেয়ে শিবাজী-প্রতাপের কাহিনী শুনিতে তাহাদের আগ্রহ বেশি। তবু তাহারা যতটা অঘটনই ঘটাক, অলৌকিক কিছু ত করিতে পারে না। ইতিহাসেও অদ্ভুতকর্মা লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না। তাই বয়োবৃদ্ধির সহিত ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাসকেই আমরা বেশি ভালবাসি—সত্য অপেক্ষা স্বপ্ন আমাদের প্রিয়তর। প্রচুর পরিমাণে কল্পনার রস সংযোগে যদি ইতিহাস অর্ধোপন্যাস হইয়া উঠে, তাহা হইলে ইতিহাসও আমরা গলাধঃকরণ করিয়া থাকি। রণক্ষেত্রে মৃত্যু মাত্রকেই যদি দেশ বা ধর্মের জন্য প্রাণোৎসর্গ বলিয়া কীর্তিত করা যায়, তবে রণভীরু চির-পরাধীন কাপুরুষ জাতির বড়ই প্রীতিকর হয়। যে ইতিহাসে এই রূপ একটা কিছু আদর্শ খাড়া না করা হয়, সে ইতিহাস পরীক্ষার জন্য পাঠ্য,—চিত্তবিনোদের জন্য নহে।

জীবনে অবাধ ইন্দ্রিয়-লালসার তৃপ্তির উপায় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়-লালসায় অধীর, অথচ সমাজের বিধিবন্ধনের জন্য লালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে পারে না —কেবল মনে মনে লালসাতৃপ্তির কল্পনা করে, তাহারা কামকেলিময় গল্প রচনা করে অথবা পাঠ করে। জীবনে যাহাদের পরিতৃপ্তির সুবিধা হয় নাই, বিনাইয়া বিনাইয়া তাহারই বর্ণনা করিয়া তাহারা গল্প রচনা করে। সমাজের যে সকল রীতি-প্রথা বা বাধা-বাঁধনের জন্য অবাধ পরিতৃপ্তি সম্ভব হয় না—গল্পে সেইগুলিকে প্রাণপণে নিন্দা করে। আর যাহারা গল্প-রচনা করিয়া অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতা সাধন করিতে পারে না, তাহারা সেগুলি পড়িয়া মনের খেদ মিটায়।

শিক্ষাসভ্যতার সমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিত্তবৃত্তি মার্জিত হইতেছে, সেই সঙ্গে গল্প আর কল্প ও জল্পের মাঝামাঝি একটা কিছু অর্থাৎ 'কল্পিত জল্পনা' মাত্র নয়—এখন গল্প বলা একটা বিশিষ্ট শিল্পকলা বা আর্ট হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য আর্টের নিকট আমরা যাহা প্রত্যাশা করি—গল্পের কাছেও ঠিক তাহাই প্রত্যাশা করি। এখন আর আমরা গল্পের মধ্যে যাহা ঘটিলে ভালো হইত, যাহা হইলে আমাদের ক্ষোভ মিটিত তাহাই চাই না,—যাহা নিত্য ঘটিতেছে, যাহা কঠোর সত্য, যাহা অবাঞ্ছিত বাস্তব তাহাকেও রসানুরঞ্জিত ও কলাশ্রী-মণ্ডিত রূপে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করি। সভ্যতা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্প-বাসনাও সংযত

হইয়াছে—মানুষের শক্তির সীমা জানিতে পারিয়াছি—বিশ্বাস করিবার শক্তিও কমিয়াছে—তাই অসম্ভব বা অলৌকিকতাতে আমরা আর ভালবাসি না। এখন আর গল্পে আমরা আমাদের অপরিতৃপ্ত বাসনা বা আশা আকাঙ্ক্ষারই পরিতৃপ্তি খুঁজি না,—আদর্শ পাতিব্রত্য, কুবেরের অর্থসম্পদ, এক কথায় যাহা কিছু দুর্লভ দুর্গম অথচ চিরাভীপ্সিত তাহাই খুঁজি না। আমরা খুঁজি যাহা সাহিত্যের প্রধান সম্পদ তাহাই অর্থাৎ রস। অতৃপ্ত বাসনার চরিতার্থতা-সাধন একেবারে গল্পে চলে না, তাহা হয়, তবে তাহা ততটুকু, যতটুকু শিল্পকলার সহিত অসমঞ্জস নয়—যতটুকু তাহার রসসৃষ্টির পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল।

যাহা হইলে ভালো হইত—যাহা হওয়া উচিত—তাহা এখন আর গল্পের উপজীব্য নয়—এখন যাহা সত্যই ঘটে,—যাহা অনিবার্য তাহাই গল্পের উপজীব্য হইয়াছে। তবে কি এখনকার গল্প বাঙ্ময় ফোটো? ফোটো নয়, ফোটো অবলম্বনে আঁকা portrait. ইহাকে realistic art বলে। কিছুদিন আগে এই realistic রচনার মধ্যেও দুই একটি চরিত্র থাকিত—idea impersonated বা ভাববিগ্রহ। এই ভাববিগ্রহ আঁকা হইত অন্যান্য বাস্তব চরিত্রগুলিকেই আগে জীবন্ত ও জলন্ত করিয়া তুলিবার জন্য। এখন আর ভাববিগ্রহ অঙ্কন করা হয় না। এখনকার কথাসাহিত্যে বাস্তব নরনারীর আচরণের শুধু চিত্রাঙ্কন করা হয় না—তাহাদের মনের ক্রিয়াকলাপ ও লীলা-বিলাপের চিত্ররূপ দেখানো হয়।

কাব্য-বিচার

"রথ চলেছে সমারোহে বাজ্‌ছে শানাই ঢোল,
উড়ছে নিশান হাজার লোকে তুল্‌ছে কলরোল।
হুলু দিয়ে পুরাঙ্গনা লাজ বরিষে পথে,
সবই আছে, নেইক কেবল রথের ঠাকুর রথে।"

আমাদের সাহিত্যে কাব্যবিচারের দশাও তাই। ভাষার কথা উঠে, ভঙ্গীর কথা উঠে, ছন্দের কথা উঠে, চেরাপুঞ্জী-গোবিসাহারা-মার্কা শাণিত পংক্তির কথা উঠে, দুঃখবাদ, দেহাত্মবাদ ইত্যাদি নানাতত্ত্বের কথা উঠে—কেবল উঠে না

কাব্যের আত্মার কথা।

কবির কথার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া বলিতে হয়—

রসের কথা হেথা কেহ ত বলে না
করে শুধু মিছে কোলাহল।
রসসাগরের তীরেতে বসিয়া
পান করে শুধু হলাহল।

ভঙ্গী, ছন্দ, ভাষা অপূর্ব বা অসাধারণ রকমের না হইলেও, কোন একটা সমস্যা বা তত্ত্বের কথা না থাকিলেও যে কবিতা রসসম্পদ-হিসাবে সার্থক হইতে পারে, তাহা আজকালকার নবাঙ্কুরিত প্রতিভার সমালোচকরা ত ভুলিয়াও বলেন না।

রবীন্দ্রনাথের পর কেহ কেহ পদলালিত্য ও ছন্দোবৈচিত্র্যকে প্রাধান্য দিয়া কবিতা লিখিলেন। Poetic Conventionগুলির Permutation Combination করিয়া কিছু কিছু চাতুর্য দেখাইলেন। আবার কেহ কেহ রসকে কাব্যের প্রাণ-স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও রস সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া তথ্যভারক্লিষ্ট কবিতা রচনা করিলেন।

আবার একদল ইদানীং আসিয়াছেন—তাঁহারা সব Convention-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন, কাব্যের ভাষাকে গদ্যাত্মক করিয়া তুলিবার পক্ষপাতী। ইঁহারা কাব্যে একটা তত্ত্ব বা 'বাদ' ফুটিলেই বা কোন একটা তথাকথিত সত্যের আভাস থাকিলেই কাব্য সার্থক হইল মনে করেন ও মাঝে মাঝে গোটাকতক শাণিত পংক্তিও মাজিয়া ঘষিয়া কাব্যের মধ্যে পুরিয়া দেন। সমালোচকগণ বলেন, ঐ পংক্তিগুলির মধ্যেই কবির সর্বস্ব ভরা আছে। ইঁহারাও রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

উভয়দলই কাব্যের উপকরণ লইয়াই ব্যস্ত,—উপকরণগুলিকেই কাব্যের সর্বস্ব মনে করিয়া দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দ্বৈত ভাবের সহজেই সামঞ্জস্য হইতে পারে রসকে কাব্যের প্রাণস্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করার অদ্বৈতবুদ্ধিতে।

সমালোচকরাও উপাদান উপকরণ উপচার উপজীব্যেরই আলোচনা করেন—রসের সন্ধান করেন না—কোন কবিতায় রস থাকিলেও বিশ্লেষণ করিয়া দেখান না।

উপকরণকেই সৃষ্টির চরম লক্ষ্য মনে করিয়া তদ্‌গত থাকা সত্ত্বেও উভয়দলের কবিরা মাঝে মাঝে অসতর্ক হইয়া পড়িয়াছেন—তাহাতে মাঝে মাঝে এক-আধটি রসঘন প্রকৃত কবিতার জন্ম হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ইঁহাদের তপোভঙ্গ

ঘটিয়াছে, তাই ছোট ছোট শকুন্তলার জন্ম হইয়াছে। কবিরা হয়ত সেইগুলিকে অনাদর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত রস-সমালোচকের কর্তব্য কণ্বের মতো সেইগুলিকে সযত্নে প্রতিপালন করা।

চাই প্রকৃত সমালোচক—যে জানে, রসই কাব্যের হৃন্মর্ম। সে সমালোচক—একটা শাণিত পংক্তির আঘাতেই মূর্ছা যাইবেন না—সে সমালোচক—ছন্দের জলতরঙ্গ শুনিয়াই নিদ্রায় বিভোর হইবেন না—নির্লজ্জ কামলালসার মদিরতার স্বাদ পাইয়াই নেশায় বিভোর হইবেন না—কোন একটা অর্ধ-দার্শনিক অর্ধবৈজ্ঞানিক চিরপুরাতন তত্ত্বের আভাস পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইবেন না—তিনি কবিতায় খুঁজিবেন রস, কবির সমগ্র কাব্যজীবনে খুঁজিবেন একটা ব্রত বা message.

কাব্যের বহিরঙ্গের চমৎকারিতা ও ছন্দোমাধুর্যের প্রতি অনেকের সহজ বিদ্বেষ আছে। বিদ্বেষের কারণ, এদেশে এমন কবিতা জন্মিত যাহাতে কেবল ইহাই ছিল, আর কোন পদার্থ ছিল না। বহিরঙ্গের চমৎকারিতার কোন অপরাধ নাই। ইহা রসসৃষ্টির অনুকূল ছাড়া প্রতিকূল নয়। যদি কেহ বহিরঙ্গের চমৎকারিতার সঙ্গে অন্তরঙ্গেও কিছু দিতে পারে—অর্থাৎ রসসৃষ্টি করিতে পারে—তবে কি বহিরঙ্গের চমৎকারিতার অপরাধেই তাঁহার রচনা অস্পৃশ্য হইয়া থাকিবে?

পক্ষান্তরে—অনেকের বিশ্বাস বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব না থাকিলে কাব্যই হয় না—এ ধারণা তাঁহাদের রবীন্দ্র-কাব্যের পূর্ববর্তী কবিতাবলীর দুর্দশা দেখিয়া বোধ হয় জন্মিয়াছে। বহিরঙ্গের সৌষ্ঠব ও ছন্দবৈচিত্র্য ছাড়াও যদি কেহ রসসৃষ্টি করিয়া থাকে তবে তাহার রচনা নিশ্চয়ই কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। রসজ্ঞ ব্যক্তি সে শ্রেণীর রচনাকে কখনও অনাদর করিতে পারেন না।

অনেকের বিশ্বাস কাব্যের উপাদান একমাত্র অন্তরের সুকুমার অনুভূতি। তথ্য, তত্ত্ব, সমস্যা বা বুদ্ধিগম্য বিষয় কাব্যের উপাদান হইতে পারে না। সুকুমার অনুভূতি যত সহজে কাব্য হইয়া উঠে, এগুলি তত সহজে কাব্য হইয়া উঠে না। তাই বলিয়া এইগুলিকেও রসে পরিণত করিতে পারা যায় না তা নহে। রবীন্দ্রনাথ তাহা পারিয়াছেন। যদি কেহ তাহা পারেন, তবে বুদ্ধিগম্য বলিয়া রসজ্ঞ ব্যক্তি কখনও তাহা উপেক্ষা করিবে না।

যাহারা কাব্যকে কোন সত্যের বা তত্ত্বের বিবৃতিমাত্র মনে করেন, তাঁহারা আদৌ রসজ্ঞ নহেন। সাধারণতঃ দেখা যায়,—যাঁহারা কাব্যের টেকনিক ও রসসৃষ্টির কৌশলটি একেবারে বোঝেন না—তাঁহারা কাব্যের উপাদান-স্বরূপ গৃহীত সত্যকেই কাব্যের প্রতিপাদ্য সত্য মনে করেন এবং যে রচনায় কোন একটি সত্য বিবৃত বা

ঘোষিত হইয়াছে তাহাকেই সৎকাব্য মনে করেন। আজকাল এই শ্রেণীর সমালোচকের অভাব নাই। অতুলবাবুর কাব্যজিজ্ঞাসা রসের আদর্শ কি বুঝাইয়াছে —কিন্তু কাব্যের technique বা কাব্যসৃষ্টির কৌশলটি যে কি তাহা ত বলে নাই।

ঠিক ইঁহাদের বিপরীতশ্রেণীর সমালোচকগণ উপাদান-রসকেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রস মনে করেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে—কারুণ্য কাব্যের উদ্দিষ্ট সেই ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রস নয়—কারুণ্য কাব্যের উপাদানমাত্র—অন্যান্য উপাদান-রসের মত কারুণ্যকে অবলম্বন করিয়া সৎকাব্যের সৃষ্টি হইতে পারে, যদি উহা কাব্যের উদ্দিষ্ট রসও জাগাইতে পারে। কিন্তু এই সমালোচকের দল ঐ কারুণ্যকেই কাব্যের প্রাণস্বরূপ মনে করেন অর্থাৎ দেহকেই আত্মা মনে করেন।

মোটকথা, প্রকৃত সমালোচকের অভাবে এই সকল ভ্রান্তি তথাকথিত সমালোচকদের ধারণায় থাকিয়া গিয়াছে। চাই প্রকৃত সমালোচক—কাব্য একেবারে দুর্লভ নয়, কিন্তু রসজ্ঞ সমালোচক অত্যন্ত দুর্লভ।

রসজ্ঞ সমালোচক এদেশে থাকিলে রবীন্দ্রনাথের পরও কাব্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিত। সমালোচকরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তত্ত্ব নিষ্কাশন করিতে চান। কবি এই তত্ত্বকে বলিয়াছেন উপরি পাওনা। সমালোচকদের কাছে বেতনের চেয়ে উপরি পাওনাই বড়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার রস বিশ্লেষণ কাহাকেও করিতে দেখি না—আর টেকনিক তো তাঁহারা বুঝেনই না। নিজেরা কবিতা রচনা করিলে বুঝিতেন। এই সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ট্রেনিংও নাই। কাজেই তাঁহাদের সমালোচনায় কবিরা কোন সাহায্যই পান নাই, কবিদের ভ্রান্ত ধারণাও দূর হয় নাই।

প্রাকৃত দুঃখ ও কাব্যের দুঃখ

প্রাকৃত দুঃখের ঘটনা বা ঘটনার বিবৃতি আমাদিগকে বেদনা দেয়—কিন্তু কাব্যের দুঃখ আমাদিগকে আনন্দই দেয়। তাহা যদি না দিত, তাহা হইলে আমরা করুণ-রসাত্মক কবিতা এত আগ্রহসহকারে পড়িতাম না—টাকা খরচ করিয়া ট্রাজেডির অভিনয় দেখিতেও যাইতাম না। যে দুঃখ আমাদিগকে বেদনা দেয়—সেই দুঃখই কাব্যের উপাদান হইয়া আমাদিগকে আনন্দ দেয়—ইহা কিরূপে সম্ভবে?

কবি দুঃখকে কাব্যে উপভোগ্য করিয়া তোলেন বলিয়াই আমরা তাহা হইতে আনন্দ পাই। কবির রচনাকৌশলে, কবির লেখনীর মাধুরী-স্পর্শে চিরবর্জনীয় চির-অনীপ্সিত দুঃখও উপভোগ্য হইয়া উঠে। অন্য সকল রস-উপাদানের পক্ষে উপভোগ্য হইয়া উঠায় বৈচিত্র্য কিছু নাই—অস্বাভাবিকতা কিছু নাই। কিন্তু দুঃখ যে কখনও উপভোগ্য হইতে পারে, তাহা সাধারণ-বুদ্ধিতে আসে না—প্রত্যাশাই করা যায় না যে, সে উপভোগ্য হইবে। কাজেই সে যখন উপভোগ্য হয়,—তখন আর সকল রসোপকরণকে হারাইয়া দেয়।

দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠে বলিয়া,—দুঃখ যত গভীর হইবে—তাহা তত বেশি উপভোগ্য হইয়া উঠিবে, একথা কিন্তু সত্য নয়। দুঃখ যত গভীর হইবে, যত প্রাকৃত হইবে—যত বাস্তব হইবে—তাহাকে উপভোগ্য করিয়া তোলা তত কঠিন। এককথায় এরূপ দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠে না, পাঠককে ঠিক আনন্দ দেয় না—পাঠকের অন্তরে কাব্যরস-সঞ্চার করে না—সঞ্চার করে সমবেদনা। পাঠকের চোখে যে জল ঝরে—তাহা সমবেদনায়,—সে যে রচনার সুখ্যাতি করে তাহা রসবোধের আনন্দের ফলে নয়—কবির সহানুভূতিময় দরদী চিত্তের জন্য। সমবেদনার নাম রসবোধ নয়—দরদী চিত্তের প্রশংসা কবির প্রশংসা নয়। সমবেদনার গভীরতা রসবোধের গভীরতা নষ্টই করিয়া দেয়।

কৌশলী কবি দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য 'ব্যথার' নির্বাচনে খুব সতর্ক। মর্মভেদী ব্যথাকে কবি বর্জন করিয়া চলেন। মানুষের দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তোলা কঠিন বলিয়া কবিরা প্রকৃতির সহায়তা লইয়াছেন। প্রকৃতির নানা-বৈচিত্র্যে—বিবিধ অঙ্গে—নানারূপে তাঁহারা মানবিকতা আরোপ করিয়াছেন। মানবের বেদনাকে কবিরা প্রকৃতির কল্পিত জীবনে আরোপ করিয়া দুঃখকে

উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন। তাই কবির কাব্যে—পাখী, ফুল, চন্দ্র, সূর্য, তারা, নদী, তরু, লতা, প্রান্তর, গিরি ইত্যাদির বেদনার অন্ত নাই। এ বেদনা কাব্যে উপভোগ্য হয়,—সমবেদনার লোনা জলে এই বেদনার রস বিস্বাদ হইয়া উঠে না।

বাস্তব মানুষের প্রাকৃত বেদনাকে উপভোগ্য করা যায় না বলিয়া কবিরা যুগে যুগে কল্পনার নরনারীর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের কল্পিত বেদনাকেই কাব্যের উপাদান করিয়া তুলিয়াছেন। তাহাতে একেবারে সমবেদনা যে জাগে না তাহা নহে। সমবেদনা একেবারে না জাগাইতে পারিলে রসসৃষ্টিই সম্ভব হইত না। তবে সে সমবেদনা পাঠকচিত্তকে ব্যথিত বা পীড়িত করে না—রসাভাস ঘটায় না —তাহার কণ্টকিত বৃন্তে আনন্দের কুসুমই ফুটিয়া উঠে।

কল্পিত নরনারীর বেদনার পরই ইতিহাসের নরনারীর বেদনার কথা। যাহারা কল্পলোকে বাস করে তাহাদের কথা, আর যাহারা স্মৃতিলোক বা স্বপ্নলোকে বাস করে তাহাদের কথার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই।

যাহারা সকল দুঃখবেদনার অতীত লোকে চলিয়া গিয়া চিরদিনের জন্য সকল দুঃখ এড়াইয়াছে, তাহাদের বেদনার কথাও চিত্তকে অতিরিক্ত পীড়িত করে না।

কবি যখন কল্পিত বা 'প্রেত' নরনারীর বেদনার কথা লইয়া কাব্য রচনা করেন, তখন দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তোলার জন্য দুঃখের সঙ্গে সান্ত্বনা ও আশ্বাস জুড়িয়া দেন—লাঞ্ছিতের পুরস্কারের ও লাঞ্ছনাকারীর দণ্ডেরও ব্যবস্থা করেন।

যে শ্রেণীর নিদারুণ যন্ত্রণায় মানবাত্মা আর্তনাদ করিয়া উঠে, যে শ্রেণীর গভীর দুঃখে মানুষের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় বা চৈতন্যবিলোপ হয়, সে শ্রেণীর দুঃখকে বর্জন করিয়া কবিগণ কল্পিত নরনারীর জীবনের ছোটখাটো দুঃখকেই কাব্যের উপাদান-স্বরূপ গ্রহণ করেন। সেইজন্যই বোধ হয় প্রেমের বেদনা ও বিরহের ব্যথাই কাব্যে এত বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে। যে বেদনাকে আশ্রয় করিয়া অমর কাব্য মেঘদূত বিরচিত হইয়াছে—সে বেদনা অরুন্তুদ বেদনা নয় বলিয়া কাব্যে উপভোগ্য বেদনা-বিলাস হইয়া উঠিয়াছে এবং যুগে যুগে এত আনন্দ দান করে। মহাকাব্যের মধ্যে অনেক নিদারুণ যন্ত্রণাভোগের চিত্র আছে—মহাকাব্যকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজনও হইয়াছে ;—কিন্তু মহাকাব্যের সেই সকল চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে কি অপূর্ব কাব্য হইয়া উঠিয়াছে? যদি তাহা হইয়া থাকে—তবে ঐ যন্ত্রণা-ভোগের সৌভাগ্যময় পরিণতির সান্ত্বনা ঐগুলির সহিত বিজড়িত হইয়াই যন্ত্রণাকেও উপভোগ্য করিয়া তুলিতেছে বলিতে হইবে।

গীতিকাব্যের কবি আত্মজীবনের নিজস্ব দুঃখানুভূতিকে কাব্যের উপাদান

করিয়া তুলেন। নিজেই নিজের দুঃখকে উপভোগ করিতে না পারিলে কাব্যেও তাহাকে উপভোগ্য করিতে পারেন না। যে দুঃখে কবির জীবন জর্জরিত, যে দুঃখে তাঁহার কল্পনাবুদ্ধি হত-চেতন, যে দুঃখে তাঁহার আত্মা আর্তনাদ করিয়া উঠে—সে দুঃখ লইয়া কবি কাব্য লেখেন না,—লিখিলেও দুঃখকে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন না এবং তাহা ঠিক কাব্য হইয়াও উঠে না—দুঃখের বিবৃতি মাত্র হয়। নিজের দুঃখ হইলেও যাহার বিবৃতিতে কবি নিজে আনন্দ পান—তাহাই কাব্যে উপভোগ্য হইয়া উঠে। শ্রেষ্ঠ কবিগণ নিজ নিজ জীবনের ছোটখাট অতীত দুঃখের দ্বারাই শ্রেষ্ঠ কবিতা রচনা করিতে পারিয়াছেন। যে দুঃখ অতীত হইয়া হইয়া গিয়াছে সেই দুঃখের স্মৃতিকেই উপভোগ্য করা চলে। বর্তমানের যে বেদনা কবিকে কাব্যসৃষ্টিতে বাধা দেয়—পাঠক-চিত্তে সেই বেদনাই রসসম্ভোগেও বাধা দেয়। কোন কোন কবি নিজ নিজ জীবনের গভীর দুঃখ অবলম্বন করিয়াও শ্রেষ্ঠ-কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু সে কখন? গভীর দুঃখের বিক্ষোভ ও আলোড়ন যখন থামিয়া গিয়াছে—যখন চিত্তে আবার প্রসন্নতা, শান্তি ও প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়া আসিয়াছে—দুঃখ যখন Recollected in tranquillity, যখন চিত্তের শান্ত রসস্রোতে যখন গভীর দুঃখের স্মৃতিটুকু কেবল প্রতিবিম্বিত হইয়া আছে অর্থাৎ যখন গভীর বেদনা 'স্মৃতিবিলাসে' পরিণত হইয়াছে যখন দুঃখের আবেগোচ্ছ্বাস Serenity of contemplation এর রূপ লাভ করিয়াছে।

পাঠকের পক্ষে কাব্যের রসভোগ,—কাব্যকে আপন মনের মাধুরী দিয়া পুনর্বিরচন। রসভোগও এক প্রকারের 'কবিকৃতি'। যে দুঃখ কবির রস-সৃষ্টিতে বাধা দেয়, সে দুঃখ পাঠকের চিত্তে কাব্যের পুনর্বিরচনে যে বাধা দিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? সুকবি পাঠক-চিত্তে এমন বেদনার সৃষ্টি কখনও করেন না—যাহাতে ঐরূপ রসসৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মে।

দুঃখের কথা হইলেই পাঠক-চিত্তে বেদনা জাগিবে, এমন কোন কথা নাই। দুঃখের কথাকে কবি যদি বিনাইয়া বিনাইয়া এমন করিয়া বলেন, যাহাতে করুণ অতিকরুণ বা অকরুণরূপে করুণ হইয়া উঠে—পাঠকের চিত্তে রসক্ষরণ অপেক্ষা যদি নেত্রে অশ্রুক্ষরণই কবির উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে পাঠকচিত্ত কেন ব্যথিত হইবে না? মানুষ স্বভাবতঃ সহানুভূতিশীল—তাহার সহানুভূতি জাগাইবার প্রচেষ্টা করিলে তাহা জাগিবেই—আনন্দ জাগিবার অবসরই পাইবে না। সেজন্য কবির লেখনীতে চাই সংযম। কবির পক্ষে সকল ক্ষেত্রেই সংযম পরম ধর্ম—বিশেষতঃ কাব্যের উপাদান যদি হয় দুঃখ,—তখন সংযম ছাড়া কিছুতেই তাহাকে উপভোগ্য

করিয়া তোলা যায় না। দুঃখের কথাকেও এমন ভাবে উপস্থাপিত করিতে হইবে, যাহাতে দুঃখ পাঠকচিত্তে তীরের মত না বিঁধিয়া কেবল রসানন্দের উৎস-মুখটি খুলিয়া দিবে। অবারিত জলধারায় শস্য ভাসিয়া যায়, আলবালের বন্ধন ছাড়া শস্য বাঁচে না। রসের শস্য সম্বন্ধেও সেই কথা।

এই সংযম শুধু দুঃখানুভূতিরই সংযম নয়—প্রকাশভঙ্গিরও সংযম। কাব্যের অন্যান্য অঙ্গের সৌষ্ঠব, শোভনতা, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য ও মাধুর্য সৃষ্টি করিতে গেলেই এই সংযম আপনি আসে। দুঃখের কাহিনী সহজেই পাঠকচিত্ত বিগলিত করিবে এই ভরসায় ছন্দোবন্ধ, আলঙ্কারিকতা, ব্যঞ্জনা, কলাচাতুর্য ইত্যাদি কাব্যের বহিরঙ্গের দিকে উদাসীন হইলে ত চলিবে না। দুঃখের কাহিনী বলিয়া করুণা করিয়া রসলক্ষ্মী সমস্ত ক্রটী বা অভাব মার্জনা করিবে না। বরং দুঃখ যখন কাব্যের উপাদান, তখন বহিরঙ্গের চমৎকারিতা সম্পাদন আরও বেশী করিয়াই চাই—নতুবা দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠিবে কেন? যিনি সৎকবি, তিনি এ কথা বুঝেন। তাই তিনি দুঃখবাদী কবি যতীন্দ্রনাথের মত বক্রোক্তির দ্বারা প্রকাশভঙ্গিকে চিত্তাকর্ষক করিয়া, কাব্যের বাহিরঙ্গের অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়া—চিত্ততর্পণ কলাকৌশলের সাহায্যে দুঃখক্লেশকে উপভোগ্য করিয়া তোলেন—লোনা জলকেও ডাবের জল করিয়া তোলেন—অবাঞ্ছিতকেও বাঞ্ছনীয় করিয়া তোলেন। তাই অজ-বিলাপ রতিবিলাপও উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে, খুল্লনার দুঃখ উপভোগ্য হইয়া উঠে নাই। তাই রবীন্দ্রনাথের মত কবির কাব্যের 'উপকরণ' যদি বা কোন পীড়া দেয়, 'অলঙ্করণ' সে পীড়াকে আনন্দে পরিণত করে।

দুঃখকে কাব্যের উপাদান করিতে এতই যদি বিড়ম্বনা,—এতই যদি সতর্কতার প্রয়োজন—তবে যুগে যুগে কবিরা দুঃখকেই কাব্যের উপাদান করিয়াছেন কেন? পাঠকই বা করুণরসের কবিতারই এত পক্ষপাতী কেন? তাহার কারণ—দুঃখের মত মানবচিত্তের সুপরিচিত অথচ চিরবর্জনীয়, চির অবাঞ্ছিত অনুভূতিটিকে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে কবিরও যত আনন্দ, উপভোগ্যরূপে পাইতে পাঠকেরও তত আনন্দ। আনন্দের যে চির বিরোধী তাহাকে আনন্দের বশীভূত করাতেও যেমন কৃতিত্ব—সে আনন্দ উপভোগেও তেমনি অপূর্বতা। পঙ্ক যে পঙ্কজে পরিণত হইয়াছে ইহাতে স্রষ্টার কৃতিত্ব যেমন অপূর্ব—এই চিন্তাতেও আমাদের মনে বিস্ময়, আনন্দ ও তৃপ্তিও জন্মে তেমনি অপূর্ব।

প্রাকৃত দুঃখ কেবল অশ্রুসরোবর,—কবিতায় এই দুঃখই যখন উপভোগ্য হইয়া উঠে তখন অশ্রুসরোবর ভরিয়া উঠে রসের পঙ্কজ-মালায়।

কাব্যবিচার

কবিতার ভাববস্তু কোন কবিরই "উদ্ভাবিত" নয়, দূরবর্তী দেশ বা কালের সাহিত্য হইতে "আবিষ্কৃত" হইতে পারে। কোন কোন ভাববস্তু কোন কোন পাঠকের কাছে নূতন মনে হইতে পারে। কিন্তু অন্য বহু পাঠকের কাছে নূতন নয়। যাহার অল্পসংখ্যক কবিতা পড়া আছে, তাহার কাছে কোন কোন কবিতার ভাব নূতন ঠেকিতে পারে। যাহার দেশ-বিদেশের বহু কবিতা পড়া আছে, তাহার কাছে নূতন ভাববস্তু খুবই দুর্লভ। এক যুগের কবিতায় কোন ভাববস্তুর সন্ধান না মিলিতে পারে, অন্য যুগের কবিতায় হয়ত তাহা আছে। এক দেশের কবিতায় না পাওয়া গেলে অন্য দেশের কবিতায় পাওয়া যাইতে পারে।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তন, জাতীয় জীবনের পরিবর্তন ও যুগচক্রের আবর্তনে, নব নব ঘটনাপরম্পরার সন্নিপাতে ও অভিঘাতে, নব নব সমস্যার সমুদ্ভবে নব নব বিষয়বস্তু ও ভাব-সঙ্করের আবির্ভাব হইতে পারে। কিন্তু এই সকল বিষয়বস্তু ও ভাব-সঙ্কর চিরন্তন সামগ্রী নয়। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন ; আজ যাহা লোক-চিত্তকে বিচলিত করে, কাল হয়ত তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ—এককালে এ দেশে যে-সকল সামাজিক আচার ও আনুষ্ঠানিক সংস্কার কবিতার বিষয়বস্তু ছিল, আজ সেগুলির আর আবেদন নাই। দেশের পরাধীনতার গ্লানি এক সময় কাব্যের একটা বিষয়বস্তু বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর আর তাহার মূল্য থাকে না।

তাহা ছাড়া, যুগধর্মের আবর্তনে বিবর্তনে যে-সকল বিষয়বস্তু, সমস্যা ও ভাব-সঙ্করের উদ্ভব হয়, সেগুলি কোন কবির নিজস্ব সম্পদ হইয়া উঠে না, একই কালে তাহা প্রত্যেকেরই অধিগম্য ও উপজীব্য হইয়া উঠে। কে ঐরূপ বিষয়বস্তু বা ভাব-সঙ্কর লইয়া প্রথম কবিতা রচনা করিলেন, তাহা কাহারও মনে থাকে না, তাহা সাহিত্যের ইতিহাসের উপজীব্য হইয়া রহিয়া যায়।

যে-কোন বিষয়বস্তু বা ভাববস্তু, নূতনই হউক আর পুরাতনই হউক, যে-কবিতায় সর্বাঙ্গসুন্দর বাণীরূপ লাভ করিবে এবং রচনার কলাকৌশলে সর্বজনীন আবেদন লাভ করিবে, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা। অতএব কবিতার বিচারে ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুর উপর জোর না দিয়া প্রকাশভঙ্গীর উপরই জোর দিতে হইবে।

প্রকাশভঙ্গী বা টেকনিকই নূতন হইতে পারে এবং তাহাই কবির স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করিতে পারে। পুরাতন বা প্রচলিত বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুতেও সর্বজনীন আবেদন সৃষ্টি সম্পূর্ণ প্রকাশভঙ্গীর কলাপ্রকর্ষের উপর নির্ভর করে। ঐরূপ বিষয়বস্তু বা ভাববস্তুকে প্রচুর শক্তিপ্রয়োগে আলোড়িত করিলেই তাহা সম্ভব হয় না।

ভাববস্তু বা বিষয়বস্তু কবিতার পক্ষে সবচেয়ে বড় সম্পদ নয় বলিয়াই একই ভাব-বস্তু ও বিষয়বস্তু লইয়া যুগে যুগে বহু কবি কবিতা রচনা করিতে ইতস্তত করেন নাই—দেশ-কাল-পাত্রের উপযোগী অভিনব বাণীরূপ দানের উপরই নির্ভর করিয়াছেন।

আমি ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুকে একেবারে উপেক্ষা করিতে বলিতেছি না, তবে প্রকাশ-ভঙ্গীকে উপেক্ষা করিয়া কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়বস্তুর আলো-চনাকে কবিতার যথার্থ বিচার মনে করি না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কবিতা সম্বন্ধে আমাদের দেশের গ্রন্থ ও পত্রিকায় যত আলোচনা পড়ি, তাহাতে কেবল অন্তর্নিহিত ভাব বা বিষয়বস্তুর আলোচনাই দেখিতে পাই। কলেজের অধ্যাপনাতেও এই ধারাই চলে; কলেজের অধ্যাপনা পরীক্ষাভিমুখিনী, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের দ্বারা তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রশ্নপত্রে যদি কেবল কবিতার অন্তর্নিহিত ভাব ও বিষয়বস্তুর আলোচনাই চাওয়া হয় তাহা হইলে অধ্যাপনায় যথার্থ কবিতাবিচারের প্রত্যাশা করা যায় না। ফলে, আমাদের দেশে যাহারা কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হয়, তাহারা কবিতার প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করিতে পারে না। কবিতার রস প্রধানত নির্ভর করে প্রকাশভঙ্গীর উৎকর্ষের অর্থাৎ তাহার চাতুর্য মাধুর্য ও ঐশ্বর্যের উপর একথা তাহারা শিখে না।

সে-দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কাব্য বিচার করিতে গেলে কবিতা ও গদ্যসাহিত্য বিচারের মধ্যে পার্থক্যও স্বীকৃত হয় না।

প্রকাশভঙ্গীকে ইংরেজীতে বলে টেকনিক। এই টেকনিক সম্বন্ধে এখানে দুই চার কথা বলিতে চাই।

কবিতা নানা শ্রেণীর আছে; তাহাদের মধ্যে লিরিক এক শ্রেণীর কবিতা। সাহিত্য বলিলে এখন প্রায় সকলে কেবল গল্প উপন্যাস, খুব জোর তথাকথিত রম্য-রচনা—এক কথায় কথাসাহিত্যকেই বুঝে। ইহা যেমন ভুল, কবিতা বলিলে কেবল-মাত্র লিরিক কবিতা মনে করা তেমনি ভুল। যে-কবি লিরিক লিখিল না, যে শিশুদের জন্য কবিতা লিখিল, যে বর্ণনাত্মক কবিতা লিখিল, যে গাথা-কবিতা লিখিল

—সে কবিই নয়, ইহা ভুল ধারণা। এক মানদণ্ডেও সকল শ্রেণীর কবিতার বিচার চলে না। কবিতা-বিচারের আগে কোন্ শ্রেণীর কবিতা, তাহা বুঝিয়া লইয়া কবিতাবিশেষের কাছে তদনুরূপ উৎকর্ষ প্রত্যাশা করিতে হইবে।

কবিতাকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া বুঝা যাক। এক শ্রেণীর কবিতায় organic development-এর ধারা অনুসৃত হয়। ইহা ভাস্কর্য-শিল্পের অনুগামী। কবি এই ধারায় ভাবকোরককে ধীরে ধীরে সৌগন্ধ্যে, মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে ফুটাইয়া তুলেন—ধাপে ধাপে উন্মেষ সাধনের ফলে এমন অবস্থায় ভাবধারা আসিয়া পৌঁছায় যে, তাহার পর একটি চরণও যোগবিয়োগের উপায় থাকে না। বক্তব্যের আর কোন আকাঙ্ক্ষাও থাকে না। কবিতার প্রাণধর্ম নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া জীবদেহের মত সমগ্র রচনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া জীবন্ত করিয়া রাখে। জীবদেহের বিবিধ প্রত্যঙ্গের মত কবিতার প্রত্যেক অংশ কাব্যদেহের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ থাকে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাই এই শ্রেণীর। দুই চারিটির নাম করার প্রয়োজন। যেমন—'হৃদয়যমুনা', 'পুরস্কার' 'বিদায় অভিশাপ', 'যথাস্থান', 'অতীত', 'মদনভস্মের পূর্বে' ও 'মদনভস্মের পরে', 'পুরাতন ভৃত্য', 'ব্রাহ্মণ', 'গানভঙ্গ' ইত্যাদি।

আর এক শ্রেণীর কবিতা অনেকটা mechanical structure—ইহা স্থাপত্য শিল্পের অনুবর্তী। এই শ্রেণীর কবিতাকে ইচ্ছামত বাড়ানো কমানো যাইতে পারে। একটি ভাবসূত্রে চিত্রপরম্পরা বা আনুষঙ্গিক অনুভাব-পরম্পরা এই শ্রেণীর কবিতায় গ্রথিত থাকে। Organic developmentএর কবিতার মানদণ্ড এই শ্রেণীর কবিতার বিচারে প্রয়োগ করা উচিত নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের বহু কবিতা এই শ্রেণীর। কালিদাসের মেঘদূতই এই শ্রেণীর কাব্য। রবীন্দ্রনাথের 'নগর-সঙ্গীত', 'সেকাল', 'বর্ষামঙ্গল' ইত্যাদি অনেকটা এই শ্রেণীর। এবং কোন কোন চিত্রাত্মক কবিতা অনেকটা এই শ্রেণীর। "নৈবেদ্য" ও "স্বদেশ"-এর সনেট-পরম্পরা সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকমালার মত সূত্রে মণিগণা ইব—কণ্ঠে ধারণের যোগ্য। এই মাল্য আরও ছোট হইতে পারিত কিম্বা আরো বড় হইতে পারিত।

পরম্পরা (Sequence) অনুসারে কবিতার গঠন পরীক্ষা করা যাইতে পারে। প্রধানত এই পরম্পরা ত্রিবিধ—Emotional বা আবেগাত্মক, Rhetorical বা আলঙ্কারিক , Logical বা যুক্তিশৃঙ্খলামূলক। অবিমিশ্রভাবে কেবল যুক্তি-শৃঙ্খলা-মূলক, কেবল আবেগাত্মক, কেবল আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতা রচিত হইতে

পারে, আবার একই কবিতায় ত্রিবিধ অনুক্রমের অনুস্যূতিও হইতে পারে। যুক্তিমূলক অনুক্রমে সাধারণত একটি তত্ত্বের উন্মেষ সাধন বা তথ্য প্রতিপাদন করা হয়। এই প্রতিপাদ্য সত্যটি দিয়া কবিতার সূত্রপাতও হইতে পারে, অথবা তাহার দ্বারাই কবিতা উপসংহৃতও হইতে পারে। "শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?" এই প্রশ্ন দিয়া আরব্ধ রবীন্দ্রনাথের 'বৈষ্ণব কবিতা' নামক কবিতায় প্রতিপাদন করা হইয়াছে—না, শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়, মর্ত্যলোকের জন্যও এই গান। "চৈতালী"র 'মানসী' কবিতায় 'শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী' এই সত্যেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে। "চৈতালী"র 'বঙ্গমাতা', 'স্নেহগ্রাস', 'কাব্য' ইত্যাদি সনেটের উপসংহৃতিই প্রতিপাদ্য সত্য। 'মুক্তি' নামক (বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়) – সনেটটিতে প্রতিপাদ্য 'প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া।' 'ন্যায়দণ্ড' সনেটের প্রতিপাদ্য—

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

রবীন্দ্রশিষ্যগণ ও রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিগণ আবেগাত্মক অনুক্রমের কবিতা খুব বেশী লিখিয়াছেন। এই শ্রেণীর কবিতায় থাকে মনের আবেগের অকুণ্ঠিত প্রকাশ। ভাওয়ালের গোবিন্দ দাসও এই শ্রেণীর কবিতা খুব বেশী লিখিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের বাৎসল্যরসের কবিতা, দেবেন্দ্রনাথের উল্লাস-রসের কবিতা, অক্ষয়কুমারের "এষা"র কবিতা, রজনীকান্তের আগমনী বিজয়ার কবিতা মোহিতলালের কোন কোন কবিতা ('কালাপাহাড়', 'নূরজাহান', 'নাদির শা' ইত্যাদি), করুণানিধান, কিরণধন, কুমুদরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহনের বহু কবিতা এবং কাজী নজরুলের বেশির ভাগ কবিতা এই অনুক্রমে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের 'বধূ', 'মানসী', 'কাঙালিনী, 'যেতে নাহি দিব', সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অকালমৃত্যুতে রচিত কবিতা, 'অপমানিত' (কোন কোন গ্রন্থে 'দুর্ভাগা দেশ' নামে অভিহিত) 'ভারততীর্থ', 'বিদায়' ইত্যাদি কবিতা আবেগাত্মক অনুক্রমে রচিত।

আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতায় অলঙ্কারের চাতুর্যই গতি নিয়ন্ত্রিত করে। "বনবাণী"র 'বসন্ত'-এর মত রূপকাত্মক কবিতাগুলি সবই এই অনুক্রমের দৃষ্টান্ত। সিম্বলিক্যাল কবিতাগুলিকেও আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতা বলিতে পারা যায়। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথের আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতা অনেক। সকল কবির কবিতাতেই অল্পবিস্তর অলঙ্করণ আছে, কিন্তু অলঙ্করণকে আদ্যন্ত প্রাধান্য দিলেই

অনুক্রম আলঙ্কারিক হইয়া উঠে। পদবিন্যাসের চাতুর্য ও বক্রোক্তিও অলঙ্করণ। এই চাতুর্য বহিরঙ্গীয় হইতে পারে, আবার অন্তরঙ্গীয়ও হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের আলঙ্কারিক চাতুর্য বহিরঙ্গীয় আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের চাতুর্য প্রধানত অন্তরঙ্গীয়। এই দুই কবিই এই চাতুর্যকে প্রাধান্য দিয়াছেন। বিশেষ করিয়া যতীন্দ্রনাথ যে-বাক্যে বক্রোক্তির সমাবেশে আলঙ্কারিক চাতুর্য দেখাইবার সুবিধা হইবে না মনে করিয়াছেন, সে-বাক্য একেবারে বর্জনই করিয়াছেন। কাজেই তাঁহার কবিতার অনুক্রম অধিকাংশ স্থলে আলঙ্কারিক। অবশ্য বক্রোক্তিও অলঙ্কার একথা মনে রাখিতে হইবে।

সংস্কৃত কবিদের কতকগুলি শ্লোক লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়—সংস্কৃত কবিরা যুক্তিমূলক অনুক্রমের অনুসরণ করেন নাই। আবেগাত্মক অনুক্রমও অধিকাংশ স্থলে অনুসরণ করেন নাই, কালিদাসের 'রতিবিলাপ', 'অজবিলাপ'-এর অনুক্রমও পুরা আবেগাত্মক নয়। "রঘুবংশ"-এ গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম বর্ণনা ইত্যাদি রীতিমত অলঙ্কারেরই মালিকা। সংস্কৃত টীকাকারদের মতে "কুমার-সম্ভব"-এর অকাল-বসন্ত বর্ণনা স্বভাবোক্তি অলঙ্কারের মালিকা, আমরা অবশ্য ইহাকে অলঙ্কারই বলি না। অন্যান্য সংস্কৃত কবিরাও প্রধানত অনুসরণ করিতেন আলঙ্কারিক অনুক্রম। অনেকে এক একটি অলঙ্কার প্রয়োগের জন্যই এক একটি শ্লোক রচনা করিতেন। যাহা অলঙ্কৃত করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন না, তাহা ভাবপরম্পরার সূত্র রক্ষার পক্ষে যত প্রয়োজনীয় কথাই হউক, তাহাতে যত অর্থগৌরবই থাকুক, তাহাকে শ্লোকত্ব দান করিতেন না। শ্লোকগুলির মধ্যে আবেগের কিংবা ভাবপ্রসঙ্গের ক্ষীণ সূত্র মাত্র থাকিত। কবির প্রখর দৃষ্টি থাকিত আলঙ্কারিক চাতুর্যের দিকে।

তথ্যগর্ভ কবিতার অনুক্রম সাধারণত যুক্তিশৃঙ্খলামূলকই হয়। ইহার অনুক্রম যদি আলঙ্কারিক হয়, তাহা হইলে সেই তথ্যগুলিই শুধু কবিতায় স্থান পায়, যেগুলি অলঙ্কারের বন্ধনে বাঁধা পড়ে; আবেগাত্মক অনুক্রমে তথ্যের স্থান সংকীর্ণ, তাহাতে কল্পনার লীলাই এবং হৃদয়াবেগের উৎসারই প্রবল। তথ্যভার কল্পনার পক্ষদ্বয়ের শক্তি হরণ করে, হৃদয়াবেগের উৎসারকে ব্যাহত করে।

তবু কবিতায় তথ্যতত্ত্বের স্থান আছে। কবিতায় তথ্যতত্ত্বের অবস্থানকেই অর্থগৌরব বলে। এই অর্থগৌরব কবিতার একটি সম্পদ। এই অর্থগৌরবের জন্য এক সময় ভারবি কালিদাস হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু অসামান্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

তরবারির পক্ষে ধার-ভার-সার তিনেরই প্রয়োজন। তরবারির ধারই সবচেয়ে বড় গুণ সন্দেহ নাই, কিন্তু তরবারিকে ধারালো হইতে হইলে সারালো হইতে হয়, "পিতলক কাটারি"র মত হইলে চলে না। হৃদয় স্পর্শ করিবার শক্তিই কবিতার পক্ষে ধার। তরবারি নিতান্ত পাতলা হইলেও ধারের কাজ ঠিকমত হয় না, কিছু ভারও চাই।

কবিতার পক্ষেও সেই কথা খাটে। তত্ত্ব-তথ্য কবিতায় ভার ও সার যোগায়। তথ্যগর্ভ কবিতা যদি হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে, তবে বুদ্ধির সাহায্য লইয়া হৃদয় স্পর্শ করিতেছে বলিয়া অথবা যুক্তিশৃঙ্খলার অনুক্রম অনুসরণ করিতেছে বলিয়া অবজ্ঞেয় হইতে পারে না। অনেক রসজ্ঞ পাঠক এই শ্রেণীর কবিতার পক্ষপাতী।

তিনটি অনুক্রম স্বতন্ত্রভাবে যাহাতে বর্তমান, সেরূপ কবিতার সংখ্যা বেশী নয়। অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতায় একাধিক অনুক্রম অনুস্যূত আছে। রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ', 'এবার ফিরাও মোরে', 'ঐকতান', 'শাজাহান' ইত্যাদি কবিতায় যুক্তিমূলক অনুক্রমের সহিত আবেগাত্মক ক্রমের অনুসীবন ঘটিয়াছে। 'সমুদ্রের প্রতি', 'বৃক্ষ-বন্দনা' ইত্যাদি কবিতায় আলঙ্কারিক অনুক্রমের সঙ্গে আবেগাত্মক অনুক্রম অনুস্যূত হইয়াছে।

"বনবাণী"র 'বসন্ত'-এর মত অবিমিশ্র আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতা রবীন্দ্রনাথের খুব অল্পই আছে।

যে-অনুক্রমেই কবিতা রচিত হউক, ক্রমভঙ্গ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে একাধিক অনুক্রমের অনুসীবন ঘটিয়াছে, সেখানে সেগুলির ধারা কলাসম্মতভাবে ওতপ্রোত হওয়া চাই।

অনেকে মনে করেন, যুক্তিশৃঙ্খলামূলক অনুক্রম গদ্যেরই নিজস্ব ; কবিতায় এই অনুক্রম বর্জনীয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, বহু উৎকৃষ্ট কবিতা প্রধানত যুক্তিশৃঙ্খলামূলক অনুক্রমেই রচিত। কাহিনীমূলক গাথা-কবিতা, বর্ণনাত্মক কবিতা, চিত্রাত্মক কবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা প্রধানত এই অনুক্রমেই রচিত। পাঠকদের কেহ বা যুক্তিমূলক ক্রমের, কেহ বা আলঙ্কারিক ক্রমের, কেহ বা কেবল হৃদয়াবেগের অনুক্রমের পক্ষপাতী। যে-পাঠক কোন একটি অনুক্রমের পক্ষপাতী—সে-পাঠক মনে করিতে পারেন, অন্য অনুক্রমের রচিত কবিতা বুঝি নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

আদর্শ সংস্কৃতিসম্পন্ন রসজ্ঞ পাঠক সকল অনুক্রমের কবিতারই রস উপভোগ করিতে পারেন। কেবল অনুক্রমের কথা নয়, বিবিধ শ্রেণীর কবিতাই রসজ্ঞদের উপভোগ্য। এক শ্রেণীর কবিতার প্রতি পক্ষপাতী হইয়া অন্যান্য শ্রেণীর কবিতায়

যে রস পায় না, সে দুর্ভাগ্য। যে-ফুলে যতটুকু মধু আছে, মধুকর তাহাই গ্রহণ করে, পল্লী প্রান্তরের দ্রোণপুষ্পের মধুটুকুও সে আহরণ করিতে ভুলে না। সকল ফুলের মধু আহরণের ফলেই মধুচক্র রচিত হইয়া উঠে। কাব্যবিচার প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা নয়—অপকৃষ্ট বর্জনের পরীক্ষা।

কেহ কেহ গাঢ়বন্ধ রচনার পক্ষপাতী। কবিতা গাঢ়বন্ধও হইতে পারে; শ্লথবন্ধও হইতে পারে। রসঘনও হইতে পারে, ফেনিলোচ্ছলও হইতে পারে। ইক্ষু চর্ব্য পদার্থ, ইক্ষুরস পেয়। ইক্ষু হইতে রস গ্রহণ করিতে হয় দন্তের সাহায্যে। অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের সম্বন্ধে চর্ব্যমানতার কথা আছে—গাঢ়বন্ধ কবিতার পক্ষে তাহাই প্রযোজ্য। বলা বাহুল্য দন্তের সাহায্য এখানে বুদ্ধিরই সাহায্য।

গাঢ়বন্ধ রচনায় কবির বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ সচেতন ও সক্রিয় থাকে। গাঢ়বন্ধ রচনাই সাধারণত ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়। এই শ্রেণীর রচনায় দুইটি বাক্যের মধ্যে পরম্পরারও ব্যবধান থাকিতে পারে।

এই শ্রেণীর রচনায় পাঠকের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধাও সূচিত হয়। কবি প্রত্যাশা করেন, রসজ্ঞ পাঠক তাঁহার অকথিত বাণীগুলি বুঝিয়া লইবেন। এই শ্রেণীর কবিতার মধ্যে রসঘন চরণগুলির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ থাকে না এবং পুনরাবৃত্তি বর্জন করা হয়। এ যেন সূত্রাকারে কবির বক্তব্যের বিবৃতি। কবিতার মধ্যেই টীকা ভাষ্য থাকিলে বিদগ্ধ পাঠক মনে করেন কবি তাঁহার রসজ্ঞতার যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকার করিলেন না।

গাঢ়বন্ধ রচনায় আভাণক, সূক্তি, সুভাষিত ইত্যাদি অনেক থাকে। সেগুলি পাঠকের স্মৃতির শুক্তিপুটে মুক্তার মত সঞ্চিত থাকিয়া যায়।

সংস্কৃত কাব্যের শ্লোকগুলি সবই গাঢ়বন্ধ রচনা। শ্লোকগুলির বাংলায় অনুবাদ করিলে ইহার গাঢ়বন্ধতা নষ্ট হইয়া যায়। যাহারা অনুবাদ পড়িয়া সংস্কৃত কাব্য বুঝিতে চায়, তাহারা ক্ষীরের তৃষ্ণা ঘোলে বা নীরে মিটাইতে চায়।

বৈষ্ণব কবিদের কোন কোন পদ গাঢ়বন্ধ রচনা। গোবিন্দদাস, যদুনন্দন দাস ইত্যাদি পদকর্তারা শ্রীরূপগোস্বামী ও অন্যান্য কবিদের সংস্কৃত শ্লোককে পদের আকার দান করিয়াছিলেন, সেগুলিতে গাঢ়তা অনেকটা কমিয়া গিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর গাঢ়বন্ধতার একটি কারণ, প্রত্যেক পদের আয়তনের একটি সীমাবন্ধনী পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট ছিল। প্রত্যেক পদ এক একটি গীতি বলিয়া উদ্বেলিত হইয়া তাহার প্রবাহ চারিপাশের সীমাবন্ধনকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, উচ্ছলিত

হইয়া উপরের দিকেই উঠিয়াছে।

জয়দেবের সময়ে পদরচনার একটা নির্দিষ্ট সীমা-বন্ধনীর প্রবর্তন হয় নাই। কিন্তু জয়দেবের ভাষা সংস্কৃত বলিয়া সংস্কৃতের নিজস্ব গঠনপদ্ধতি ও কবির স্বকীয় স্বাভাবিক সংযম তাঁহার রচনাকে গাঢ়বন্ধ করিয়াছে। কবির স্বভাবসিদ্ধ সংযম না থাকিলে সংস্কৃত কবিতাও অমিতভাষণে শ্লথবন্ধ হইতে পারে। জয়দেবই সমসাময়িক কবি উমাপতি ধরের রচনার দোষ ধরিয়া বলিয়াছেন—বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ।

বাংলা সাহিত্যে শ্রীমধুসূদন যে সনেটের প্রবর্তন করিয়াছেন—তাহা গাঢ়বন্ধ রচনার পক্ষে অনুকূল। সনেটের বন্ধনের মধ্যে কবিকল্পনা গাঢ়তার সৃষ্টি করিতে বাধ্য হয়।

বাংলা সাহিত্যে কবিবর অক্ষয়কুমার বড়াল ও মোহিতলাল মজুমদারের রচনা গাঢ়বন্ধ। সংস্কৃত শ্লোকের মত রচনায় গাঢ়তা থাকার জন্য বোধ হয় এই রীতিকে Classical রীতি বলা হয়।

আবেগাত্মক কবিতার পক্ষে গাঢ়বন্ধতা অনুকূল নয়। আবেগাত্মক রচনায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থাকে না, টীকা ভাষ্যের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাস থাকে। সতর্ক বুদ্ধির প্রয়োগে এই উচ্ছ্বাসকে মুহুর্মুহু ব্যাহত করিলে আবেগের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি হয় না।

আবেগের উত্তাপে হৃদয় বিগলিত হয় এবং নয়নও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিগলিত হয়—অতএব তারল্য আবেগাত্মক রচনার স্বধর্ম।

গাঢ়বন্ধ রচনা বোধশক্তির সহায়তায় পাঠকের অন্তর স্পর্শ করে। সেজন্য গাঢ়বন্ধ রচনা বিদগ্ধজনেরই উপভোগ্য। আবেগাত্মক শ্লথবন্ধ রচনা সরাসরি পাঠকের হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া পাঠকহৃদয়কে বিগলিত করে। অতএব এই শ্রেণীর রচনা সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই উপভোগ্য।

আমাদের সাহিত্যে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গোবিন্দ দাস, দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি কবিরা সকলেই শ্লথবন্ধ রচনাধারার কবি।

রবীন্দ্রনাথ দুই ধারার মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ সনেটের কঠোর বন্ধন পছন্দ করিতেন না। তাঁহার কল্পনা-বিহঙ্গের পক্ষে সনেট রীতিমত পিঞ্জর। তিনি যে সনেটাকারে চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার বন্ধন অনেকটা শিথিল। তবু এই চৌদ্দ শিকের খোলা পিঞ্জরের মধ্যে তাঁহার কল্পনা মাঝে মাঝে প্রবেশ করিয়া রচনায় গাঢ়তার সৃষ্টি করিয়াছে।

করির Symbolical কবিতাগুলির প্রায় সবই গাঢ়বন্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীর মত

অনেক গানও গাঢ়বন্ধ রচনা। 'কণিকার' এপিগ্রাম্যাটিক কবিতাগুলি সংস্কৃত শ্লোকের মতই গাঢ়বন্ধ। তবে আবেগাত্মক কবিতাই তাঁহার বেশী—সেগুলি উচ্ছ্বাসময়। হৃদয়াবেগের ধর্মই সেগুলি পালন করিয়াছে। যেখানে তাঁহার হৃদয়াবেগ জীবনকে অবলম্বন না করিয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়াছে, সেখানে আবেগ সংযত। সেখানে ভাষা গাঢ়বন্ধ না হইলেও শিথিলবন্ধ নয়।

আবেগাত্মক কবিতার পক্ষে শ্লথবন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। যে-কোন কবিতায় প্রত্যেক শব্দের যদি সার্থকতা থাকে, প্রত্যেক চরণ যদি রসের পরিপোষক বা ভাবের উন্মেষক হয় এবং নব নব অলঙ্করণ যদি শ্রী সৌষ্ঠব সঞ্চার করে, বাক্যগুলি যদি বাচ্যাতিশায়ী অর্থ দ্যোতনা করে তাহা হইলে শিথিলবন্ধ হইলেও কবিতার উৎকর্ষ অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু যদি কবিতায় এক কথা বা একই অনুভূতির পুনরাবৃত্তি থাকে, অযথা অলস সমারোহ থাকে, মিল, অনুপ্রাস, স্তবকগঠন ও ছন্দোবৈচিত্র্যের অনুরোধে যদি অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় শব্দাবলীর সমাবেশ ঘটে, বাক্যের ঘনঘটা বা আড়ম্বরের সাহায্যে পাঠকচিত্তকে ভুলাইবার প্রয়াস থাকে, শব্দসমুচ্চয় যদি অর্থ প্রকাশে সহায়তা না করিয়া অর্থকে আবৃত করে, যদি অসম্বদ্ধ ও অবান্তর পদবিন্যাস পাঠকের অবধান পীড়িত করে, তাহা হইলে শ্লথবন্ধতা কবিতাকে সাধারণ ছন্দোময় গদ্যে পরিণত করে। পক্ষান্তরে অতিরিক্ত গাঢ়তা যদি কবিতাকে প্রহেলিকায় পরিণত করে—দুইটি চরণ বা দুইটি শব্দের ব্যবধান ব্যঞ্জনাগর্ভ না হইয়া কেবল অর্থকৃচ্ছ্রসাধন করে, তাহা হইলে তথাকথিত গাঢ়বন্ধতা আর গুণের পর্যায়ে পড়ে না। কেবল হৃদয়াবেগ নয়, অনেক ভাববস্তু বা বিষয়বস্তুর পক্ষে গাঢ়বন্ধতা উপযোগী নয়।

ছন্দ ও মিত্রাক্ষর সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার স্থান এ-প্রবন্ধে নাই। সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। ছন্দ ও মিত্রাক্ষর কবিতার পক্ষে অপরিহার্য নয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দোবৈচিত্র্য ও মিত্রাক্ষরী চাতুরীকে চূড়ান্ত সীমায় তুলিয়াছিলেন। চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করিলেই অবতরণ করিতে হয়। আগেই "চিত্রাঙ্গদা"য় তিনি মিল বর্জন করিয়াছিলেন, তৎপরে তিনি ছন্দ বর্জন করিয়াও কতকগুলি কবিতা লিখিলেন। সেগুলির ভাষা গদ্য ও পদ্যের মাঝামাঝি। অবশ্য তাহারও একটা ছন্দ আছে। তবে সে ছন্দ কবির লেখনীর প্রভু হইয়া আর থাকিল না, তাহা তাঁহার লেখনীর ভৃত্য হইল। কবি বোধহয় অনুভব করিলেন রসোত্তীর্ণ করিতে হইলে সকল প্রকার ভাবকে প্রচলিত ছন্দের বন্ধনে প্রকাশ করা চলে না। বোধ হয় ভাবিলেন, ছন্দের শাসন তাঁহার ভাবধারার স্বাভাবিক স্বাধীন প্রবাহ ব্যাহত করিতেছে, ছন্দের প্রয়োজনে

অনেক অবাঞ্ছিত শব্দ আসিয়া তাঁহাকে অমিতভাষী করিয়া তুলিতেছে। হয়ত ভাবিলেন, ছন্দ ও মিত্রাক্ষর দুইয়ে মিলিয়া তাঁহার কবিতাকে কৃত্রিমতায় দূষিত করিতেছে। দেখা গেল, প্রচলিত ছন্দ ও মিত্রাক্ষর বর্জনের ফলে তাঁহার কবিতার রসৈশ্বর্য বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নাই।

ছন্দ বাহন মাত্র। বাহনের গৌরবে কোন দেবতার মহিমা বাড়ে না। ষণ্ডবাহন হইলেও শিবের উপাসকের অভাব নাই। আবার ময়ূরবাহন হইলেও কার্ত্তিক ঘরে ঘরে পূজিত হন না। মিত্রাক্ষরী ছন্দের গতি মন্থর, অমিত্রাক্ষর রচনারীতির গতি দ্রুত। বিমানের যুগে মন্থরতা অসহ্য। এইসবের জন্যই বোধহয় রবীন্দ্রনাথপ্রবর্তিত নবরীতিই স্পৃহণীয় ও গ্রহণীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় না, ছন্দে রচিত কবিতার কোন মূল্য নাই, ছন্দের প্রচলনকে বন্ধ করিতে হইবে। অথবা "পুনশ্চ"-এর আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে বাতিল করিতে হইবে। রসোত্তীর্ণ হইবার জন্য কবিতাকে প্রচলিত কোন ছন্দের সাহায্য লইতে হইবে এমন কোন কথা নাই। আজ দেখা যাইতেছে, ছন্দে রচিত না হইলেও কবিতা রসোত্তীর্ণ হইতে পারে। কবিতার জন্য ছন্দ একটা চাই-ই—ইহা একটি সংস্কার মাত্র। সর্বসংস্কারমুক্ত মনেই কবিতার বিচার করিতে হইবে।

আর-একটি প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সভ্যতার উন্মেষের একটা লক্ষণ পারিপাট্য, সৌষম্য, সৌরুচ্য পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলাশ্রীর প্রতি অনুরাগ। সভ্য পাঠকেরা কবিতাতেও এইগুলি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, এই গুণগুলির অভাব থাকিলে কবিতা পাঠকালে মনে মুহুর্মুহু অস্বস্তির সঞ্চার হয়, এই অস্বস্তিতে অপ্রসন্নচিত্তে কবিতার রস উপভোগ করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই গুণগুলির পর্যাপ্ত পরিমাণে সমাবেশ দেখিয়া এ-দেশের সুসভ্য পাঠকগণ পরিতৃপ্ত হইলেন। রঙ্গলাল-হেম-নবীনকে তাঁহারা আর দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিতে পারিলেন না। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী কবিদের অন্য ঐশ্বর্য যাহাই থাকুক, এই গুণগুলির অভাব ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঐশ্বর্যের অভাব নাই, এই গুণগুলি তাহাতে মাধুর্য ও লাবণ্যের সঞ্চার করিয়াছে। পরবর্তী কবিরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত এই গুণগুলির অনুশীলন করিলেন। ছন্দের অনবদ্যতা, মিলের চাতুর্য ও নির্দোষতা, অনুপ্রাসের ভূরি ভূরি প্রয়োগ, পদবিন্যাসের লালিত্য, স্তবকবিন্যাসের বৈচিত্র্য, শ্রুতিকটু ও গদ্যাত্মক শব্দ পরিহার, ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি ইত্যাদি সমস্তই ঐ

গুণগুলির অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় রসৈশ্বর্য ছিল অফুরন্ত, এই গুণগুলি তাহাতে সোনায় সোহাগা হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুকারী কবিদের অনেক কবিতায় এই গুণগুলিই প্রধান সম্বল।

রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই বিপরীত ধারার প্রবর্তন হইল। গোবিন্দদাস, অক্ষয়কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল ("মন্দ্র" ও "আলেখ্য"-এ)—এই তিনজন কবি অতিরিক্ত পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সাধনকে কৃত্রিমতা-দোষ বলিয়া মনে করিতেন। গোবিন্দদাস সুরুচিনিষ্ঠতাকে একটা গুণ বলিয়া স্বীকার করিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতায় গদ্যাত্মক ভাষা চালাইতে লাগিলেন এবং অক্ষয়কুমার অতিরিক্ত পারিপাট্যকে অস্বাভাবিক মনে করিলেন। 'নিটোল শিশিরকণা, মেদিনী বন্ধুর'—এই একটি চরণে তাঁহার মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, অতিরিক্ত মাজিয়া ঘষিয়া পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতা সাধন করিলে কোন বস্তুরই ভিটামিন থাকে না; কবিতাকে ছান্দসিক চাতুর্যের দ্বারা ও সুললিত পদবিন্যাসের দ্বারা সুপরিচ্ছন্ন করিতে গেলে তাহার প্রাণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়। তাঁহাদের ধারণা—কবিতাকে বাঁচিতে হইলে নিজের শক্তিতেই বাঁচিতে হইবে; ছন্দ, অনুপ্রাস, সঙ্গীতের মাধুর্য, গতানুগতিক অলঙ্কার ইত্যাদির ভূষণ পরিয়া লোকচক্ষু ভুলাইলে চলিবে না। নিজের নিরাভরণ লাবণ্যে উপভোক্তাকে মুগ্ধ করিতে হইবে! কবিতার পক্ষে দেহসৌন্দর্য বড় নয়। তাহার ভাবৈশ্বর্যই শ্রেষ্ঠ সম্বল। ভূষণ কবির হৃদয়ের সঙ্গে বিদ্যাপতি-কথিত চুয়া-চন্দন-চীর-হারের মত পাঠকের হৃদয়ের ব্যবধান সৃষ্টি করে।

ইহার উত্তর: নিরাভরণাও সুন্দরী ও হৃদয়বতী হইতে পারে, সাভরণাও কুৎসিতা ও হৃদয়হীনা হইতে পারে। পক্ষান্তরে নিরাভরণা কুৎসিতা ও দুঃশীলা হইতে পারে—সাভরণাও সুন্দরী ও সুশীলা হইতে পারে।

অতএব পাঠক যেন জনশ্রুতিতে বিশ্বাস না করিয়া উভয় মতবাদের কবিদের দপ্তরে সৎকবিতার সন্ধান করেন। সন্ধান ব্যর্থ হইবে না।

উদাসীন পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের জন্যই যদি কবিতার পক্ষে ভূষণাদির প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কবিতার পক্ষে তাহা শ্লাঘার কথা নয়, তাহার মর্যাদাহানিরই কথা। ভূষণ তখন নিশ্চয়ই দূষণ।

যতদিন পাঠকরা নিজে অন্তরের অনুরাগে কবিতার সন্ধান করিবেন না, ততদিন কবিতাকেই পাঠক সন্ধান করিতে হইবে—পাঠক আকর্ষণ করিতে হইবে।

কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য—কবিতায় পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলাশ্রী, সৌষম্য কি শুধু পাঠকচিত্ত ভুলাইবার জন্য? কবিতার রসানিষ্পত্তিতে কি তাহারা কোন সহায়তাই করে না? পাঠকের চিত্তকে কি রসভিমুখী বা রসবোধের পক্ষে অনুকূল করিয়া তুলে না?

প্রজ্ঞাদৃষ্টি—রসদৃষ্টি—বোধদৃষ্টি

এই সৃষ্টির মধ্যে বহু দৈন্য, বহু ত্রুটি, বহু প্রকারের অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানি সত্ত্বেও জ্ঞানী যে দৃষ্টিতে ইহাকে দেখিয়া শোভনসুন্দর সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস মনে করেন, তাহাই প্রজ্ঞা-দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতেই রুদ্রানন্দে নৃত্যরত নটরাজও এত সুন্দর, এই দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে রুদ্রের দক্ষিণ মুখ, এই দৃষ্টিতেই সেই মহাকালী মূর্তি—

"ডান হাতে যার খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,"—

তাহাও সুন্দর! এই দৃষ্টিতেই শঙ্খ ও পদ্মের সহিত চক্র ও গদার সমন্বয় হইতে পারিয়াছে। এই দৃষ্টিতে যে-বসন্ত শুধু ফোটা ফুলের মেলা নয়—ঝরাফুলেরও শ্মশান, সেই বসন্তও সুন্দর হইতে পারিয়াছে। কবি যখন বলিয়াছেন—

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত,
খড়্গ তোমার হে দেব বজ্রপাণি চরম শোভায় রচিত।

তখন এই দৃষ্টিতে দেখিয়াই বলিয়াছেন। এই দৃষ্টিতে দেখিলে যে নদী এক কূল গড়ে—আর এক কূল ভাঙ্গে, সেই ভৈরবী কুলঙ্কষা নদীও সুন্দর—পরস্পর-বিরোধী ঋতুর বৈচিত্র্য লইয়া বৎসর-চক্রের আবর্তনও সুন্দর—একাধারে নির্মমা (Red with tooth and claw) ও মমতাময়ী বিশ্বপ্রকৃতিও মাতৃরূপা। চেরাপুঞ্জি ও গোবিসাহারা দুই লইয়াই পৃথিবী জননীরূপা। এই দৃষ্টিতে দেখার ফল-কে কবি ছন্দে রূপদান করিয়া বলেন—

মাতা আমাদের অন্নপূর্ণা পিতা যে মোদের চন্দ্রচূড়,
সংসার হ'তে পৃথক হইয়া কেমনে শ্মশান রহিবে দূর?
রুদ্র যেমন শিবরূপ ধরি মিলে একদেহে গৌরীহর,
শ্মশানে এবং সংসারে মিলে তেমনি অর্ধনারীশ্বর।

এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি,—রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির উচ্চতর স্তরে সমন্বয় (Synthesis)।

এ দৃষ্টি উপভোগের দৃষ্টি নয়, ইহা শিল্পীর দৃষ্টি নয়, ইহা সর্ববিধ দ্বিধা, সংশয়, অসামঞ্জস্যের সমাধানের তৃপ্তিদান করে। তাহাতে আনন্দ আছে। কিন্তু সে আনন্দ আর রসানন্দ—শিল্পীর সৃষ্টির আনন্দ—এক নহে। এ আনন্দ দিব্যানন্দের কাছাকাছি।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া রসাবিষ্ট শিল্পী উভয়কে লইয়া রসসৃষ্টি করিতে পারে। বোধদৃষ্টি বলে বর্ষাই সুন্দর, তবে গ্রীষ্ম না হইলে ত বর্ষা আসে না—সেই হিসাবে গ্রীষ্মকে সুন্দর বলিবে বল—কিন্তু গ্রীষ্ম নিজে বসন্তের মত সুন্দর নয়। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে স্রষ্টার সৃষ্টি পরিকল্পনায় গ্রীষ্ম বর্ষা গোবিসাহারা ও চেরাপুঞ্জির পাশাপাশি অবস্থিতিতে কোন অসঙ্গতি নাই বা অসামঞ্জস্য নাই। সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য—এই উপলব্ধিই প্রজ্ঞানন্দ।

বোধদৃষ্টি ও রসদৃষ্টি যেন পরস্পরবিরোধী। জগতের অধিকাংশ লোক সৃষ্টিকে বোধদৃষ্টিতেই দেখে। তাহাতে যে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা লাভ করে তাহা তাহাকে একটা আনন্দ দেয়। এ আনন্দ বোধানন্দ (Intellectnal Sentiment) শিল্পী সৃষ্টিকে দেখে রসদৃষ্টিতে—এবং পায় নব সৃষ্টির প্রেরণা ও অসুন্দরকে বর্জন করিয়া সুন্দরকেই নির্বাচন করিয়া তাহাতে পায় রসানন্দ। বোধদৃষ্টি প্রবল হইয়া উঠিলে রসদৃষ্টিকে ক্ষীণ ও নিস্তেজ করিয়া দেয়। রসদৃষ্টি যেমনই উপভোগ্যের আবিষ্কার করে—বোধদৃষ্টি তাহার চারিপাশের অতীত ভবিষ্যতের খবর দেয় (সে looks before and after and pines for what is not), সে উপভোগ্যের অন্তস্তলের কথা,—তাহার উপাদান উপকরণের কথা তুলে—তাহার মূল্য-মর্যাদার, স্থায়িত্বের ও সারবত্তার পরিমাণাদি নির্ণয় করে—ফলে উপভোগ্য আর উপভোগ্য থাকে না।

রসদৃষ্টি সরোবরে প্রস্ফুটিত পঙ্কজটি দেখিয়াই মুগ্ধ হয়—নীচের দিকে সে আর নামিতে চায় না। বোধদৃষ্টি শুধু পঙ্কজ দেখে না—তাহার মৃণাল বাহিয়া পঙ্কেও নামে। তাহা পঙ্কজের জন্মতর আবিষ্কারে আনন্দ পায়। কিন্তু মুগ্ধ হয় না। প্রজ্ঞাদৃষ্টি পঙ্ক ও পঙ্কজ অতিক্রম করিয়া একেবারে পঙ্কজের আদিনিদান সেই শাশ্বত বিশ্ববিধানে চলিয়া যায় এবং শেষ পর্যন্ত হয়ত চতুর্ভুজের হাতের পঙ্কজে মধুকরত্ব লাভ করে।

বোধদৃষ্টির শক্তির সীমা আছে—তাহা দেশে ও কালে উপভোগ্যের উপরে নীচে ও চারিপাশে খানিক দূর পর্যন্ত যাইতে পারে। সে যদি দেশ ও কালকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত—যদি সৃষ্টির অন্তস্তল পর্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিত—তবে তাহা প্রজ্ঞাদৃষ্টি হইয়া পড়িত এবং সকল বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের সমাধান

করিতে পারিত। কিন্তু সে খানিকটা মাত্র যায় বলিয়া বিরোধ, অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব-বৈষম্যেরই সাক্ষাৎ পায়। ফলে, চিত্তের অপ্রসন্নতা ও অস্বচ্ছন্দতা—উপভোগের সকল মাধুর্য হরণ করিয়া লয়। শিল্পিমন তাই বোধদৃষ্টিকে যতদূর সম্ভব সংহরণ করিয়া সৃষ্টির পানে রসদৃষ্টিতে চায়—তাই শিল্পিমন বোধদৃষ্টির রজ্জুদাম ছিন্ন করিয়া উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া তাহার রসসম্ভোগ করে। রসদৃষ্টিতে সৃষ্টির পানে তাকাইতে হইলে অনেক কিছু ভুলিতে হয়, মন হইতে অনেক সংস্কার মুছিয়া ফেলিতে হয়, উপভোগ্যের অতীত এবং ভবিষ্যৎ উপকরণ, পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা সমস্তই কিছুকালের জন্য ভুলিতে হয়—রসানন্দ-লাভে জীবনের কতকগুলি মুহূর্তও যে মধুময় হইল, রসিক তাহাকেই যথেষ্ট মনে করে।

রসদৃষ্টি যখন পঙ্কজকে উপভোগ করিতে চায়, তখন যদি বোধদৃষ্টি তাহার চোখে পঙ্ক মাখাইয়া দেয় অথবা গলিত শৈবালে ক্লিন্ন জলাঞ্জলি ছড়াইয়া দেয়—তবে পঙ্কজের উপভোগ্যতা কোথায় থাকে ?

রমণী-সৌন্দর্যে যে মুগ্ধতা, তাহা কোন শিল্পীই অভিব্যক্ত করিতে পারিত না, যদি বোধদৃষ্টি তাহার দেহকে অস্থিরক্তমাংসে বিশ্লেষণ করিত অথবা তাহার পরিণামের কথা স্মরণ করাইয়া হরিনাম করিতে বলিত।

ইন্দ্রধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার কথা মনে হইলে ইন্দ্রধনুর মাধুর্য বা সৌন্দর্য কিছুই থাকিতে পারে না।

পল্লীশ্রীর মাধুর্য উপভোগ কিছুতেই সম্ভব নয়—যদি সেই সঙ্গে বোধদৃষ্টি পল্লীর ম্যালেরিয়া, দৈন্য, দুঃখ, ইতরতা ইত্যাদির কথা মনে পড়াইয়া রসভঙ্গ করিয়া দেয়।

রসিক তাহার উপভোগ্যকে সৃষ্টি হইতে বিচ্যুত করিয়া দেখে—মহাকাল হইতে কতকগুলি মুহূর্তকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপভোগ করে। নিজের চিত্তকে এই পাপ-তাপ-দুঃখ-দৈন্যময় ধূলিমাটির ধরা হইতে অনেকটা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরে—নিজের জীবনের অন্তরের ও বাহিরের রসবিরোধী যাহা কিছু সমস্তকেই ভুলিয়া যায়,—এই বিশ্বে যেন উপভোক্তা আর উপভোগ্য ছাড়া কিছু নাই। সে কেমন ? কবির কথায়—

সে কথা শুনিবে না কেহ আর
নিভৃত নির্জন চারিধার,
দুজনে মুখোমুখী গভীর দুখে দুখী,
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।

বোধদৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত না করিতে পারিলে "জগতে কেহ যেন নাহি আর" —এই ভাবটুকু ত আসিতে পারে না।

শিল্পী এইভাবে সৃষ্টিকে খণ্ড-খণ্ড করিয়া উপভোগ করেন। তাঁহার সৃষ্টিও তাই 'ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলির' মত। যিনি ঐ উপভোগ করিবেন—তাঁহাকেও ঐ সৃষ্টিকেই 'আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া' পুনর্গঠন করিয়া লইতে হইবে। শিল্পী যেমন করিয়া বোধদৃষ্টির চক্ষুকে মুদ্রিত করিয়া রসরচনা করিয়াছেন—উপভোক্তাকেও তেমনি বোধদৃষ্টির নয়ন রুদ্ধ করিয়া উপভোগ করিতে হইবে—নতুবা রসাভাস ঘটিবে, উপভোক্তা রসানন্দে বঞ্চিত হইবে।

এইখানে একটি প্রশ্ন উঠে। বোধদৃষ্টি কি সকল সময়ই রসদৃষ্টির উপভোগ্যতা নষ্ট করিয়া দেয়? রসদৃষ্টি ও বোধদৃষ্টির যে পরস্পর প্রতিকূলতার কথা বলা হইল, তাহা সাধারণভাবে। বোধদৃষ্টি সাধারণতঃ রসদৃষ্টির বিরুদ্ধে যায়, তাই বলিয়া কখনও রসসৃষ্টির সহায়তা করে না তাহাও ত নয়। বোধদৃষ্টি যদি আমাদের চিত্তকে পঙ্কজ হইতে মৃণালে লইয়া যায়—তবে সে ক্ষতি করে না, আরও নিচে নামাইলে রসভঙ্গ ঘটাইয়া দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত রসভঙ্গ না ঘটে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে দেশে ও কালে উপভোগের অনুকূল আবেষ্টনী বা পটভূমিকার মধ্যে ঘুরিতে থাকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে রসদৃষ্টির সহিত মৈত্রী ও সহযোগিতা রাখিয়া চলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত রসানন্দ-সৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সে কি সীমা বা মাত্রার মর্যাদা রাখিয়া চলিতে চায়? তাই মনে হয়,—রসদৃষ্টি যখন বোধদৃষ্টির স্বাধীন সত্তাকে হরণ করিয়া সম্পূর্ণ আপনার বশীভূত করিয়া লইতে পারে—আজ্ঞাবহ করিয়া তুলিতে পারে—তখনই তাহা বোধদৃষ্টির সহযোগিতাতেই রসানন্দের সৃষ্টি করিতে পারে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকে স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়া রসদৃষ্টি উভয়কেই সুন্দর মনে করিতে পারে। বোধদৃষ্টি বলে বর্ষাই সুন্দর, তবে গ্রীষ্ম না হইলে ত বর্ষা আসে না—সেই হিসাবে গ্রীষ্মকে সুন্দর বলিবে বল, কিন্তু গ্রীষ্ম নিজে সুন্দর নয়। প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে স্রষ্টার সৃষ্টি-পরিকল্পনায় গ্রীষ্ম ও বর্ষা, গোবিসাহারা ও চেরাপুঞ্জির পাশাপাশি অবস্থিতিতে কোন অসঙ্গতি নাই, অসামঞ্জস্য নাই—সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই সৌন্দর্য—এই উপলব্ধিই প্রজ্ঞানন্দ।

বোধদৃষ্টিকে বশীভূত করিতে না পারিয়া অনেক সময় শিল্পী ভাবেন—রসদৃষ্টির সহিত বোধদৃষ্টির একটা সন্ধি সামঞ্জস্য সাধন করা যাক। কিন্তু তাহাতে রসসৃষ্টি হয় না—বোধদৃষ্টিতে লব্ধ ভাবানুভূতির শোভন সুন্দর বিবৃতিমাত্র হয়—অথবা প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ভানমাত্র প্রকাশ পায়। শিল্পী যে সৃষ্টিকে উপভোগ করিয়াছেন

কিনা তাহা বুঝা যায় না। বোধদৃষ্টির সহিত রসদৃষ্টির সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা শিল্পীর বুদ্ধিরই একটা প্রয়াস।

দৃষ্টান্তস্বরূপ—

মিথ্যা আমি তোমায় ডরি মিথ্যা কাঁপি মৃত্যু স্মরি
কর-করোটি অমৃতে তব পূর্ণ,
মরণে তুমি করেছ জয় শরণে তব কীসের ভয় ?
শঙ্কর, এ শঙ্কা কর চূর্ণ।
ঈশান, তব বিষাণ-রবে প্রলয় আসে ভীষণ, তবে
বিশ্ব নব তাহাতে লভে সৃষ্টি।
মাভৈঃ বাণী গর্জি কহ শুনিতে শুধু শঙ্কাবহ
বজ্র ছলে জীবনই কর বৃষ্টি।
তৃতীয় অঁাখে বহ্নিছটা বিথারে জলদর্চিঘটা,
গঙ্গা পুনঃ তোমারি জটাপুঞ্জে।
ইন্দু তব ললাটে জলে জনম দেয় প্রসূন-ফলে,
ওষধি-মধু-ভেষজে গিরিকুঞ্জে।
অট্ট-রবে শঙ্কা রটে তবুও তা'ত হাস্য বটে,
অভ্রভরা শুভ্র যেন কম্বু,
উরগ শত অঙ্গে ধরি ঘুরিছ প্রেত সঙ্গে করি,
বৎসলতা লুকাবে কোথা শম্ভু ?
অধ্রুব যে তাহারি তরে রুদ্রশূল তোমার করে,
কাঁপুক ডরে ত্রিপুর, হেমলঙ্কা,
তোমার যারা শরণ লভে লভেছে তারা মরণ কবে ?
ধ্রুবের ছায়া, মোদের কিসে শঙ্কা ?
করুণা তব লভিল অহি, ধন্য বিষ, কণ্ঠে রহি,
হৃদয় তব পাবে না প্রেম-অঙ্ক ?
মৃতেরো হেয় অস্থিগুলি আপন দেহে লইলে তুলি,
জীবন কি গো হবে না নিঃশঙ্ক ?
প্রমথ পশু পিশাচগণ হইল তব আপন জন,
পাবে না ঠাঁই মানুষ তব সদ্মে ?
বিষ-ধুতুরা চরণে তব লভিল চির শরণ, প্রভো,
নেবে না তুমি মোদের হৃদি-পদ্মে ?

মরণ লভি বনের দ্বীপী বহিয়া জয়-কীর্তি-লিপি,
কৃত্তিপটে শোভিছে তব অঙ্গে।
দগ্ধ হয়ে ভস্ম হব, তবু ত তব অঙ্গে রব,
ডরি না তাই তোমার রোষ রঙ্গে।
যা কিছু ভবে ত্যাজ্য হেয় তোমার ভূষা ভোজ্য পেয় ;
অধম আমি নিরাশ নহি তাই গো,
আমাতে তব অংশ যাহা পাবে না প্রভু ধ্বংস তাহা,
হাড়ের চেয়ে লভিবে উঁচু ঠাঁই গো।
চির অমৃত উষার লাগি রয়েছি পিতঃ আশায় জাগি,
নাশ হে মম জীবন-তমোরাত্রি,
ক্ষুদ্র আমি রুদ্রে রব, চূর্ণ হয়ে পূর্ণ হব,
বিশ্ব হতে বিশনাথে যাত্রী।

এই কবিতাটি দুই দৃষ্টির সামঞ্জস্যের বিবৃতিমাত্র নহে, ইহাতে ঐ সামঞ্জস্যকে একটি প্রতীকের মধ্যে স্বতন্ত্র করিয়া লইয়া রসদৃষ্টিতে দেখিবার প্রয়াস দেখা যাইতেছে।

এখানে একটি কথা বলার প্রয়োজন হইতেছে। কবির নিজস্বই হউক, আর অন্য কোন দ্রষ্টারই হউক, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে দেখার ফলকে শিল্পী একটি প্রতীক-স্বরূপ গ্রহণ করিয়া রসদৃষ্টিতে উপভোগ্য করিয়া তুলিতে পারেন। কেবল তাহার বিবৃতি, ব্যাখ্যা বা পরিচয়ই রসানন্দ দান করিবে না অর্থাৎ এক্ষেত্রেও রসানন্দ-সৃষ্টি পূরা-মাত্রাতেই চাই। এইভাবে রসানন্দ-সৃষ্টি রবীন্দ্রকাব্যে অজস্র।

রসদৃষ্টিতে দেখিয়া জীবনের কতকগুলি মুহূর্তকে মধুময় করিয়া তোলা—ইহাকে প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ হয়ত বলিবেন—মায়া, অবিদ্যা, ভ্রান্তি, অশাশ্বত, ক্ষণিক ইত্যাদি—বোধদৃষ্টি যাঁহাদের প্রখর, তাঁহারা হয়ত বলিবেন ইহা অপ্রকৃতিস্থ চিত্তের স্বপ্নবিলাস মাত্র।

প্রজ্ঞাদৃষ্টি অনেক সাধনার ধন—তাহা মানি। বোধদৃষ্টি মানব-সভ্যতাকে গড়িয়াছে—ইহাকেও বহু আয়াসে শাণিত করিয়া তুলিতে হইয়াছে। আর এই রসদৃষ্টি সহজ স্বাভাবিক। বিনা আয়াসে মানুষ স্বভাবতই ইহা বিধাতার কাছে লাভ করিয়াছে। যাহা সম্পূর্ণ সহজ—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহাই তবে মিথ্যা ? এ মিথ্যার জন্য স্বয়ং বিধাতাই দায়ী। তাহা ছাড়া, শিল্পীর বোধদৃষ্টির অভাব আছে—তাহা ত নয়, সে বোধদৃষ্টিকে সংহরণ করিয়া রসদৃষ্টির সাহায্যে সৃষ্টিকে সম্ভোগ করে

এবং সম্ভোগ্য করিয়া তুলে—সে চিরসুন্দরের এই সৃষ্টির সৌন্দর্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া উপভোগ করে। ইহাতে অপরাধ কি? সে এই জীবনের কতকগুলি মুহূর্তকে মধুময় করিয়া তুলিতে চায়—সবগুলিকে সে মাধুরী-মণ্ডিত করিতে পারে না বটে। ইহার মধ্যে মিথ্যা কোথায়?

শিল্পী ত স্পষ্টই বলিতেছেন,—

দুদিন বাদে ফুরিয়ে যাবে জাগ্‌ল এ বোধ যবে,
স্নুখের মোহে গল্‌ল না এই বুক।
ফুরিয়ে যখন যাবে তখন সেই স্নুখে কি হবে?
এমনি করে গেল কতই স্নুখ।
ফুরিয়ে যাবে জেনেই এবে স্নুখকে টানি কোলে,
ফুরিয়ে গেলেও বয় না চোখে জল,
সান্ত্বনা পাই, সফল হলো সরস হলো ব'লে,
এই জীবনের কতকগুলি পল।

এই বিশ্বের সৃষ্টি আমাদের কাছে মূলতঃ খণ্ড খণ্ড, জীবনের কালও আমাদের অখণ্ড নহে—আমাদের বোধশক্তিই খণ্ড-সৃষ্টি ও খণ্ডকালকে একসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। দার্শনিক এই কালপ্রবাহ ও সৃষ্টিধারা লইয়া অনেক জল্পনা করিতে পারেন—কবি কিন্তু বোধশক্তির সূত্র ছিন্ন করিয়া খণ্ড-সৃষ্টি ও মুহূর্তগুলিকে রস-মণ্ডিত ও উপভোগ্য করিয়া তুলেন। তাই কবি ক্ষণিকের গান গাহেন—সে গানকে বুদ্ধি দিয়া বুঝিতে হয় না—হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে হয়। কবি তাই গাহিয়াছেন—

ওরে থাক থাক কাঁদনি।
দুই হাত দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দেরে নিজ হাতে বাঁধা বাঁধনি।
যে সহজ তোর রয়েছে সমুখে
আদরে তাহারে ডেকে নেরে বুকে,
আজিকার মত যাক্ যাক চুকে যত অসাধ্য সাধনি
ক্ষণিক স্নুখের উৎসব আজি ওরে থাক থাক কাঁদনি।

সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া খণ্ড জীবনকে যে উপভোগ তাহাই রসসৃষ্টির উপভোগ—কবির উপভোগ।

ইহা স্থূল বাস্তব সম্ভোগ নয়—ইহা অতীন্দ্রিয় মানস সম্ভোগ। ইহাদের উপরেও যে তৃতীয় নেত্রের দৃষ্টি—যাহা ব্রহ্মজ্ঞের পরাদৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মকে

উপলব্ধি করিয়া যে স্বাদ-সুখ (দিব্যানন্দ) লাভ করেন,—যাঁহাদের বলিবার অধিকার আছে, তাঁহারা বলেন—সেই স্বাদসুখের পূর্বাভাস আছে ঐ রসানন্দে।

রসানন্দকে মিথ্যা বলিয়া যাঁহারা উড়াইয়া দিতে চাহেন—শিল্পী চিরদিনই তাঁহাদিগকে বলিবে—

গড়েছি এই সাধের জীবন অলীকপুরের মাল দিয়ে,
না-জানার সব ফাঁক ভরেছি সোনার স্বপন জাল দিয়ে।
কর্কশেরে কান্ত ক'রে বেঁধেছি সব মায়ার ডোরে
মাস্তলের কঙ্কাল ঢেকেছি নায়ের রঙীন পাল দিয়ে।

উর্ণনাভের মতই স্বতই রচেছি এই সংসারে,
আমার প্রাণের স্বপ্ন-উষা দেছে অরুণ রঙ তারে।
শামুক শাঁখের দেহের মত এ ঘর আমার অঙ্গগত
মৌলবীর আজান ডুবেছে কল্পবীণার ঝঙ্কারে।

মিথ্যে সবি ? রয়েই গেল আনন্দ যে সত্যময়,
তৃপ্ত তৃষার তুষ্ট আশার মিথ্যে হবার নেইক ভয়।
স্বস্তি আরাম শান্তি সুধা সদ্য মিটায় প্রাণের ক্ষুধা
'থাকবে না সুখ' সত্য হউক, 'সুখে আছি' মিথ্যে নয়।

আশেপাশে গভীর গুহা যায়নাক সাধ দিই উঁকি,
মিথ্যা হউক সত্য হউক যদিন থাকি রই সুখী।
সত্য রচে শ্মশান শুধু কিংবা মরু উষর ধূ ধূ,
শব-সাধনার সাধক ত নই, মায়া মোহেই রই ঝুঁকি।

জ্ঞানাঞ্জনের শলাকাটি নিয়ে দোহাই যাও, সরো,
জ্ঞানটা তোমার সত্য কিনা আগে তাহাই ঠিক করো।
কাজেই যখন গোড়ায় গলদ রচি মায়ার রঙীন জলদ
ঘুরব দুদিন শূন্যতাতে, যতই কেন ভুল ধর।

সুখের স্বপন ভাঙবে জানি, হবেই শেষে সব ধুলো,
তাই বলে কি ঘুরব পথে, বাঁধব নাক চালচুলো।

পাচ্ছি যাহা হাতে হাতে ভুঞ্জি তাহা আঁতে আঁতে,
সফল তা'ত উড়বে শুধু ভুক্তশেষের ছাইগুলো।

লীলাময়ের সৃষ্টিলীলার অভিনয়ের মঞ্চেতে,
জ্যান্ত পুতুল বিশ্বে মোরা মিথ্যা ঘোরেই রই মেতে।
আমূল আত্ম-বিস্মরণে সাফল্য তাই নট-জীবনে,
সত্যকে যে ভুলবে যত অভিনয়ে সে-ই জেতে।

মায়ামুগ্ধ সংসারীর মত শিল্পী চিরদিনই বলিবে—

খুলো না দিগন্ত-দ্বার অন্তরের বাতায়ন, সত্য তেজোজালে
রঙ্গীন পতঙ্গফুল মায়ার জোনাকী, দগ্ধ হবো পালে পালে।

স্বপ্নদৃষ্টি

বিশ্বপ্রকৃতির সম্বন্ধে জ্ঞানোদয় হওয়ার আগে পর্যন্ত শিশু এই সৃষ্টিকে যে মধুময় দৃষ্টিতে দেখে, তাহাকে 'স্বপ্নদৃষ্টি' বলা যাইতে পারে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই এই সৃষ্টির সহিত তাহার পরিচয় যত নিবিড় হইতে থাকে, স্বপ্নদৃষ্টিও ক্রমে ততই তিরোহিত হয়। বিশ্বকে এই স্বপ্নদৃষ্টিতে দেখার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশু সে আনন্দ হারায়—কেবল তাহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকুর অবলম্বনে শিশু-মনের রঙে মনকে রাঙাইয়া এবং তদ্দ্বারা কৌশলে একটা স্বপ্নাবেশের ভাব আনিয়া অনেক কবি শিশুরঞ্জন স্বপ্ন-সাহিত্য রচনা করেন। ঠাকুরদাদা-ঠাকুরমায়ের ঝোলাঝুলির যত উপকথা, ছেলে ভুলানো ছড়াপাঁচালি এই শ্রেণীর সাহিত্য। আমরাও যে সে-সাহিত্য পড়িয়া আনন্দ পাই—তাহা আমাদের পরিণত মনের মারফতে নয়,—স্মৃতিসুপ্ত শিশুমনেরই মারফতে।

এমনও কবি আছেন—যিনি পরিণত বয়সেও এই সৃষ্টিকে মাঝে মাঝে স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন। এই কবির বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্নদৃষ্টি একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই বুঝিতে হইবে। সে দৃষ্টি সুপ্ত হইয়াই থাকে, কবি তাহাকে মাঝে মাঝে জাগাইতে পারেন। এই অতিপরিচিত বিশ্বসংসার তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টির জাগরণে সহায়তা করে না বটে, কিন্তু সাধারণতঃ অভিনব অদৃষ্টপূর্ব নিসর্গশ্রী মাধুরী-

স্পর্শে তাঁহার স্বপ্নদৃষ্টিকে জাগাইয়া তুলে। কবির স্বপ্নদৃষ্টিনিষ্ঠা বয়োবৃদ্ধির সহিত অন্তরের তলে তলে কতটা রূপান্তর লাভ করে, তাহা বলা কঠিন, কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতি যে কবির জ্ঞানদৃষ্টি ও রসদৃষ্টিতে পরিবর্তিত হইয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাই কবিকে কাব্যসৃষ্টির জন্য ঐ রূপান্তরিত বিশ্বপ্রকৃতির উপরই স্বপ্নদৃষ্টিপাত করিতে হয়। এই স্বপ্নদৃষ্টির ফলে যে কবিতার জন্ম হয় তাহা পরিণত মনেরই উপভোগ্য। যে মন কিছুতেই স্বপ্নাবেশে মগ্ন হইতে পারে না—সে মন কিছুতেই ঐ শ্রেণীর কবিতাও উপভোগ করিতে পারে না। এ সংসারের অধিকাংশ মনই প্রখরভাবেই জাগ্রৎ—চেষ্টা করিয়াও স্বপ্নাবেশের সৃষ্টি করিতে পারে না। কাজেই ঐ শ্রেণীর কবিতা অতি অল্প মনেরই উপভোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের 'সুখ'—কবিতায় কবির যে দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা পূর্ণ প্রবুদ্ধ দৃষ্টি নয় বটে—তাই বলিয়া স্বপ্নদৃষ্টিও নয়। ইহা রসদৃষ্টি, মনের একটি প্রশান্ত অবস্থা (Mood) দৃষ্টির জাগ্রতী ক্রিয়াশক্তি কতকটা হরণ করিয়া লইয়াছে এবং তাহাকে মধুময়ী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যে কবির Day Dream বা স্বপ্ন-দৃষ্টির ফল নয়, কবিতার শেষাংশ তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিতেছে। জীবনের কয়েকটি মুহূর্তকে কবি উপভোগ করিয়া বলিতেছেন—

চারিদিকে
দেখে' আজি পূর্ণপ্রাণে মুগ্ধ অনিমিখে
এই স্তব্ধ নীলাম্বর, স্থির শান্ত জল
মনে হলো সুখ অতি সহজ সরল।

রবীন্দ্রনাথের 'মধ্যাহ্ন' কবিতাও এই প্রকৃতির—

কিন্তু ইহাও অলস মধ্যাহ্ন-প্রকৃতির চিত্র হইলেও স্বপ্নদৃষ্টি নয়। ইহাও মনের একটি মধুময় 'অনন্ত মুহূর্ত।' যে মুহূর্তে কবির মনে হইয়াছে—

ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জলস্থলে
বহুকাল পরে—ধরণীর বক্ষতলে
পশুপাখী পতঙ্গম সকলের সাথে
ফিরে গেছি যেন কোন নবীন প্রভাতে
পূর্বজন্মে, জীবনের প্রথম উল্লাসে
আঁকড়িয়া ছিনু যবে আকাশে বাতাসে
জলে স্থলে মাতৃস্তনে শিশুর মতন
আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ।

এইগুলি ত স্বপ্নদৃষ্টির ফল নহেই। আর একটি 'মধ্যাহ্নে' কবি যে বলিয়াছেন—

মধুর উদাস প্রাণে চাই চারিদিক পানে
স্তব্ধ সব ছবির মতন,
সব যেন চারিধারে অবশ আলস ভরে
স্বর্ণময় মায়ায় মগন।
শুধু অতি মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ গান করে,
যেন সব ঘুমন্ত ভ্রমর,
যেন মধু খেতে খেতে ঘুমিয়েছে কুসুমেতে
থামিয়া এসেছে কণ্ঠস্বর।
আনমনে ধীরি ধীরি বেড়াতেছি ফিরি ফিরি
ঘুমঘোর ছায়ায় ছায়ায়,
কোথা যাব, কোথা যাই, সে কথা যে মনে নাই
ভুলে আছি মধুর মায়ায়।

ইহাকে বরং রূপদৃষ্টির ফল বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু পরক্ষণেই কবি স্মৃতিলোকের সহিত ইহার যোগ স্থাপন করিয়াছেন। স্মৃতিলোকে প্রেরিত রসদৃষ্টি ও ঐ স্বপ্নদৃষ্টি এক নহে। মোহিতবাবুর সংস্করণে কল্পনা নামক অংশে 'স্বপ্ন' নাম দিয়া যে কবিতাগুলি আছে এবং শৈশবসন্ধ্যা ইত্যাদি কবিতাকে স্বপ্নদৃষ্টির ফল মনে করা অসম্ভব নয়, কিন্তু ঐগুলিও হয় স্মৃতিলোকে অথবা বাসনালোকে রসদৃষ্টিপাতেরই ফল।

কবিবর অক্ষয়কুমার বড়ালের 'শ্রাবণে' নামক কবিতাটিকে স্বপ্নদৃষ্টির চিত্র বলিয়া মনে হইতে পারে।

কবি ঔদাস্যভরে শ্রাবণের আধা দিবালোকের মধ্য দিয়া পরিদৃশ্যমান প্রকৃতির একটা রূপের শ্লথশিথিল ভাষায় বর্ণনা দিয়া বলিতেছেন—

চেয়ে আছি শূন্যপানে কোন কাজ হাতে নাই,
কোন কাজে নাহি বসে মন,
তন্দ্রা আছে নিদ্রা নাই দেহ আছে মন নাই
ধরা যেন অস্ফুট স্বপন।
এই উঠি, এই বসি, কেন উঠি কেন বসি ?
এই শুই, এই গান গাই—
কি গান, কাহার গান কি সুর কি ভাব তার ?
ছিল কভু, আজ মনে নাই।

মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাপ্রকৃতির প্রভাব কবির চিত্তকে কিরূপ আবিষ্ট করিয়াছে—এই কবিতায় তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কবির মন এমনই ভাবাবিষ্ট ও নিষ্ক্রিয় যে তাঁহার দৃষ্টি বর্ষাপ্রকৃতির একস্থানে একটি পলের জন্যও নিবদ্ধ থাকিতেছে না। তাই ইহাতে বর্ষাপ্রকৃতির সতর্ক বর্ণনা-কৌশল নাই—এ যেন প্রকৃতির অঙ্গে অঙ্গে অবসন্ন দৃষ্টিটিকে বুলাইয়া যাওয়া। মনের দৃঢ়তা নাই, কল্পনা অবসন্ন, দৃষ্টি উদাস। মনের এই অবস্থায় সৃষ্টি যে ভাবে প্রতিভাত হয়—ইহা তাহারই বর্ণনা। ভাষার পারিপাট্য বিধানের,—এমন কি,—ছত্রে ছত্রে মিল দেওয়ারও আগ্রহ বা চেষ্টা নাই—ভাষা যেন মনের অবস্থার অনুযায়ী হইয়াই এলাইয়া পড়িয়াছে। এখানে এই অবসন্নতাই রসসৃষ্টির সহায়।

কবি যে দৃষ্টিতে বর্ষাপ্রকৃতির পানে চাহিয়াছেন—তাহাও পুরা স্বপ্ন-দৃষ্টি নয়। নিদ্রাভঙ্গের পর শিশু যেমন করিয়া অবাক বিস্ময়ে বিশ্বপ্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকে, কবি আজ তেমনি ভাবে বিশ্বের পানে তাকাইয়া আছেন। কবির মনও আজি গগনের মতই মেঘাছন্ন ও স্তম্ভভাবাপন্ন। এ ঘোর নিদ্রা নয়—তন্দ্রাও নয়—স্বপ্নও নয়—ইহা মনের ক্ষণিক বৈরাগ্য বা ঔদাসীন্য ;—দেহ ছাড়িয়া বিরাগী মন কোথায় উধাও হইয়া গিয়াছে।

কবি এইভাবে রসদৃষ্টিতে এই বিশ্বলোককে দেখিয়া যাহা কিছু অর্জন করেন, তাহা তাঁহার স্মৃতিভাণ্ডারে প্রেরণ করেন। স্মৃতিভাণ্ডার হইতে আহৃত উপাদানে এইভাবে রচিত সাহিত্যও স্বপ্নসাহিত্য নয়। করুণানিধানের 'বাসনা' 'অতীত' 'শেষ বাসরে' ইত্যাদি কবিতা স্মৃতি-ভাণ্ডারে এইভাবে রসদৃষ্টি প্রেরণেরই ফল। রবীন্দ্রনাথের—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এলো বান" "শৈশব-সন্ধ্যা" ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর—স্বপ্ন-সাহিত্যের কাছাকাছি গেলেও স্বপ্ন-দৃষ্টির ফল নহে।

ব্যক্তিগত মনেরও যেমন স্মৃতিভাণ্ডার আছে, আমাদের জাতীয় মনেরও তেমনি একটি স্মৃতিভাণ্ডার আছে। এই স্মৃতিভাণ্ডারের সাক্ষাৎ পাই আমরা দেশের প্রাচীন ইতিহাস-সাহিত্যাদিতে। জাতীয় মনের এই স্মৃতিভাণ্ডারে কবি আপনার রসদৃষ্টিকে প্রেরণ করেন এবং তদ্দ্বারা উপাদান আহরণ করিয়া নিজের জীবনে একটি কল্পনালোকের সৃষ্টি করেন। উপাদান আহরণ করিয়াই এবং কল্পলোকের সৃষ্টি করিয়াই রসদৃষ্টির কাজ ফুরায় না—রসদৃষ্টি কল্পসাহিত্যেরও সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর কাব্য-সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থে প্রচুর। উদাহরণ-স্বরূপ—স্বপ্ন (দূরে বহুদূরে, স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে ইত্যাদি), কুহুধ্বনি, মেঘদূত, সেকাল ইত্যাদি ও কথা-ও-কাহিনীর অনেক কবিতার নাম করা যাইতে পারে। বলা

বাহুল্য এইগুলি পূরা স্বপ্নসাহিত্য নয়।

এ কথা বলার বিশেষ প্রয়োজন এই যে—আমরা স্মৃতিলোককে সাধারণ কথায় 'স্বপ্নলোক' বলিয়া থাকি। প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্য, মাধুর্য, গৌরবশ্রী, বিভূতি সবই আজ আমাদের কাছে স্বপ্নবৎ। তাই অতীত যুগ আমাদের কাছে স্বপ্নযুগ—বিশেষতঃ কাব্যের মধ্য দিয়া আমরা যে জগতের সন্ধান পাইতেছি—তাহাকে আমরা স্বপ্নজগৎই বলিয়া থাকি। 'স্বপ্ন' কথাটা 'স্মৃতির' বদলে ব্যবহার করি বলিয়া স্মৃতির উপাদানে রচিত সাহিত্য তথাকথিত স্বপ্নসাহিত্য নয়। যে দৃষ্টি দিয়া রবীন্দ্রনাথ-প্রমুখ কবিগণ ব্যক্তিগত মনের অথবা জাতীয় মনের স্মৃতি-জগৎকে নিরীক্ষণ করেন—তাহাও স্বপ্নদৃষ্টি নয়।

স্বপ্নদৃষ্টির একমাত্র কবি করুণানিধান। স্বপ্নরস বলিয়া কোন রস নাই। এই কবি স্বপ্নকেও একপ্রকার রসে পরিণত করিয়াছেন। সকল প্রকার মাধুরীর সম্ভোগেই একদিন ক্লান্তি আসে। জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্নমাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানতঃ 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণানিধানে, আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথে,—

করুণানিধানের স্বপ্নমাধুরীর দুইটি দৃষ্টান্ত—

(১)

মেঘের পুরীর পর্দা তুলে নীলপাহাড়ের কোল ঘেঁষে,
কোন্ তারকার ইঙ্গিতে আজ পৌঁছিব গো কোন্ দেশে ?
হাওয়ায় বাজা বীণার তানে মন ছোটে আজ কোন্ উজানে ?
শূন্যগুহার নূপুর শুনি কোন্ পুলিনে যাই ভেসে।

উড়ো পাখীর সুরের সুরায়, সরল তরুর আবছায়ে,
প্রবালবরণ বৈকালে আজ কোন্ পাষাণী গান গাহে ?
ফুল-পরাগের ঘোমটা টানি' লুটিয়ে পড়ে আঁচলখানি,
লাজুক মেয়ে সৌদামিনী আলতা পরায় তার পায়ে।

রূপের তরী ভাসায় পরী গৌরী চাঁপার রঙ মেখে,
পদ্ম গোলাপ নিন্দি পাখা পরিয়েছে তার অঙ্গে কে ?

কোন্ মহুয়া-মদির সুরা পান করে ঐ ফুল-বধূরা ?
পালিয়ে গেছে প্রাণ-বধুঁয়া বিম্বাধরে দাগ রেখে।

(২)

কাণের পিঠে তিলটি তোমার এড়ায়নি এই মুগ্ধ চোখ,
দীঘির ঘাটে ঐ যে আঁকা দীপ্ত তোমার অলক্তক।
নারিকেলের কুঞ্জশিরে পদ্মফোটা দীঘির নীরে,
ভাঁজটি খুলে ছড়িয়ে প'ল পরীর পাখার স্বর্ণালোক।

স্বপ্নসম তার কাহিনী আজকে প্রিয়ে দ্বিপ্রহরে,
নোনা আতায় সোনার গায়ে রবির কিরণ পিছলে পড়ে,
দূর্বাশ্যামল নিম্বতল দীপ্ত নভোনীলোজ্জ্বল
ঢেউয়ের মাথায় খানিক ভাঙ্গে গাঙ্গের বুকে স্তরে স্তরে।

(৩)

হে যাদুকর শৈলনগর বঙ্গসাগর বেলা,
আঁধার রাতে বাতি ঘরের চপল আলোর খেলা,
কালীর বর্ণ অস্তরীপে জ্বালিয়ে স্বর্ণ আকাশ দীপে
পরশমণির রশ্মিপথে ভাসিয়ে দিলাম ভেলা।

(৪)

নীল আকাশে বুলিয়ে তুলী তুষার-সাদা শিখরগুলি
কে আঁকিল মেঘসাগরের পারে ?
বালক ভানুর আলোর কথা রঙ ফলানো কি আলপনা
দিগ্বধূরে সাজায় মোতির হারে।
শ্বেত-বিজুলি নিথর হয়ে ঘুমিয়েছে ঐ মূর্তি লয়ে
শিথানে তার উজল ঢেউয়ের সারি,
ছাড়িয়া ঐ উষার তারা সাম্‌নে মেমে আসছে কারা
কটাক্ষেতে স্ফটিক হলো বারি।

উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে সহজেই বোঝা যাইবে—কবি সৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বপ্ন-দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। কবির স্বপ্নদৃষ্টি শুধু বর্তমানের পরিদৃশ্যমান সৃষ্টিকেই স্বপ্ন-মাধুরী-ময় করে নাই, অতীতের স্মৃতির পথে, ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষার পথেও কবি স্বপ্নদৃষ্টিকে প্রেরণা করিয়াছেন। আপনার সকল সুখদুঃখ, জীবনের সকল ভাব

অনুভূতির উপরও তিনি স্বপ্নদৃষ্টিপাত করিয়াছেন। সে জন্য এই শ্রেণীর অধিকাংশ কবিতায় স্বপ্ন, যাদু, তন্দ্রা, তন্ময়তা ইত্যাদি কথারও বারবার উল্লেখ আছে। কবি সৃষ্টিকে যাদুকরের লীলা মনে করেন,—কোথাও এই দৃষ্টিকে বলিয়াছেন নয়নের মায়ামণি,—কোথাও বলিয়াছেন,—'দিনের রঙে এই দুনিয়া তাঁহার চোখে ঝাপসা লাগে'—'আবছায়ারা চোখের উপর আলপনা দেয়।' কোথাও বলিয়াছেন—'কে যেন তাঁহার মনের চোখে মেঘলা কাজল বুলিয়েছে।' অতীত তাঁহার কাছে—'সুদূর স্মৃতির অবগুণ্ঠিত শিখর।' কবি কখনো 'মোহিনীর কুহকরথে গরলভরা ঘ্রাণে আপনাকে মূর্ছাহত' দেখিতেছেন ; কখনো 'তন্দ্রাঘোরে বন্দী হইয়া অস্তপারে চলিয়াছেন, কখনও 'স্বনয়নীর মায়ামণির চিরগোপন ইশারাতে' পথ ভুলিতেছেন —ইত্যাদি।

এই কবিতাগুলি যে স্বপ্নদৃষ্টিরই ফল—তাহার একটা প্রমাণ ইহাদের রচনা-রীতির Sequence Logical নয়, Emotional নয়, Rhetoricalও নয়—ইহার Sequence স্বপ্নেরই Sequence. যেন অনেকটা Reflexive—ইহার ভাষাও স্বপ্নেরই ভাষা। অন্য শ্রেণীর কবিতার যে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও অর্থসঙ্গতি থাকে—এগুলির মধ্যে তাহা অক্ষরে অক্ষরে খুঁজিতে যাওয়া বৃথা। স্বপ্ন-মাধুরীই ইহাদের স্থায়ী ভাব—ইহাদের বিভাব অনুভাব সবই স্বপ্নজগৎ হইতে আহৃত।

স্বপ্নে যে আনন্দ আছে, তাহা একটা রসানুভূতির সৃষ্টি করে। আলঙ্কারিকরা সে রসানুভূতিকে কাব্যমনস্তত্ত্বের মধ্যে ধরেন নাই—কারণ জ্ঞানজাগ্রৎ মনই তাঁহাদের বিচার্য্য, স্বপ্নাবিষ্ট মনকে তাঁহারা রসরাজ্য হইতে বাদ দিয়াছেন।

স্বপ্নদৃষ্টি সম্বন্ধে যে কথা বলা হইল—স্বপ্নশ্রুতি সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। সত্যেন্দ্রনাথের অনেক কবিতাই স্বপ্নশ্রুতির মাধুর্যসঞ্চারমাত্র। রূপজগতে স্বপ্নদৃষ্টির সাহায্যে করুণানিধান যে শ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন—ধ্বনি-জগতে স্বপ্নশ্রুতির সাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ সেই শ্রেণীর কাব্যেরই সৃষ্টি করিয়াছেন। এইগুলি সত্যেন্দ্র-নাথের ছন্দের কসরৎ মাত্র নহে—কানের পথ দিয়া এইগুলি স্বপ্নের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। সত্যেন্দ্রনাথের—

(১)

চোখ তার চঞ্চল
এই চোখ বিহ্বল
এই চোখ জল জল
নাই তীর নাই তল

এই চোখ উৎসুক
ঘুম ঘুম সুখ-সুখ,
টল টল ঢল ঢল
এই চোখ ছল ছল।

জ্যোৎস্নায় নেই বাঁধ এই চাঁদ উন্মাদ,
এই মন উন্মন তন্ময় এই চাঁদ,
এই গান কোন্ সুর এই ধায় কোন্ দূর
কোন্ বায় ফুর্ ফুর্ কোন্ স্বপ্নের পুর।
গান তার গুন্ গুন্ মঞ্জীর রুন্ ঝুন্,
বোল তার ফিস্ ফিস্ চুল তার নিশ পিস,
সেই মোর বুল্ বুল্ নাই তার পিঞ্জর
চঞ্চল চুল্‌বুল্ পাখনায় নির্ভর। ইত্যাদি

(২)

সেথা—তন্দ্রার বীণকার মঙ্গল গায়,
সেথা—মেঘ-মল্লীর বন অঙ্গন ছায়,
সেথা—অর্বুদ পর্বত অদ্ভুত ঠাম
সে যে—দুর্গম দুশ্চর যক্ষের ধাম।
সেথা—ঘুম ডাইনীর ঘুম দেখ ঝাপসায়,
যেন—গুগ্‌গুল মশ্‌গুল ঢেউ আফসায়,
সেথা—দিয়ে গায় কুয়াসার ভোটকম্বল
যত—উদাসীন বাতাসের ঘোটমণ্ডল।
সেকি—দৃষ্টির চন্দনবৃষ্টি, মরি
নিতে—সৃষ্টির সন্তাপ রিষ্টি হরি'!
সেকি—কাঞ্চনচম্পকলাঞ্ছন রূপ,
সেকি—সৌরভ-তন্ময় পুণ্যের ধূপ,
সেথা—ঝিল্লীর উল্লাস হিল্লোল বায়,
লাগে—নিত্যের নিঃশ্বাস চিত্তের গায়।

(৩)

মেঘলা থমথম সূর্য ইন্দু ডুব্‌ল বাদলায় দুল্‌ল সিন্ধু
হেমকদম্বে তৃণস্তম্বে ফুট্‌ল হর্ষের অশ্রুবিন্দু।
মৌন নৃত্যে মগ্ন খঞ্জন মেঘসমুদ্রে চল্‌ছে মন্থন,
দগ্ধ দৃষ্টি বিশ্বসৃষ্টির মুগ্ধ নেত্রে স্নিগ্ধ অঞ্জন।

বাজছে শূন্যে অভ্রকম্বু কাঁপছে অম্বর কাঁপছে অম্বু
লক্ষ ঝর্ণায় উঠছে ঝঙ্কার ওম্‌ স্বয়ম্ভু, ওম্‌ স্বয়ম্ভু।
বম্‌ ববম্‌বম্‌ শব্দ গম্ভীর বৃন্তে ছম ছম শুদ্ধ জম্বীর,
মেঘমৃদঙ্গে প্রাণসারঙ্গে স্বপ্নমল্লার স্বপ্ন হাম্বীর।
সান্দ্র বর্ষণ হর্ষকল্লোল ঝিল্লীগুঞ্জন মঞ্জু হিল্লোল,
মূর্ছে বীণ আর মূর্ছে বীণকার মূর্ছে বর্ষার ছন্দোহিন্দোল।

সত্যেন্দ্রনাথের 'ঝর্ণা' 'হিন্দোলবিলাস' ইত্যাদি কবিতাও এই শ্রেণীর।

সত্যেন্দ্রনাথের কিশোরী, কুঙ্কুম-পঞ্চাশৎ, জ্যৈষ্ঠীমধু প্রভৃতি কবিতা করুণানিধানের স্বপ্নকাব্যেরই কাছাকাছি।

পক্ষান্তরে করুণানিধানেরও কোন কোন কবিতায় ধ্বনির দিক হইতেও স্বপ্নমাধুরী ফুটিয়াছে। যেমন—

হাসে···সুন্দর মুখ খঞ্জন চোখ, জাফরান-রঙ অঞ্চল,
নাহি—নৃত্যের শেষ সঙ্গীতরেশ, ফুলবাণ সব চঞ্চল,
ওই—আনমন চম্পায়, মান—স্বপ্নের আবছায়
কার—যৌবনলোল হাস্যের রোল, রূপদর্পণ ঝলমল ?

এলো—জ্যোৎস্নার রাত বন্ধুর সাথ নন্দন ফুলশয্যা ;
খেল—রঙ্গের ফাগ, চুম্বন রাগ—লজ্জায় লাল লজ্জা।
মধু—মল্লীর সৌরভ চুমে—কুন্তলগৌরব
ওরে—চায় প্রাণমন আপনার জন, বনময় ফুলসজ্জা।

ওরে—কঙ্কণসুর ঝঙ্কার তোল, আয় ফুল-মৌ পান কর
জাগে—বংশীর তান হর্ষের বান, রাত-ভোর গীত-নির্ঝর।
খোল—কাঞ্চীর বন্ধন হোক্‌—উন্মদ ঘূর্ণন
খুলে—দিক ওড়নার কাঞ্চন পাড় কন্দর্পের ফুলশর।

এ সকল কবিতায় কোন জাগ্রৎরসাবিষ্ট মনের সক্রিয়তা নাই—আছে স্বপ্নাবিষ্টমনের আবছায়া শব্দের কলঝঙ্কৃত তরঙ্গ। স্বপ্নশ্রুতিতেই ইহাদের মাধুর্য আস্বাদিত হয়।

ব্যঙ্গ্যার্থ

এমন আলঙ্কারিকও আমাদের দেশে ছিলেন, এখনও এমন অনেক পাঠক, অধ্যাপক, সমালোচক আছেন—যাঁহারা রসগর্ভ Symbolical কাব্যের একটা নির্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ না পাইলে তাহাকে কাব্য বলিয়া গণনা করেন না—প্রহেলিকার শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। এই সব অর্থলোভী পাঠকগণ সকল কবিতাতেই ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানে ব্যস্ত—ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্ধার হইলেই তাঁহারা তৃপ্ত—কাব্যপাঠের কর্তব্য তাঁহাদের সমাপ্ত। কবির তাহাতে কোন আপত্তি নাই—তিনি বলেন—

"যখন কবিতাটা লিখিতে বসিয়াছিলাম—তখন কোন অর্থই মাথায় ছিল না। তোমাদের কল্যাণে দেখিতেছি লেখাটা বড় নিরর্থক হয় নাই। * * * যাহারা আগ্রহভরে কেবল শিক্ষাংশটুকু (অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ) বাহির করিতে চাহেন—আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সুখে থাকুন। * * * যিনি যাহা পাইলেন সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই লইয়া ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

কবি তাহা বলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের সঙ্গে অর্থলোভীদের বিরোধ আছে। আমরা বলি—তোমরা একটা গূঢ় অর্থের উদ্ধার করিয়া যে আনন্দ পাইলে তাহা বোধানন্দমাত্র (Intellectual Pleasure),—'এহো বাহ্য আগে কহ আর।' কাব্যের আনন্দ বা রস নয়। সকল প্রকার আবিষ্কার, সংশয়নিরসন, সমস্যার সমাধানে যে আনন্দ তোমরা পাও, এ আনন্দ তাহা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কাব্যে বাচ্যাতীত কিছু থাকিলে কাব্য যে উচ্চশ্রেণীর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাচ্যাতীত উপভোগ্যকে আলঙ্কারিকগণ বলেন ধ্বনি। বাচ্যাতিশায়িনি ব্যঙ্গ্যে ধ্বনিস্তৎ কাব্যমুত্তমং, কিন্তু সেই ব্যঙ্গ্যার্থ যদি একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থ হয়, তবে কাব্যে রসবত্তা সংকীর্ণ হইয়াই পড়ে। তাহা বোধানন্দকে যতটা সাহায্য করে, রসানন্দকে ততটা সাহায্য করে না। ব্যঞ্জনার অস্তিত্বের প্রয়োজন আছে—কিন্তু তাহার অনির্বচনীয়তা চাই—তাহা চিত্তকে একটি বাঁধা পথে লইয়া না গিয়া তাহাকে বাচ্যার্থ ছাড়াইয়া দিগ্‌দিগন্তে যুগযুগান্তে লইয়া যাইবে আনন্দের পাথেয় দিয়া। কবি বলিয়াছেন—

কবি আপনার গানে কত কথা কহে,
নানা জনে লয় তার নানা অর্থ টানি
তোমাপানে যায় তার শেষ অর্থখানি।

এই 'তোমা' ভগবান নয়,—অনন্ত। শেষ অর্থ অনন্তের পানে।—এ অর্থ-সন্ধানের শেষ হইবে না—এ সন্ধানে ক্লেশ নাই—শ্রম নাই—আয়াস নাই। সন্ধিৎসাতেই আনন্দ। এ সন্ধান যেমন কোন দিন ফুরাইবে না—কবিতা-উপভোগের আনন্দও তেমনি ফুরাইবে না।

উচ্চশ্রেণীর কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থের যে শেষ নাই—তাহার একটি প্রমাণ এই। এক শত রসজ্ঞ পাঠককে যদি কোন কবিতার ব্যঙ্গ্যার্থের কথা জিজ্ঞাসা করা যায়—এক শত জন এক শত প্রকারের ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধান দিবে—কোনটাই হয়ত অসমঞ্জস বা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না। পাঠকের আপন মনেই কতপ্রকারের অর্থের উদয় হইবে—জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন নূতন অর্থের আবিষ্কার হইবে। ফলে, পাঠকের চিত্ত সকল অর্থের অতীত আনন্দলোকে গিয়া বিশ্রামলাভ করিবে। বিনা সন্ধানে আপনা হইতে যে সকল অর্থের উন্মেষ হইবে—সেই সকল অর্থও নব নব রসানন্দ দান করিবে। কোন একটি নির্দিষ্ট অর্থ পাইলে রসের দিক হইতে ক্ষতি ছাড়া লাভ কিছু নাই।

কোন অর্থ যদি নাই পাওয়া যায়, 'ইতি ব্যঞ্জ্যতে' বলিয়া কিছু যদি নাই ধরা যায়, তাহা হইলেই কি কবিতা ব্যর্থ হইল? কোন অর্থের সন্ধান না পাইলে বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন হয় না বটে, কিন্তু অবিমিশ্র রসানন্দলাভে কোন ব্যাঘাতই হয় না। সে জন্য রসজ্ঞ ব্যক্তিগণ Symbolical কবিতাতেও কোন প্রকার ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানই করেন না। তাঁহারা বোধানন্দের সহিত রসানন্দের মিলন ঘটাইতে চাহেন না। পাঠকচিত্ত বাচ্যাতিশায়ী ইঙ্গনার পথে যাত্রা করিলেই হইল। সে পথে তাহার গতির আনন্দই রসানন্দ।

এখন দুই একটি কবিতা তুলিয়া কথাটা পরিষ্কার করা যাক—

"বিধি যেদিন ক্ষান্ত দিলেন সৃষ্টি করার কাজে,
সকল তারা উঠল ফুটে নীল আকাশের মাঝে;
নবীন সৃষ্টি সাম্‌নে রেখে সুর-সভার তলে,
ছায়াপথে দেব্‌তা সবাই বসেন দলে দলে।
গাহেন তাঁরা,—"কি আনন্দ, একি পূর্ণ ছবি!
একি মন্ত্র, একি ছন্দ—গ্রহ চন্দ্র রবি!"

হেনকালে সভায় কেগো হঠাৎ বলি' উঠে,
"জ্যোতির মালায় একটি তারা কোথায় গেছে টুটে !"
ছিঁড়ে গেল বীণার তন্ত্রী থেমে গেল গান,
হারা তারা কোথায় গেল পড়িল সন্ধান।
সবাই বলে,—"সেই তারাতেই স্বর্গ হতো আলো,
সেই তারাটাই সবার বড় সবার চেয়ে ভালো।"
সে দিন হ'তে জগৎ আছে সেই তারাটির খোঁজে,
তৃপ্তি নাহি দিনে রাত্রে চক্ষু নাহি বোজে।
সবাই বলে, "সকল চেয়ে তারেই পাওয়া চাই",
সবাই বলে, "সে গিয়াছে ভুবন কানা তাই।"
শুধু গভীর রাত্রি বেলায় স্তব্ধ তারার দলে
"মিথ্যা খোঁজা, সবাই আছে," নীরব হেসে বলে। (খেয়া)

ইহাতে বোধানন্দ ছাড়া অন্য কিছু পাওয়ার কথা নয়। এখানে বোধানন্দকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য ব্যঙ্গ্যার্থ-সন্ধানের প্রয়োজন আছে! নির্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ না পাইলেও রচনাটি কিন্তু ব্যর্থ নয়। মানুষের সকল অস্বস্তি অসন্তোষ ও আক্ষেপের মূলে যে একটা ভ্রান্তি ছাড়া কিছুই নাই—এইটুকু বুঝিলেই যথেষ্ট। এই ভ্রান্তিটা সংস্কারজাত।

রূপকাশ্রিত কবিতার মতো symbol-এর প্রতি অঙ্গের সঙ্গে অর্থ সামঞ্জস্যের সন্ধান করা বিড়ম্বনা। পাঠকের মনের দর্পণে কবিতাটির যে প্রতিবিম্ব পাত হয়, তাহাতেই কাব্যসত্যটি ধরা যায়—সেই সত্যের আলোকে symbol-এর নিজস্ব রসরূপটিকেই উপভোগ করিতে হইবে। নির্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ পাইলে বোধানন্দ সম্পূর্ণাঙ্গ হয়, কিন্তু রসানন্দ একটুও পাওয়া যায় না। কবির symbol-এর সাহায্যে বলিবার কৌশলটি হইতেই একটা বোধানন্দ পাওয়া যায়। তাহার সহিত যে একটা রহস্যময়তা বিজড়িত আছে—তাহাতে রসানন্দও পাওয়া যায়। অর্থের উদ্ধার করিতে গেলে ঐ রহস্যটুকু উবিয়া যাইবে।

আর একটি কবিতা ধরা যাক—

"হায়—গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা ?
ওগো—তপন তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারিনে সেবা।"
শিশির কহিল কাঁদিয়া
"তোমারে রাখি যে বাঁধিয়া

হে রবি, এমন নাহিক আমার বল,
তোমা বিনা তাই ক্ষুদ্র জীবন কেবলি অশ্রুজল।"
"আমি—বিপুল কিরণে ভুবন করি যে আলো
তবু—শিশিরটুকুরে ধরা দিতে পারি বাসিতে পারি যে ভালো।"
শিশিরের বুকে আসিয়া
কহিল তপন হাসিয়া
"ছোট হয়ে আমি রহিব তোমারে ভরি
তোমার ক্ষুদ্র জীবন গড়িব হাসির মতন করি।"

এই কবিতার রসবোধের জন্য ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানের কি কোন প্রয়োজন আছে? এখানে সূর্য কে, শিশির কে, জানিবার জন্য আগ্রহ কখনও রসিকচিত্তে জাগিবে না। রসিক বুঝে—এ ভুবনের মনোবন-ভবন-গগন-প্রান্তরের সকল রবির, সকল শিশিরকণার সম্বন্ধে এই একই কথা। কবি-রবি নিজেও বাদ পড়েন না। কোন বিশিষ্ট 'তপন' বা কোন বিশিষ্ট 'শিশির' এখানে বড় কথা নয়,—বড় কথা একের উদার দাক্ষিণ্য ও অন্যের আকুল আকুতি। বিরাটের সহিত ক্ষুদ্রের, বিশালের সহিত তুচ্ছের,—শাশ্বতের সহিত ক্ষণিকের, মহিমার সহিত অণিমার এই যে প্রেম-বিনিময়, তাহাতেই কবিতা রসে সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

'সোনার তরী' কবিতাটির অর্থ আবিষ্কারের জন্য কি প্রচণ্ড দ্বন্দ্বই না হইয়াছে! বড়ই বিস্ময়ের বিষয়, একজন কবিই কাবলিওয়ালার মত কবিতাটির কাছে অর্থ দাবি করিয়াছিলেন। অর্থ যাহাই হউক,—এখানে তরীটি কি, ধান কি, ধানের মালিক কে, নেয়ে কে, নদীটি কি, রসিক পাঠক এ সকলের জন্য বৃথা মাথা ঘামাইবে না।

ভরা বর্ষার নদীকূলে শ্রাবণ গগনের তলে ক্ষেতের মালিকের এই যে অসহায় দশা—শূন্য ক্ষেতখানির পানে চাহিয়া দীর্ঘশ্বাস—এই যে নদীকূলে দাঁড়াইয়া যতদূর দৃষ্টি যায় তাহার সর্বস্ব-চোর তরীটির পানে অবাক বেদনায় চাহিয়া থাকা, পাঠকের চিত্তকে যে ঐ দূর দূর অকূলের পানে আকর্ষণ, ইহাতেও যদি কবিতা সার্থক না হয়—তবে ব্রহ্ম, জীবাত্মা, কর্মফল, জীবনদেবতা, মহাকাল ইত্যাদির কথা টানিয়া আনিলেই কি তাহা সার্থক হইবে?

'পরশ পাথর' কবিতায়—পরশ পাথক কি মহাধন, সেইটাই বড় কথা নয়,—ক্ষ্যাপা কে তাহা জানিয়াও লাভ নাই। ক্ষ্যাপা যেই হোক—তাহার জীবনটাই আমাদের চাই,—এ জগতের সকল 'ক্ষ্যাপা'—সকল 'পরশ পাথরের' সম্বন্ধেই কবির বাক্য সমান সার্থক। ক্ষ্যাপার একনিষ্ঠ সাধনা, স্বয়ম্বৃত দারুণ আত্মনিগ্রহ,

দুর্লভের জন্য আত্মবঞ্চনা, অবাস্তব একটা কোন লাভের জন্য বাস্তব সহজলভ্য সম্ভবকে উপেক্ষা—আমাদের হৃদয়কে বিচলিত করে, ইহাই রসবোধের পক্ষে যথেষ্ট। এস্থলে কোন নির্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থের খোঁজ না পাওয়ায় রসিকের রসবোধে কোন বাধাই নাই।

ব্যঙ্গ্যার্থকেই যাঁহারা কাব্যের সর্বস্ব মনে করেন, তাঁহাদের কাছে হয় ত এইগুলি প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইবে।

যে কবিতায় ব্যঞ্জনা আছে, অথচ স্পষ্ট কোন বিশিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ হয়ত নাই, তাহা আমাদের চিত্তকে উপরের দিকেই টানে; তাহারই নাম রসাভিমুখী হওয়া। অতীন্দ্রিয় ব্যঞ্জনা থাকিলে তাহা অনন্তের দিকেই আকর্ষণ করে—এই অনন্তের অভিমুখী হওয়া এবং রস-সম্ভোগ একই কথা।

কবিই রসগুরু

যে জীর্ণ মন্দিরকে আমরা অসুন্দর দেখি—কবি যদি তাহাকে কাব্যে সুন্দর করিয়া তুলিয়া থাকেন—কবি যদি বলেন—

সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তি-রন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শঙ্খে অসংখ্য জয় জয়।

তবে এই কথা বার বার শুনিয়া ও স্মরণ করিয়া আমরা আর জীর্ণ মন্দিরকে কুশ্রী দেখিতে পারি না। যে চোখে তাহাকে দেখিতাম,—কাব্যরস-উপভোগের পর আর তাহাকে ঠিক সে চোখে দেখিতে পারি না।

মানবসংসারের সকল জীর্ণ মন্দির সম্বন্ধেই এই কথা খাটে।

মেঘকে আমরা সুন্দর দেখি না যে তাহা নয়—কিন্তু মেঘদূতের কাব্যরস উপভোগের পর মেঘকে সুন্দরতর দেখিবে না এমন কোন্ পাঠক আছে? কোন্ পাঠকের নয়নে মেঘ অপূর্ব স্বপ্নজালের সৃষ্টি করিবে না?

কেবল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের কথা কেন বলিতেছি—কবি যাহাকে স্বপ্নমাধুরীর স্পর্শ দিয়াছেন তাহাই হইয়াছে অপূর্ব—কোনটি চর্মনেত্রে,—কোনটি মর্মনেত্রে।

কবির কাব্য পড়িয়া আমরা মানুষকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছি। যাহাকে উপেক্ষা করিতাম—তাহাকে শ্রদ্ধা করি, যাহার প্রতি উদাসীন ছিলাম—তাহার পানে ঘন ঘন তাকাই,—যাহার প্রতি প্রীতি বা অপ্রীতি ছিল না,—তাহাকে ভালবাসিতে শিখি।

কবির কাব্যে প্রণয়ামৃতের মাধুর্য উপভোগ করিলে আমাদের মনের রসনায় সে মাধুর্যবোধ চিরলগ্ন হইয়া যায়, তাহাতে প্রিয়ার প্রণয়ও মধুরতর হয়—প্রিয়াও প্রিয়তরা হইয়া উঠে।

যে দুঃখকে আমরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে এড়াইয়া চলি, সেই দুঃখ কাব্যে কবির প্রীতিস্নিগ্ধ মৈত্রী লাভ করে। কবির কাব্য পড়িয়া দুঃখকে বরণ করিতে শিখি আর নাই শিখি—দুঃখের সহিত মৈত্রী স্থাপনের জন্য আমাদেরও আগ্রহ জন্মে। কবি এই বিশ্ব-প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের পঞ্চপাত্রে যে মাধুরী উপভোগ করিয়াছেন, সে মাধুরী সম্পূর্ণ আমরা উপভোগ করিতে পারি না সত্য,—কিন্তু কবির রসজীবনের, মনোবৃত্তির ও রসদৃষ্টির কিছুরই কি আমরা তাঁহার কাব্য পাঠে অংশী হই না?

কবির কাব্যে আমরা একটা সাময়িক উপভোগ্যই কেবল লাভ করি না—আমাদের স্থায়ী লাভও যথেষ্ট হয়। আমাদের দৃষ্টির প্রকৃতিই যায় বদলাইয়া—আমাদের চিত্তের অঙ্গে নব নব ভোগেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়। শুধু আমাদের রস-বোধ ও সৌন্দর্য-বোধই বাড়ে না—আমাদের সৃজনী শক্তিরও সঞ্চার হয়। অসুন্দরকে সুন্দর করিয়া তুলিবার, অনুপভোগ্যকে উপভোগ্য করিয়া তুলিবার, অবজ্ঞেয়কে শ্রদ্ধেয় করিয়া দেখিবার একটা চিরন্তনী শক্তিও লাভ করি! কবি অন্তরে যে মাধুরীর উৎস খুলিয়া দেন, তাহা অন্তরেই পরিচ্ছিন্ন নয়—তাহা আমাদের জীবনময় ভুবনময় ছড়াইয়া পড়ে। সমস্ত জীবন,—সমগ্র ভুবনই তাহাতে মধুময় হইয়া উঠে। কবি কাব্যে যে বস্তু, যে চিত্র বা যে দৃশ্যকে শ্রীমাধুরীতে উপভোগ্য করিয়া তুলিয়াছেন—সর্বাগ্রে তাহারাই আমাদের রসদৃষ্টি আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু আমাদের রসদৃষ্টি কেবল তাহার আতিথ্যেই তৃপ্ত হইয়া ফিরে না। একবার সে যখন ঘরছাড়া হইয়া যাত্রা করে, তখন অনেকেরই মধুপর্কের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া সে ফিরিয়া আসে না।—ফলে সকল বস্তুতেই আমরা নবশ্রী দেখিতে পাই—নব নব মাধুরী উপভোগ করিতে পারি।

এটা যে জীবনের পক্ষে কত বড় লাভ, তাহা আমরা ভাবিয়া দেখি না—এ সংসারহাটের কোন মুদ্রা বা পরিমাপকের দ্বারা তাহার মূল্যমর্যাদা বা পরিমাণ

নিরূপিত হইতে পারে না।

এইখানে কাব্যের সহিত আমাদের জীবনের প্রকৃত যোগ। রসিকমাত্রেই বুঝেন,—কবির কাব্যের সৌন্দর্য কিরূপে জীবনের চিরসঙ্গী হয়, শুধু চিরসঙ্গী কেন—জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া যায়।

শুধু ব্যক্তিগত জীবন কেন—জাতীয় জীবনের দৃষ্টি, চিন্তা ও আদর্শের কতটা অংশ কবির কাব্যের দান, তাহা কেহ বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই। বিশ্বমানব জীবনের ভাবচিন্তা রুচিপ্রবৃত্তি, গতিপ্রকৃতি ও রসবিদগ্ধতা কতটা যুগযুগান্তরের কাব্যপরম্পরার দ্বারা পরিকল্পিত—তাহার পরিমাণ কে নির্দেশ করিতেছে?

কবির কাব্য রসিকের বিশ্বকে ও রসিকের জীবনকে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়—অন্ততঃ নূতন সৌন্দর্যে মণ্ডিত করে। তাহার জন্য রসিকের সাক্ষ্যই এখানে উপস্থাপিত করি—

(কবিগুরুর প্রতি)

নবশ্রীরূপ সঞ্চারিলে জীবলোকের জীবন ভরি,
নূতন ক'রে গড়লে ভুবন পুন মনোলোভন করি।
কুব্জা হলো অব্জবিভা অহল্যা তার তুলল গ্রীবা
উর্বশীরে মুক্তি দিলে, বন্দী-জীবন মোচন করি।

কলির প্রাণে নবীন গন্ধ অলির গানে ছন্দ নব,
মেঘের মুখে মন্দ্র নবীন অর্পিল আনন্দ তব,
অনীরিত অনেক বাণী অঝঙ্কৃত অনেক গানই
শুনালে মূকজড়ের মুখে সম্ভবিল অসম্ভবও।

নূতন নূতন দ্বার বাতায়ন খুল্‌লে তুমি গগন গায়ে,
সনাতনী ব্রাহ্মী বাণী আবার শুনি গহন ছায়ে।
মর্মে পেলাম কল্পশ্রুতি অতীন্দ্রিয় অনুভূতি,
নূতন নূতন ইন্দ্রিয়দের ফুটালে এই মনের কায়ে।

অনাদৃত হীন হেয় যা নয়নে তাও লাগ্‌ল ভালো,
জীর্ণ কুঁড়ের ছিদ্রগুলোও ঝর্ণা হয়ে ঢাল্‌ল আলো।
ইন্দ্রধনুর কান্ত রাগে তোমার তুলীর টানটি জাগে
তোমার চরণাঙ্ক লভি তৃণাঙ্কুরও মন ভুলালো।

এই তো গেল কবির কাব্যের উপভোক্তার উক্তি। কবি নিজেই কল্পিত কবির

মুখ দিয়া 'পুরস্কার' কবিতায় একথা বলিয়াছেন—

ধরণীর শ্যাম করপুটখানি ভরি দিব আমি সেই গীত আনি,
বাতাসে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর-অর্থ-ভরা।
নবীন আষাঢ়ে রচি নব মায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া,
ক'রে দিয়ে যাব বসন্তকায়া বাসন্তীবাস-পরা।
ধরণীর তলে গগনের গায় সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
আরেকটু-খানি নবীন আভায় রঙীন করিয়া দিব।
সংসার-মাঝে কয়েকটি সুর রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর
দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর তার পরে ছুটি নিব।
সুখহাসি আরো হবে উজ্জ্বল সুন্দর হবে নয়নের জল,
স্নেহসুধা-মাখা বাসগৃহতল আরো আপনার হবে,
প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আর একটু মধু দিয়ে যাব ভরে,
আর একটু স্নেহ শিশুমুখ-'পরে শিশিরের মত রবে।

এই ভয়েই ধর্মগুরু কবিকে বলেন—

সর্বনাশ করিতেছ তুমি
আরো রমণীয় করি তুলি এই মায়া-রঙ্গভূমি
ধরার মৃন্ময় পাত্রে ঢালি নিত্য মদিরা-মাধুরী।
নব মধু সঞ্চারিয়া জীবনের রন্ধ্রগুলি পূরি,
নিসর্গের অঙ্গে অঙ্গে দিয়া নব নব অলঙ্কার
করি লোভনীয় তায় নাশো ইষ্ট মানব-আত্মার
নানা ছলে। যায় ভুলে,—হবে তারে ফিরিতে স্ববাসে,
মেষ বানাবার মন্ত্র বেশ জানো ধরার প্রবাসে।
নূতন মাধুরীরস বিতরিয়া রমণীর প্রেমে
শুক্তিরে করিলে রৌপ্য, সুরভি করিলে তুমি হেমে।
প্রিয়তর ক'রে তুলি অবিদ্যার অনিত্য অসারে,
বিমোহ ঘনালে শুধু মায়ামুগ্ধ এ স্বপ্ন-সংসারে,
এ কথা ভেবেছ ভুলে? নর-নেত্রে রসাঞ্জনী তুলী
বুলায়ে ভুলায়ে তারে মোহ-পাশে রাখিবে আগুলি?
ভুলে গেলে সব ছেড়ে যেতে হবে মৃত্যুর আহ্বানে,
বেদনা বাড়ালে শুধু হায় মহাযাত্রীর প্রয়াণে।

কবি উত্তর দিবেন—

জীবনেরে করেছি মধুর
মরণে মধুরতর করেছি যে তাহা ত ঠাকুর,
দেখিলে না ভাবিলে না? মরণের রুদ্র বিভীষিকা
হাড়মাল বাঘছাল ললাটের জ্বলদর্চিশিখা
একে একে সব তার হেসে হেসে করেছি হরণ
তাহারে বরের বেশে সাজায়েছি, পুষ্প-আভরণ
পরায়েছি অঙ্গে তার। অনন্তের ডাকে সগৌরবে
মৃত্যু তরিবার মন্ত্র শিখায়েছি শঙ্কিত মানবে।
জীবনপথের যাত্রা মধুময় করেছি যদিও
অনন্ত পথের যাত্রা করিয়াছি আরো স্পৃহণীয়,
যাত্রীর অঞ্চলপ্রান্তে সন্তর্পণে দিয়াছি বাঁধিয়া
আনন্দ পাথেয় ধন। অনন্তের সম্বল না দিয়া
বাড়াইনি জীবনের উপভোগ্য রসের বৈভব,
জীবনে দিয়াছি হর্ষ মরণেও দিয়াছি গৌরব।

উপন্যাস-রচনায় বিদ্যাবত্তা

উপন্যাস-রচনায় বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে কিনা, এই প্রশ্নটি মাঝে মাঝে সুশিক্ষিত পাঠক-সমাজে উদিত হয়। লেখকের পাণ্ডিত্য থাকিলে উপন্যাসে তাহার বিনিয়োগের সার্থকতা আছে কিনা, পূর্বোক্ত প্রশ্নের সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ আছে।

আমাদের দেশের উপন্যাস লইয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র সুপণ্ডিত মনীষী ছিলেন, কিন্তু তিনি উপন্যাসে পাণ্ডিত্যের বিশেষ বিনিয়োগ করেন নাই। তাঁহার উপন্যাসে এমন দুই-একটি চরিত্র আছে, যাহাদের সংলাপের মধ্য দিয়া তিনি পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে পারিতেন। উপন্যাস সাধারণ পাঠকদের জন্য লিখিত হয় বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যতদূর সম্ভব পাণ্ডিত্য সংবরণ করিয়াই চলিয়াছেন। পাত্রপাত্রীর মুখে পাণ্ডিত্য প্রকাশ না করিলেও তাঁহার নিজস্ব মন্তব্যে চিন্তাশীলতা

ও পাণ্ডিত্যের নিদর্শন আছে। তাহাতে উপন্যাসের গৌরবই বাড়িয়াছে, অথচ তাঁহার উপন্যাস সাধারণ পাঠকের পক্ষে অনধিগম্য হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'শেষের কবিতা' ইত্যাদি উপন্যাসে পাত্রপাত্রী রীতিমত সুশিক্ষিত। তাহাদের মুখে উপযুক্ত ভাষণই তিনি সমাবেশ করিয়াছেন ; তাহাতে তাঁহার ভাবুকতা, পাণ্ডিত্য ও আলঙ্কারিক চাতুর্য প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মন্তব্যেও যথেষ্ট চিন্তাশীলতা ও পাণ্ডিত্য আছে। এই উপন্যাস-গুলি সাধারণ পাঠক-পাঠিকার বিশেষ উপভোগ্য না হইলেও বিদ্বজ্জনের উপ-ভোগ্য। এইগুলি প্রমোদ-পিপাসা নিবৃত্তির অনেক উর্ধ্বে অবস্থিত এবং ইহাদের স্থায়ী সাহিত্যিক মূল্যও যথেষ্ট।

শরৎচন্দ্রের পাত্র-পাত্রী সাধারণতঃ বাঙালী অল্পবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সমাজের অল্পশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নরনারী। তাহাদের মুখের কথায় বিদ্যাবত্তার অবকাশ নাই। তাঁহার মন্তব্যগুলিতেও পাণ্ডিত্য অপেক্ষা ভাববিহ্বলতা এবং হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসই প্রবল। তাঁহার উপন্যাসে সুশিক্ষিত চরিত্রও নিতান্ত কম নাই, কিন্তু তাহারা কেহই বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করে নাই। শরৎচন্দ্র সাধারণতঃ অশিক্ষিতা নারীদেরই অত্যন্ত মুখর করিয়া তুলিয়াছেন, সুশিক্ষিত পুরুষেরা সাধারণতঃ মিতভাষী ও উদাসীন প্রকৃতির। শরৎচন্দ্র নিজের মতবাদ প্রকাশের জন্য একটি পুরুষ ও দুইটি নারী চরিত্রের সহায়তা লইয়াছেন। পুরুষটি 'পথের দাবী'র সব্যসাচী। সব্যসাচী কর্মবীর, কর্মবীরের পক্ষে অতটা মুখর হইবার কথা নয়। তাঁহাকে অসাধারণ বিদ্বান বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মুখেও বিদ্যাবত্তা অপেক্ষা হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসই বেশী মাত্রায় উৎসারিত হইয়াছে।

নারী দুইটির মধ্যে একটি 'চরিত্রহীন'-এর কিরণ, আর একটি 'শেষ প্রশ্ন'-এর কমল। ইহাদের বিদুষী বলা হইয়াছে। ইহারা গ্রামোফোনের মত শরৎচন্দ্রের প্রগতিমূলক মতবাদ ব্যক্ত করিয়া গিয়াছে—আর শ্রোতারা স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হইয়া শুনিয়াছে।

তারপর উপন্যাস-সাহিত্যে উচ্চশিক্ষিত চরিত্রের সংখ্যা আরও কমিয়া আসিয়াছে কাজেই এ সম্বন্ধে লেখকের দায়িত্বও খুবই লঘু হইয়াছে। লেখকরা মন্তব্যও খুব কমই করেন। সাধারণতঃ পাত্রপাত্রীর সংলাপ বা বাক্য-বিনিময়ের দ্বারাই অধিকাংশ উপন্যাস গঠিত হইতেছে। এই বাক্যবিনিময়ের আর্টের অবশ্য অসামান্য উন্নতি হইয়াছে। সুশিক্ষিত চরিত্র কোন কোন উপন্যাসে থাকিলেও তাহার চারিপাশে হয়ত অল্পশিক্ষিত চরিত্রেরই জনতা। কাজেই সে-চরিত্রের

মুখের কথায় বিদ্যার পরিচয় থাকিবার কথা নয়। সুশিক্ষিত চরিত্রের সহিত সুশিক্ষিত চরিত্রের ভাবের আদান-প্রদান দেখাইতে হইলে তদুপযোগী বাক্য-বিনিময়ের যথাযথতা রক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান সময়ের বাংলা উপন্যাসে সেরূপ পরিস্থিতি সাধারণতঃ এড়াইয়াই চলা হয়।

ইহাতেও যে ভাল উপন্যাস হইতেছে না—তাহা নয়, তবে মহৎ উপন্যাস ইহাতে হইবে কিনা তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

চিরদিন নিম্নশ্রেণীর জনগণ, অল্পবিদ্য নরনারী ও পল্লীবাসীদের লইয়াই উপন্যাস রচনা করিলে চলিবে না এবং কেবল ঐ শ্রেণীর নরনারীদের উপভোগ্য করিয়া রচনা করিলেই চলিবে না। উপন্যাসের ক্ষেত্র-পরিসর উপরদিকে বাড়াইতে হইবে। পল্লীবাসীদের বা বস্তিবাসীদের জীবনযাত্রা চিরদিন রোমাণ্টিক হইয়া থাকিবে না।

উচ্চ স্তরের সমাজের নরনারীর জীবনে যে-সব সমস্যা, পরিস্থিতি ও বিপর্যয় ঘটা স্বাভাবিক, তদনুগত যোটনা, ঘটনা, আবেষ্টনী ও দৃশ্যগুলিকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইলে যথাযথ অবিকল বর্ণনার তথ্য সংগ্রহের জন্য গ্রন্থলব্ধ-জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। ভিক্তর হিউগো, আনাতল ফ্রাঁস, ডিকেন্স, হার্ডি ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রচনায় এইরূপ গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় আছে।

কলা-সৃষ্টির মূলে জ্ঞানের প্রগাঢ়তার একটি ভিত্তিভূমি চাই। কেবল রসদৃষ্টিতে নয়, প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে জীবন ও ভুবনকে দেখার পরিচয় থাকা চাই। তাহা হইলেই উপন্যাস চিরন্তন মূল্য লাভ করিবে।

অতএব উপন্যাসের কলাসৌন্দর্যের সঙ্গে বিদ্যাবত্তা, অভিজ্ঞতার সঙ্গে চিন্তা-শীলতার, তথ্যের সঙ্গে তত্ত্বেরও মিলন চাই। কেবল গ্রাম্য পাঠাগারগুলির দিকে না চাহিয়া বিদ্বৎ-সমাজের দিকেও চাহিয়া লেখককে আগাইতে হইবে। এজন্য মনে হয় উপন্যাস রচনায় বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন আছে। অবশ্য ইহা নানা-ভাবে অর্জিত হইতে পারে—বিদ্যাবত্তা দানের অধিকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একচেটিয়া নয়। তবে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন অবশ্যই আছে। গ্রন্থরচনায় সমস্ত সময় নিয়োগ না করিয়া দেশ-বিদেশের গ্রন্থকাররা কী লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন তাহাও জানা দরকার।

ছন্দোহিল্লোল

অনেক সুদর্শন বাসভবনের চারিপাশের প্রাচীরের মাথা সরলরেখাক্রমে গড়া হয় না, গড়া হয় তরঙ্গিত করিয়া। ছাদের বেষ্টনীতেও এইরূপ তরঙ্গের ভঙ্গিমা দেওয়া হয়। ইহার কারণ কি ?

ইহার কারণ, বৈচিত্র্যহীন অংশগুলিতে একটা হিল্লোলিত বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য ও সৌষম্য স্থষ্টির প্রয়াস। মানুষের এই হিল্লোলপ্রীতি সহজাত সৌন্দর্যবোধেরই অঙ্গীভূত। তাই দেখি শৌখিন বাবুরা কাপড় কোঁচাইয়া পরে,—এমন কি জামার হাতা তুটিতেও গিলে করা কুঞ্চনের স্থষ্টি করে। নারীদের স্বর্ণালঙ্কারেও হিল্লোলিত ভঙ্গিমা দেখা যায়। কুঞ্চিত কেশ যে দেখিতে সুশ্রী, তাহা সকল দেশের নরনারীই স্বীকার করে। কুঞ্চিত কেশ লইয়াই যে জন্মগ্রহণ করে তাহাকে ভাগ্যবান বা ভাগ্যবতীই মনে করা হয়। ইউরোপের নারীরা কৃত্রিম উপায়ে কেশপাশকে কুঞ্চিত করায়। বেণীবয়নও কেশগুচ্ছকে হিল্লোলিত করা। ইউরোপে আগে পদস্থ লোকেরা কুঞ্চিত কেশের 'উইগ' পরিত, এখনও বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে পরে, মুখমণ্ডলের পরিবেশশ্রী বর্ধনের জন্য।

আমরা উৎসবাদি উপলক্ষে ঘর সাজাই দেবদারু পাতা দিয়া। অন্য কোন গাছের পাতা এ-কাজে লাগে না। কারণ, দেবদারু পাতাই কুঞ্চিত বা হিল্লোলিত।

শীতে ও বর্ষায় দেখা যায় পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহে পাকশালার চাল ফুঁড়িয়া ধূমরাশি কুণ্ডলিত হইয়া আকাশে উঠিতেছে। এই ধূমস্তোমের তরঙ্গিত ব্যোমযাত্রা দেখিয়া মনে হয়, পল্লীলক্ষ্মী যেন তাহার কুঞ্চিত কেশপাশ এলাইয়া দিয়াছে। মন্দিরে ধূপ-শলাকা হইতে যে সুগন্ধ নির্গত হয়, তাহাই শুধু দেবনরের উপভোগ্য নয়, তাহার বহ্নিরক্ত-শীর্ষ হইতে উদ্‌গত কুণ্ডলিত তরঙ্গিত ধূম-রেখাও নয়ন মোদন করে।

প্রকৃতিতে যাহা কিছু হিল্লোলিত বা তরঙ্গিত তাহাই আমাদেয় নয়ন-মন মুগ্ধ করে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বলাকা-পংক্তি মালার মত দোতুল্যমান হইয়া তরঙ্গিত ভঙ্গীতে দূরদিগন্তে উড়িয়া যায়, সেজন্য কবিতায় তাহার স্থান হইয়াছে।

বিদ্যুৎস্ফুরণে বজ্রভয় আছে—অন্ততঃ কর্ণবিদারী গর্জনের তাহা পূর্ব সঙ্কেত। তবু তরঙ্গিত বিদ্যুদ্দামের একটা ভৈরব সৌন্দর্য আছে।

পর্বতমালা তরঙ্গিত বলিয়াই বিশেষ করিয়া দূর হইতে আমাদের চোখে সুন্দর দেখায়, বৈচিত্র্যহীন সমুদ্রের যদি কিছু শোভা থাকে, তবে তাহা তাহার উচ্চাবচ-তরঙ্গমালায়। নিস্তরঙ্গ নদীর চেয়ে কলতরঙ্গিণী নদী আমাদের চোখে বেশী সুন্দর দেখায়।

পদক্ষেপের হিল্লোলিত ভঙ্গীই নৃত্যকলার রূপ বলিয়া সৌন্দর্যলীলায় দর্শকের আনন্দ বিধান করে। আর কণ্ঠস্বরের হিল্লোলিত উত্থান-পতনই সঙ্গীতকলা সৃষ্টি করিয়া আমাদের শ্রুতি বিনোদন করে।

সংস্কৃত কবিরা এই হিল্লোলের পূর্ণ মর্যাদা বুঝিতেন। সংস্কৃত কবিতার ছন্দো-হিল্লোলই কবিত্ব সৃষ্টির অর্ধাংশ। সংস্কৃত ভাষার শব্দে দীর্ঘস্বর ও হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণ বৈষম্য থাকায় স্বভাবতই শব্দাবলীর সুনিয়মিত ও সুপরিকল্পিত বিন্যাসে হিল্লোলের সৃষ্টি হয়।

যেমন—মন্দাক্রান্তা ছন্দে—

বিদ্যুদ্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

অথবা, প্রাকৃত মরহট্টা ছন্দে—

গোপকদম্ব-নিতম্ববতীমুখচুম্বনলম্ভিত লোভম্।
বন্ধুজীবমধুরাধরপল্লবমুল্লসিতস্মিতশোভম্॥

অথবা—চণ্ডবৃষ্টিপ্রপাত ছন্দে—

ইহ হি ভবতি—দণ্ডকা-রণ্য দে-শে স্থিতিঃ।
পুণ্যভা-জাং মুনী-নাং মনো-হারিণী॥

ইত্যাদি 'অবিদিতগুণাপি' যাহার কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করে না সে—

প্রায়ঃ পশুঃ পুচ্ছবিষাণহীনঃ।

ইংরেজী ভাষার শব্দগুলির অংশবিশেষে শক্তিপ্রয়োগ করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। স্বভাবতই ছন্দে তাহা হিল্লোল (রিদম্) সৃষ্টি করে। এমন কি, ইংরেজী গদ্যভাষাকেও ঐ শক্তি-প্রয়োগ অনেকটা হিল্লোলিত করে।

প্রাচীন বাংলা কবিতার ভাষায় ঐ-কার ঔ-কার, ছাড়া সকল স্বরের উচ্চারণ হ্রস্বত্ব প্রাপ্ত হইল—তাহাতে ছন্দো-হিল্লোলের আর উপায় থাকিল না। গোবিন্দদাস, রায়শেখর প্রভৃতি যেসব বৈষ্ণব পদকর্তা ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন,

তাঁহারা ব্রজবুলির আশ্রয় লইয়াছিলেন। ব্রজবুলিতে স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ বিহিত আছে।

বহুদিন পরে মাইকেল মধুসূদন বাংলা ভাষার এই দৈন্যদুর্বলতা লক্ষ্য করিয়া ছন্দে তরঙ্গ-সৃষ্টির জন্য বহুল পরিমাণে যুক্তাক্ষর-প্রয়োগের প্রয়োজন বোধ করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার কাব্যে বহু অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের সন্নিবেশ ঘটিল। তিনি মিত্রাক্ষর বর্জন করিয়া তাহার অভাবের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে পদবিন্যাসের হিল্লোলের এবং বাক্যবিন্যাসে কল্লোলেরও সৃষ্টি করিলেন।

মাইকেলের পর এই সমতল দেশের ছন্দে আবার প্রাক্তন সামতল্য আসিয়া পড়িল। রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করিলেন—রামপ্রসাদী ছন্দে (ছড়ার ছন্দে) স্বরান্ত পদাংশ এবং হসন্ত পদাংশের মিলনে ছন্দোহিল্লোলের সৃষ্টি হয়। তখন তিনি রামপ্রসাদী ছন্দে (প্রধানত চল্‌তি ভাষায়) নানা রূপ-রূপান্তর ঘটাইয়া হিন্দোল বা হিল্লোল সৃষ্টি করিলেন।

এই ধারায় সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দোহিল্লোল-সৃষ্টিতে অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ মার্জিত ভাষায় অন্যান্য ছন্দেও ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন—

রাত্রি প্রভাতিল উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম পুণ্যসমীরণ নবজীবন-রস ঢালে।

অথবা—

দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিল তব ভেরী।
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।

দীর্ঘ ও হ্রস্ব স্বরের যথাযোগ্য উচ্চারণের ফলে এই ছন্দোহিল্লোল।—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে,
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

এখানে ছন্দোহিল্লোল প্রধানত ঐ-কার ঔ-কারের সাহায্যে কল্পিত, অথবা—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ একি, সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে—

এখানে যুক্তাক্ষরের সাহায্যে ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলালও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের যথাযথ উচ্চারণের সাহায্যে মার্জিত ভাষায় ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি

করিয়াছেন। যেমন—

পতিতোদ্ধারিণি গঙ্গে।
শ্যামবিটপিঘনতটবিপ্লাবিনি ধূসর তরঙ্গ-ভঙ্গে ॥

রবীন্দ্র-শিষ্যগণ অল্পবিস্তর সকলেই ছন্দোহিল্লোল সৃষ্টি করিয়াছেন—গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণে।

সত্যেন্দ্রনাথের রচনা হইতে অজস্র উদাহরণ উৎকলন করা যাইতে পারে। তাঁহার ঝর্ণা, চরকার গান, দূরের পাল্লা, পাল্কির গান ইত্যাদি ছন্দোহিল্লোলের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

কবিবর বিজয়চন্দ্র মজুমদার একজন ছন্দোহিল্লোলের কবি—তাঁহার 'হিমাদ্রি'র দুই চরণ—

জলে—শৈলে সূর্যকিরণবিম্ব দলিতছিন্ন কুজ্ঝটি।
যেন—তুষারে ধবলগিরির শৃঙ্গ ধেয়ানমগ্ন ধূর্জটি।

কাজী নজরুলের শাত্-ইল্-আরব কবিতা হইতে কয়েক পংক্তি উৎকলন করি—

কূত্-আমারার রক্তে ভরিয়া
দজ্লা এনেছে লোহুর দরিয়া
উগারি সে খুন তোমাতে দজ্লা নাচে ভৈরব 'মস্তানীর'
ত্রস্তা-নীর।
গর্জে রক্ত-গঙ্গা ফোরাত,—'শান্তি দিয়েছি গোস্তাখীর।'
... ...
ললাটে তোমার ভাস্বর টিকা
বস্‌রাগুলের বহ্নিতে লিখা
এ যে বসোরার খুন-খারাবী গো রক্ত-গোলাপ মঞ্জরীর!
খঞ্জরীর
খঞ্জরে ঝরে খর্জুর সম হেথা লাখো দেশ-ভক্ত শির!
শাতিল্-আরব! শাতিল্-আরব!! পূত যুগে যুগে তোমার তীর।

বর্তমান যুগের কবিতায় ছন্দোহিল্লোলের স্থান নাই। ইহাতে বাংলা কাব্য-সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্তই হইতেছে।

কবিতার আনুক্রমিক পারম্পর্য

কবিতা-রচনার টেক্‌নিক লইয়া আলোচনা করিতে গেলে কবিতায় ভাব-ধারার অনুক্রমের কথা আগে বলিতে হয়। প্রথমত তিনটি Normative Science-এর (Logic, Aesthetics ও Rhetoric) অনুবর্তী তিনটি অনুক্রমের কথা বলিতে হয়। কতকগুলি কবিতা যুক্তি-শৃঙ্খলা-মূলক অনুক্রমে (Logical Sequence), কতকগুলি আবেগাত্মক অনুক্রমে (Emotional Sequence) এবং কতকগুলি আলঙ্কারিক অনুক্রমে (Rhetorical Sequence) রচিত। একাধিক অনুক্রম অনেক কবিতায় অনুস্যুত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা অবলম্বনেই দৃষ্টান্ত দেখানো যাইতে পারে।

কবির 'চৈতালি'র বৈরাগ্য, স্নেহগ্রাস, বঙ্গমাতা, মানসী ইত্যাদি কবিতা, 'নৈবেদ্যে'র মুক্তি, অপ্রমত্ত, ন্যায়দণ্ড ইত্যাদি সনেট, তাহা ছাড়া, যথাস্থান, মৃত্যুঞ্জয়, প্রশ্ন, স্বর্গ হইতে বিদায় ইত্যাদি কবিতা যুক্তি-শৃঙ্খলা-মূলক অনুক্রমে রচিত। একটি কবিতা ('বৈষ্ণব-কবিতা') লইয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক্। কবির প্রতিপাদ্য 'বৈষ্ণবের গান' শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য নয়, মর্তের জন্যও।

অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বৃন্দাবন-গাথা,—এই প্রণয়-স্বপন···ইত্যাদি—

কেবল দেবতার উপভোগ্য হইতে পারে না। এই সঙ্গীতরসধারা দীন মর্তবাসী নর-নারীর তপ্ত প্রেমতৃষাও মিটাইতেছে। ভক্তির পারমার্থিক উৎসবক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া 'বৈষ্ণব-কবিতা'র দুই-একটি তান শুনিয়া তরুণ বসন্তে আমাদের অন্তরও পুলকিত হয়, আমাদের কুটীরের পরিবেশের প্রকৃতি দ্বিগুণ মাধুর্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। ঐ গানে আমাদের ধরার সঙ্গিনী তাহার হৃদয়সুপ্ত ভালবাসাকে প্রকাশদানের ভাষা খুঁজিয়া পায়, অতএব কি করিয়া বলি শুধু দেবতাদের জন্যই 'বৈষ্ণব কবিতা'? বৈষ্ণব কবিরা সাধক হইলেও, প্রধানতঃ কবি। তাঁহারা সাধন-ভজন করিলেও সন্ন্যাসী ছিলেন না, তাঁহারাও আমাদের মতো সংসারীই ছিলেন। তাঁহাদের ঘরেও মানবী প্রিয়তমা ছিল। কবি তাই তাঁহাদের উদ্দেশে বলিয়াছেন—

"সত্য ক'রে কহ মোরে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমছবি,

কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে?

নিশ্চয়ই তুমি রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা তোমার প্রিয়ার চোখমুখ হইতে আহরণ করিয়াছ। তাই যদি হয়, তবে কেমন করিয়া বলি তোমার কবিতায় তোমার মানবী প্রিয়ার অধিকার নাই,—অধিকার আছে শুধু রাধিকার?

আমাদের কুটীর-প্রাঙ্গণে পুষ্প বিকশিত হয়—সে পুষ্পে মাল্য গাঁথিয়া কেহ দেয় দেবতা-চরণে—কেহ দেয় তার প্রিয়জনে।

দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা।
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

দেবতার জন্য রচিত কবিতা তাই কেবল দেবতার জন্য নয়, প্রিয়জনেরও জন্য।

এত গীতি,
এত ছন্দ, এত ভাবে উচ্ছ্বসিত প্রীতি,
এত মধুরতা দ্বারের সম্মুখ দিয়া—

বৈকুণ্ঠের পথে চলিয়া যায়—পৃথিবীর তরুণ-তরুণীরা কি করিয়া লোভ সংবরণ করে? তাহারা তাই পথে লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের প্রিয়জনগণের জন্য আহরণ করিতেছে।" কবি বলিতেছেন—হে বৈষ্ণব কবি, কি করিয়া তুমি ইহা ঠেকাইবে?

অতএব তুমি যদি শুধু বৈকুণ্ঠের জন্য এই সম্পদ সৃষ্টি করিয়া থাক, তাহা শুধু বৈকুণ্ঠের ভোগে লাগিতেছে না, মানব-সংসারের ভোগেও লাগিয়া যাইতেছে।

যুক্তি-শৃঙ্খলার নগ্নতা মগ্ন হইয়া গিয়াছে—কবির অপূর্ব রচনা-কৌশলে। এ-কথা সত্য বটে, কিন্তু কবিতাটিতে যুক্তিধারাই অনুস্যূত হইয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতাই আবেগাত্মক অনুক্রমে রচিত। এইসকল কবিতাই সর্বোৎকৃষ্ট শ্রেণীর। কবিমনের একটি গভীর আবেগ আপনার স্বাভাবিক গতিবেগে সেই কবিতাগুলিতে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। অনেক স্থলে ঐ আবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। 'যেতে নাহি দিব'—এই শ্রেণীর কবিতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অন্যান্য উদাহরণ—বসুন্ধরা, কাঙালিনী, এবার ফিরাও মোরে, সত্যেন্দ্রনাথের প্রতি, 'পলাতকা'র কয়েকটি কবিতা, শা-জাহান, দেবতার গ্রাস, মাটির ডাক, লীলাসঙ্গিনী, ভৈরবী গান,

শিবাজী-উৎসব, নমস্কার, প্রেমের অভিষেক ইত্যাদি।

এই শ্রেণীর একটি উৎকৃষ্ট কবিতা 'বধূ'। ইহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কবি বধূহৃদয়ে সঞ্চারিত একটি আবেগকে এমন বাণীরূপ দিয়াছেন যে তাঁহার পল্লী-প্রকৃতির প্রতি অনুরাগের আবেগও বধূর মনের আবেগের সঙ্গে মিলিত হইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মাতৃঅঙ্কে লালিতা স্বচ্ছন্দচারিণী পল্লী-দুলালী কলিকাতা নগরীর ধনীর গৃহে আসিয়াছে বধূরূপে। বেলা পড়িয়া আসিবামাত্র তাহার মনে পড়িয়া গেল—এই ঝিকিমিকি বেলায় তাহার সখী প্রতিদিন ডাক দিয়া বলিত—'বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল'। বধূর মনে পড়িয়া গেল—পল্লী-প্রকৃতির শুচিসুন্দর উদার মধুর পরিবেশটি। তাহার সহিত রাজধানীর কারাগারের তুলনা করিয়া বধূ বলিতেছে—

হায় রে রাজধানী পাষাণ-কায়া!
বিরাট মুঠিতলে চাপিছে দৃঢ় বলে,
ব্যাকুল বালিকারে, নাহিকো মায়া!

* * *

হেথায় বৃথা কাঁদা, দেয়ালে পেয়ে বাধা
কাঁদন ফিরে আসে আপন-কাছে।

নগরের পরিবেশের মত মানুষগুলোও হৃদয়হীন—

সবার মাঝে আমি ফিরি একেলা।
কেমন ক'রে কাটে সারাটা বেলা!
ইটের 'পরে ইট মাঝে মানুষ-কীট—
নাইকো ভালোবাসা, নাইকো খেলা।

কবিগুরু বিহারীলালের নাগরিক জীবনের প্রতি বিদ্বেষকেই কবি যেন বধূর মুখ দিয়া সরসতম রূপ দান করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, কবির নিজেরও নাগরিক জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব ইহাতে ধ্বনিত হইয়াছে।

বধূহৃদয়ের আবেগের উচ্ছ্বাস করুণতম রূপ ধরিয়াছে নিম্নলিখিত দুইটি স্তবকে—

কোথায় আছ তুমি কোথায় মা গো,
কেমনে ভুলে তুই আছিস হাঁগো!
উঠিলে নব শশী, ছাদের 'পরে বসি
আর কি উপকথা বলিবি না গো!

হৃদয়বেদনায় শূন্য বিছানায়
বুঝি মা, আঁখিজলে রজনী জাগ,
কুসুম তুলি লয়ে প্রভাতে শিবালয়ে
প্রবাসী তনয়ার কুশল মাগ।

দেবে না ভালোবাসা, দেবে না আলো।
সদাই মনে হয়, আঁধার ছায়াময়
দিঘির সেই জল শীতল কালো,
তাহারি কোলে গিয়ে মরণ ভালো।
ডাক্ লো ডাক্ তোরা, বল্ লো বল্—
"বেলা যে পড়ে এল, জলকে চল্।"
কবে পড়িবে বেলা, ফুরাবে সব খেলা,
নিবাবে সব জ্বালা শীতল জল,
জানিস যদি কেহ আমায় বল্।

কবিগুরুর আবেগাত্মক কবিতার কোন-কোনটিতে হৃদয়াবেগ এইরূপ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংযত। 'স্মরণ'-পর্যায়ের কবিতাগুলিতে ইহার আতিশয্য অস্বাভাবিক হইত না, কিন্তু সেগুলি আশ্চর্যরূপ সংযত। হৃদয়াবেগ-মূলক অনুক্রমে স্বভাবতই অলঙ্কৃতির প্রাধান্য কমিয়া আসিয়াছে।

কবিগুরুর আলঙ্কারিক অনুক্রমের কবিতার সংখ্যা কম নয়। Symbolical কবিতাগুলির কথা এখানে বলিতেছি না—Symbol ও Metaphor এক নয়। Symbolical কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থের সঙ্গে রচনার প্রত্যেক অঙ্গকে মিলানো যায় না, allegory, metaphor-এ মিলানো চলে। allegoryতে পদার্থের সঙ্গে তাহার প্রতিবিম্বের যে মিল প্রধানতঃ সেই মিলই থাকে। Symbolical কবিতার অনুক্রম আলঙ্কারিক না-ও হইতে পারে। আলঙ্কারিক অনুক্রমের রচনা সাধারণতঃ সাঙ্গরূপকের রূপ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটির অনেকাংশ এই অনুক্রমের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' কবিতাটিকে অবলম্বন করিয়া রচনার আলঙ্কারিক অনুক্রমটি দেখানো যাইতে পারে—

'ধরণীর ধ্যানভরা ধন বসন্ত' বৎসরের শেষে একবার নববরবেশে আবির্ভূত হন।—

"তারি লাগি তপস্বিনী কী তপস্যা করে অনুক্ষণ,
আপনারে তপ্ত করে, ধৌত করে, ছাড়ে আভরণ,
ত্যাগের সর্বস্ব দিয়ে ফল-অর্ঘ্য করে আহরণ,
তোমার উদ্দেশে।
সূর্য প্রদক্ষিণ করি ফিরে সে পূজার নৃত্যতালে
ভক্ত উপাসিকা।
নম্র ভালে আঁকে তার প্রতিদিন উদয়াস্তকালে
রক্তরশ্মিটিকা।
সমুদ্রতরঙ্গে সদা মন্দ্রস্বরে মন্ত্রপাঠ করে,
উচ্চারে নামের শ্লোক অরণ্যের উচ্ছ্বাসে মর্মরে,
বিচ্ছেদের মরুশূন্যে স্বপ্নচ্ছবি দিকে দিগন্তরে
রচে মরীচিকা।
আবর্তিয়া ঋতুমাল্য করে জপ, করে আরাধন
দিন গুনে গুনে,
সার্থক হলো যে তার বিরহের বিচিত্র সাধন
মধুর ফাল্গুনে।

তারপর বসন্তের আবির্ভাব—

হেরিনু উত্তরী তব, হে তরুণ, অরুণ আকাশে,
শুনিনু চরণধ্বনি দক্ষিণের বাতাসে বাতাসে,
মিলনমাঙ্গল্য-হোম প্রজ্বলিত পলাশে পলাশে,
রক্তিম আগুনে।

তারপর বসুন্ধরার রূপান্তর—

তাই আজি ধরিত্রীর যত কর্ম, যত প্রয়োজন
হল অবসান।
বৃক্ষশাখা রিক্ত-ভার, ফলে তার নিরাসক্ত মন,
ক্ষেতে নেই ধান।
বকুলে বকুলে শুধু মধুকর উঠিছে গুঞ্জরি
অকারণ আন্দোলনে চঞ্চলিছে অশোকমঞ্জরী,
কিশলয়ে কিশলয়ে নৃত্য উঠে দিবসশর্বরী
বনে জাগে গান।

বসন্তের বিদায়, নিদাঘের আবির্ভাব—

হে বসন্ত, হে সুন্দর, হায় হায়, তোমার করুণা
ক্ষণকাল তরে।
মিলাইবে এ উৎসব, এই হাসি, এই দেখাশুনা
শূন্য নীলাম্বরে।
নিকুঞ্জের বর্ণচ্ছটা একদিন বিচ্ছেদবেলায়
ভেসে যাবে বৎসরান্তে রক্তসন্ধ্যাস্বপ্নের ভেলায়,
বনের মঞ্জীরখানি অবসন্ন হবে নিরালায়
শ্রান্তিক্লান্তিভরে।

আলঙ্কারিক ক্রমের আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত কবির 'বৈশাখ'। বৈশাখপ্রকৃতির রুদ্রতা, শুষ্কতা, উগ্রতা—সমস্তই বৈশাখের তাপস রূপের মধ্য দিয়া কবি ব্যক্ত করিয়াছেন।

আর একটি আলঙ্কারিক অনুক্রমের চমৎকার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা'। এই কবিতায় কবি নিজেই ভারতীয় সংস্কৃতির ভাবমূর্তি। বৃহত্তর ভারতের দ্বৈপ উপনিবেশগুলিতে ভারত যুগে যুগে তাহার কী মর্মবাণী (message) পাঠাইয়াছে তাহারই কথা।

সংস্কৃত কাব্যে দেখা যায় এই অনুক্রমের প্রাধান্য। সংস্কৃত কবি যখন শ্লোকের পর শ্লোক রচনা করিয়া গিয়াছেন, তখন একটি দিকে খর দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন। তাহা এই, প্রত্যেক শ্লোকটিকে অলঙ্কৃত ভঙ্গীতে সরস করিয়া প্রকাশ করা চাই, তাহাতে যদি অনেক কথা বাদ পড়িয়া যায়, যাক। যাহাকে সরস ও অলঙ্কৃত করিয়া বলা না যাইতেছে—তাহা বলারই প্রয়োজন নাই। মনোবেগের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতে গিয়া যদি অলঙ্কৃতির ব্যাঘাত হয় তবে সে ধারাকে অনুসরণ করারও প্রয়োজন নাই। কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ভাব সম্বন্ধে যে কথাগুলিকে অলঙ্কৃতরূপে শ্লোকবদ্ধ করা যায়, সেই কথাগুলিই শুধু বলা হইত।

একটি শ্লোকের পর পরবর্তী শ্লোকটির কেন আবির্ভাব হইল তাহার কোন যুক্তিও নাই। সেই জন্য অনেক সংস্কৃত কাব্যে—বিশেষতঃ বর্ণনামূলক কাব্যে, আমরা একটি শ্লোকের পর যে ভাবের শ্লোকের প্রত্যাশা করি—তাহা পাই না। যাহা পাই তাহাতে মনোমত শৃঙ্খলা পাই না—পাই বক্রোক্তিসঞ্জাত বিস্ময়। বলা বাহুল্য, একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র অবশ্য তলে তলে আছেই। কিন্তু তাহাকে পরম্পরা বলা যায় না—ঐ সূত্রে শ্লোকগুলি 'সূত্রে মণিগণা ইব' ঝলমল করিয়া আমাদের

আনন্দ দান করে। প্রত্যেক শ্লোকে আবেগ, ভাব ও যুক্তি আছে, কিন্তু পরম্পরাটি ঠিক তাহাদের দ্বারা পরিচালিত নয়। এই শ্রেণীর কাব্যও সৎকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কালিদাসের অজবিলাপ, রতিবিলাপ, হিমাদ্রিবর্ণনা, সমুদ্রবর্ণনা ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। বর্তমান যুগে সত্যেন্দ্রনাথ অনেক সময় ঐ ভঙ্গীরই অনুসরণ করিয়াছেন।

আজকাল 'স্বপ্নরূপাত্মক-ক্রম' নামে একটি ক্রম কাহারও কাহারও কাব্যে দেখা যাইতেছে। কবি মধুবিহ্বল প্রজাপতির মত স্বপ্নধারার ক্রম অনুসরণ করিয়া যেন সৃষ্টির এক একটি অঙ্গকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছেন। মনের আবেগের গাঢ়তা বা চিন্তাশৃঙ্খলা এইগুলিতে নাই। অলঙ্কৃতি থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। স্বপ্নে যেমন কোন অনুভূতির পরম্পরা থাকে না—প্রতিফলিত স্বপ্নের সকল অংশ মিলাইয়া যেমন একটি প্রতিবিম্বন পাওয়া যায়, ইহা তেমনি। এই প্রতিবিম্বন নদী-জলের হিল্লোলে ভাঙাচোরা প্রতিবিম্বের মত। এই অনুক্রমে রচিত কবিতাকে কেহ কেহ উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া থাকেন।

কবিতার আর একটি অনুক্রম স্মৃতিচিত্রের অনুক্রম। ভাবাবিষ্ট দৃষ্টিতে কবি যে চিত্র একদিন দেখিয়াছেন, ইহা তাহারই বাণীময় প্রতিরূপ। কতই না খণ্ড খণ্ড দৃশ্য কবির স্মৃতিপুটে অনুরঞ্জিত ও সুগ্রথিত হইয়া অপূর্বতা লাভ করিয়াছে! সাধারণতঃ এইগুলি বৃহত্তর কবিতার অংশ কিংবা কোন-না-কোন ভাবব্যঞ্জনার পটভূমিকা। 'শিলঙের চিঠি' কেবল স্মৃতিচিত্র মাত্র, ইহার সঙ্গে অন্য ভাবকল্পনার সম্বন্ধ নাই। কবির 'গঙ্গার শোভা' চিত্রটি গদ্যে রচিত হইলেও অপূর্ব স্মৃতি-চিত্রাত্মক কবিতা।

স্মৃতিচিত্রের দুইটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল—

> আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
> হাসিছে বন্ধুর মতো ; সুন্দর বাতাস
> মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর ;—
> অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্‌বধূর
> উড়িয়া পড়িছে গায়ে ; ভেসে যায় তরী
> প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
> তরল কল্লোলে ; অর্ধমগ্ন বালুচর
> দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর

রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে ; ভাঙা উচ্চতীর ;
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটির ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হ'তে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো ; গ্রামবধূগণ
অঞ্চল ভাসায়ে জলে আকণ্ঠ-মগন
করিছে কৌতুকালাপ ; উচ্চ মিষ্ট হাসি
জলকলস্বরে মিশি পশিতেছে আসি
কর্ণে মোর ; বসি এক বাঁধা নৌকা 'পরি
বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া ; উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারংবার
কলহাস্যে ; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তাঁর স্নেহ-জ্বালাতন।

এই চিত্রের পর কবিতায় একটা মন্তব্য আছে,—তাহার সার কথা—

এই শুদ্ধ নীলাম্বর স্থির শান্ত জল,
মনে হ'ল সুখ অতি সহজ সরল।

এ মন্তব্যটা গৌণ, চিত্রটাই মুখ্য। অতএব এই কবিতাটির রসমাধুর্য ঐ উপরি-লিখিত চিত্রেই নিবদ্ধ।

'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতার শেষ কথা—

আমি মিলে গেছি যেন সকলের মাঝে ;
ফিরিয়া এসেছি যেন আদি জন্মস্থলে।
... ...

কোথায়? যেখানে "মাতৃস্তনে শিশুর মতন—আদিম আনন্দরস করিয়া শোষণ" —আঁকড়িয়া ছিলাম সেখানে।

এই কথাটি বলিবার জন্যই কি কবি ২৬।২৭ চরণের একটি মধ্যাহ্নের স্মৃতিচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন? ইহা কবিতার চিত্রাত্মক পরম্পরার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

'বাঁশি' কবিতায় 'কিনু গয়লার গলি'র চিত্র কেবল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এবং 'সানাই' কবিতার স্মৃতিচিত্র সানাইএর তানের সঙ্গে চিত্রের ছন্দভাঙ্গা অসংগতি দেখানোর জন্য অঙ্কিত। 'খোয়াই' একটি চমৎকার স্মৃতিচিত্র।

'পুনশ্চে'র পুকুর-ধারের স্মৃতিচিত্রটি দোতলার জানালা হইতে দেখা। এই চিত্রটি আধুনিকতার বেড়ার ফাঁক দিয়া দূর কালের আর একটি নারীর যে ছবি আনিয়া দিয়াছে, সে ছবি বড় মর্ম্মস্পর্শী—

স্পর্শ তার করুণ, স্নিগ্ধ তার কণ্ঠ,
মুগ্ধ সরল তার কালো চোখের দৃষ্টি,
তার সাদা শাড়ির রাঙা চওড়া পাড়
দুটি পা ঘিরে ঢেকে পড়েছে ;
... ...
সে আম-কাঁটালের ছায়ায় ছায়ায় জল তুলে আনে,
তখন দোয়েল ডাকে সজনের ডালে,
ফিঙে লেজ দুলিয়ে বেড়ায় খেজুরের ঝোপে।

'আতপ্ত মেঘের রৌদ্রে জীবনযাত্রার প্রান্তে' যে-সব ছবি অনতিগোচর ছিল, অকারণে কবির মনে জাগিয়া উঠিয়াছে 'আরোগ্যে'র—'ঘণ্টা বাজে দূরে' নামক কবিতায়। একটি ছবির কিয়দংশ—বাংলার নদীর খেয়াঘাটের কাছে বন্দর-আড়তের ছবি—যে ছবিতে—

ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি ;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালু তটে বাঁধা পাশাপাশি ;
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে ;
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের ক্ষেতে··· ইত্যাদি।

আর একটি পশ্চিম অঞ্চলের গঙ্গাতীরের শহরপ্রান্তের ছবি—যে ছবিতে—

হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার ক্ষেতে ;
তরমুজের লতা হ'তে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণবালক।
* * *
ইঁদারায় টানা জল
নালা বেয়ে সারাদিন কুলুকুলু চলে
ভুট্টার ফসলে দিতে প্রাণ।

ভজিয়া জাঁতায় ভাঙে গম
পিতল-কাঁকন-পরা হাতে।
মধ্যাহ্ন আবিষ্ট করে একটানা সুর ॥

আর একটি দৃষ্টান্ত দিই—ইহাকে স্মৃতিচিত্রও বলা যায়, স্বপ্নচিত্রও বলা যায়। এই চিত্র হৃদয়ের গভীর রঙ দিয়া চিত্রিত। ইহাতে আছে যৌবনের স্মৃতি-মাধুরীর আস্বাদ।

মনে ছবি আসে—ঝিকিমিকি বেলা হলো,
বাগানের ঘাটে গা ধুয়েছ তাড়াতাড়ি;
কচি মুখখানি, বয়স তখন ষোলো;
তনু দেহখানি ঘেরিয়াছে ডুরে শাড়ি।
কুঙ্কুমফোঁটা ভুরুসঙ্গমে কিবা,
শ্বেতকরবীর গুচ্ছ কর্ণমূলে;
পিছন হইতে দেখিনু কোমল গ্রীবা
লোভন হয়েছে রেশম চিকন চুলে।
তাম্রথালায় গোড়ে মালাখানি গেঁথে
সিক্ত রুমালে যত্নে রেখেছ ঢাকি;
ছায়া-হেলা ছাদে মাদুর দিয়েছ পেতে—
কার কথা ভেবে বসে আছ জানি না কি?

... ...

মনে আসে, তুমি পুব জানালার ধারে
পশমের গুটি কোলে নিয়ে আছ বসে—
উৎসুক চোখে বুঝি আশা কর কারে,
আলগা আঁচল মাটিতে পড়েছে খসে;
অর্ধেক ছাদে রৌদ্র নেমেছে বেঁকে,
বাকি অর্ধেক ছায়াখানি দিয়ে ছাওয়া;
পাঁচিলের গায়ে চীনের টবের থেকে
চামেলি ফুলের গন্ধ আনিছে হাওয়া ॥

'স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' চিত্রের কথা বলিলাম, এবার 'স্বপ্ন দিয়ে গড়া' চিত্রগুলির কথা বলি। স্বপ্নচিত্রগুলি কবির প্রাচীন-সাহিত্যপাঠের ফল। কবির কল্পনা

সাহিত্যের ইঙ্গনাচালিত পথে প্রাচীন ভারতের আবেষ্টনীর মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। এই প্রাচীন ভারত কবিগণের স্বপ্নমাধুরী দিয়া রচিত। যে পাঠকের কল্পনা কবির কল্পনার সহগামিনী হইতে পারে, এই চিত্রগুলি তাহারই উপভোগ্য। পাঠকের প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় থাকা চাই।

স্বপ্নচিত্রের উৎকৃষ্ট নিদর্শন—রবীন্দ্রনাথের সেকাল, প্রেমের অভিষেক, সেকাল ও একাল, বর্ষামঙ্গল, মেঘদূত ইত্যাদি।

এখানে দুই-একটি চিত্র উৎকলিত করি—

দূরে বহুদূরে,
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীপুরে,
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রানদীপারে
মোর পূর্বজনমের প্রথম প্রিয়ারে।
মুখে তার লোধ্ররেণু। লীলাপদ্ম হাতে,
কর্ণমূলে কুন্দকলি, কুরবক মাথে,
তনু দেহে রক্তাম্বর নীবীবন্ধে বাঁধা,
চরণে নূপুরখানি বাজে আধা-আধা।
প্রিয়ার ভবন
বঙ্কিম সংকীর্ণ পথে দুর্গম নির্জন।
দ্বারে আঁকা শঙ্খচক্র, তারি দুই ধারে
দুটি শিশু নীপতরু পুত্রস্নেহে বাড়ে।
তোরণের শ্বেতস্তম্ভ-'পরে
সিংহের গম্ভীর মূর্তি বসি দম্ভভরে॥
প্রিয়ার কপোতগুলি ফিরে এলো ঘরে,
ময়ূর নিদ্রায় মগ্ন স্বর্ণদণ্ড-'পরে
হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।

'প্রেমের অভিষেক' কবিতায় কবিকল্পনার অমরাবতীতে কবি স্বপ্নচিত্র রচনা করিয়াছেন—দময়ন্তী, শকুন্তলা, মহাশ্বেতা, সুভদ্রা, পার্বতী ইত্যাদি কাব্যের নায়িকাদের লইয়া।

'ব্রাহ্মণ' কবিতায় পাই তপোবনের স্বপ্নচিত্র—

প্রভাতে—

তপোবনতরুশিরে প্রসন্ন নবীন
জাগিল প্রভাত। যত তাপসবালক—
শিশিরসুস্নিগ্ধ যেন তরুণ আলোক,
ভক্তি-অশ্রু-ধৌত যেন নব পুণ্যচ্ছটা,
প্রাতঃস্নাত স্নিগ্ধচ্ছবি আর্দ্রসিক্তজটা
শুচিশোভা সৌম্যমূর্তি সমুজ্জ্বলকায়ে
বসেছে বেষ্টন করি বৃদ্ধবটচ্ছায়ে
গুরু গৌতমেরে।

সন্ধ্যায়—

অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতীতীরে
অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য ; আসিয়াছে ফিরে
নিস্তব্ধ আশ্রমমাঝে ঋষিপুত্রগণ
মস্তকে সমিধ্‌ভার করি আহরণ
বনান্তর হতে ; ফিরায়ে এনেছে ডাকি
তপোবনগোষ্ঠগৃহে স্নিগ্ধশান্ত-আঁখি
শ্রান্ত হোমধেনুগণে ; করি সমাপন
সন্ধ্যাস্নান সবে মিলি লয়েছে আসন
গুরু গৌতমেরে ঘিরি কুটিরপ্রাঙ্গণে
হোমাগ্নি-আলোকে।

'সেকাল' কালিদাসের কালের একটি চমৎকার চিত্র। সেকালের নায়িকার রূপচিত্র কবির স্বপ্নে—

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায় বক্ষ রইত ঢাকা,
আঁচলখানির প্রান্তটিতে হংসমিথুন আঁকা।
বিরহেতে আষাঢ় মাসে   চেয়ে রইত বঁধুর আশে,
একটি ক'রে পূজার পুষ্পে দিন গণিত ব'সে।
বক্ষে তুলি বীণাখানি   গান গাহিতে ভুলত বাণী,
রুক্ষ অলক অশ্রুচোখে পড়ত খ'সে খ'সে।
...   .

প্রিয় নামটি শিখিয়ে দিত সাধের সারিকারে
নাচিয়ে দিত ময়ূরটিরে কঙ্কণঝঙ্কারে।
কপোতটিরে লয়ে বুকে সোহাগ করত মুখে মুখে,
সারসীরে খাইয়ে দিত পদ্মকোরক বহি।
অলক নেড়ে দুলিয়ে বেণী কইত কথা শৌরসেনী,
বলত সখীর গলা ধ'রে 'হলা পিয় সহি'।

'সাগরিকা' দ্বীপময় ভারতের একটি স্বপ্নচিত্র। ইহা স্বপ্নচিত্রাত্মক পরম্পরায় অত্যুৎকৃষ্ট চিত্র। আলঙ্কারিক অনুক্রম ও চিত্রাত্মক অনুক্রম এই কবিতায় ওতপ্রোত হইয়া অপূর্বতার সৃষ্টি করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের গাথা কবিতাগুলিতে স্বপ্নচিত্র অনেক সময় পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছে ; কোন কোন গাথার আদ্যন্ত স্বপ্নচিত্র ; যেমন—অভিসার, সামান্য ক্ষতি, স্পর্শমণি, মস্তকবিক্রয়, পূজারিণী।

'পূজারিণী'র স্বপ্নচিত্রের একটু নিদর্শন—

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে বধূ অমিতার ঘরে।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর সীমন্তসীমা-'পরে।

* *

অস্তরবির রশ্মি-আভায় খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী
চমকি উঠিল শুনি কিঙ্কিণী—চাহিয়া দেখিল দ্বারে।

পদাবলী সাহিত্যের প্রদর্শিত পথে কবির কল্পনা বৃন্দাবনের স্বপ্নলোকে বিহার করিয়া কতকগুলি স্বপ্নচিত্র আঁকিয়াছে। বর্ষার দিনে কবির—

পড়ে মনে বরিষার বৃন্দাবন-অভিসার
একাকিনী রাধিকার চকিত চরণ।
শ্যামল তমালতল নীল যমুনার জল
আর দুটি ছলছল নলিননয়ন।
এ ভরা বাদর দিনে কে বাঁচিবে শ্যাম বিনে
কাননের পথ চিনে মন যেতে চায়।

বিজন যমুনাকূলে বিকশিত নীপমূলে
কাঁদিয়া পরাণ বুলে বিরহব্যথায়।

'বর্ষা-যাপন' কবিতায় জ্ঞানদাসের অনুসরণে কবি শ্রীরাধার স্বপ্ন-তদ্‌গত রূপচিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন···
মন-সুখে নিদ্রায় মগন,—
সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে
রাধিকার নির্জন স্বপন।
মৃদু মৃদু বহে শ্বাস, অধরে লাগিছে হাস
কেঁপে উঠে মুদিত পলক,—
বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে শুয়ে,
গৃহকোণে ম্লান দীপালোক।
গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাখে
দাদুরী ডাকিছে সারারাতি,—
হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে বটে
একা ঘরে স্বপনের সাথী।

এগুলি অন্য চিত্রের অঙ্গীভূত। বৃন্দাবনী কবিতাগুলির মধ্যে 'জন্মান্তর' কবিতাটি আগাগোড়া স্বপ্নচিত্র—কবি কোনও জন্মে ব্রজের রাখাল হইতে পাইলে কী জীবনযাপন ও কী আনন্দ উপভোগ করিবেন, তাহারই ভাবিক অলঙ্কারে রচিত একটি চিত্র এই কবিতাটি। ইহার দুইটি স্তবক এই—

ওরে, শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে,
ওরে, এপার-ওপার আঁধার হলো কালিন্দীরই কূলে।
ঘাটে গোপাঙ্গনা ডরে
কাঁপে খেয়াতরীর 'পরে
হেরো, কুঞ্জবনে নাচে ময়ূর কলাপখানি তুলে।
ওরে, শাঙন-মেঘের ছায়া পড়ে কালো তমাল-মূলে॥

মোরা নবনবীন ফাল্গুন-রাতে নীল নদীর তীরে
কোথা যাব চলি অশোকবনে শিখিপুচ্ছ শিরে।

যবে দোলার ফুল-রশি
দিবে নীপশাখায় কষি,
যবে দখিন বায়ে বাঁশীর ধ্বনি উঠবে আকাশ ঘিরে,
মোরা রাখাল মিলে করব মেলা নীল নদীর তীরে।

আমি যে চিত্রাত্মক অনুক্রমের কথা বলিলাম, আদৌ তাহা অনুক্রম কিনা তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে। অনুক্রম বলিতে Sequence বা Succession-কে বুঝায়। সঙ্গীত—Time-এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, তারই অনুক্রম আছে। চিত্র—Space-কে আশ্রয় করে—তাহার অনুক্রম থাকার কথা নয়। চিত্রের দর্শকের পক্ষে তাহাই অর্থাৎ juxta-position-ই বটে, কিন্তু শিল্পীর পক্ষে তাহা নয়। চিত্রশিল্পীর রচনায় চিত্রের একটি অঙ্গ আর একটি অঙ্গকে আকর্ষণ করিয়া আনে—Law of Association-এর ধারায়। চিত্র ফোটোগ্রাফ নয় যে একসঙ্গে রূপলাভ করিবে। চিত্রশিল্পীকে চিত্র-রচনায় একটি অনুক্রমের অনুসরণ করিতেই হয়। বাণীচিত্রে কবিকে একটির পর একটি অংশকে কল্পনা করিতে হয়—একটি অংশ অন্য অংশকে রসের আকর্ষণে টানিয়া আনে এবং তাহাদের মধ্যেও গ্রহণ-বর্জন করিতে হয়। অতএব চিত্রেরও অনুক্রম আছে।

সাহিত্যের ব্যাবহারিক মূল্য

আমাদের দেশের প্রাচীন সাহিত্যে কোন দিনই ব্যাবহারিক মূল্য ছিল না। কবিদের কাব্যসৃষ্টির মূলে শ্রেয়োবোধ কোন দিনই প্রবল ছিল না। আমি এই শ্রেয়োবোধ অর্থে ঐহিক বা দৈহিক শ্রেয়ের কথাই বলিতেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে দেশে সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু নাট্যসাহিত্য রচিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহা প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য হইয়া উঠে নাই। সেকালে শ্রেয়োধর্ম প্রবন্ধেরই বিষয়ীভূত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র সর্বপ্রথমে শ্রেয়োধর্মের দ্বারা আবিষ্ট হন। তাঁহার রচিত কথাসাহিত্যে বর্তমান যুগের ব্যাখ্যাত শ্রেয়োধর্মের বিশেষ স্থান হয় নাই, তাহার জন্য তিনি লিখিয়াছিলেন প্রবন্ধ। তবে তাঁহার কথাসাহিত্যও একেবারে শ্রেয়োধর্মবর্জিত নয়। এই শ্রেয়ঃ নৈতিক, ধর্মগত ও সমাজকল্যাণগত। বর্তমান যুগে এই শ্রেয়কে প্রকৃত শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করা হয় না। কারণ, ধর্মগত

শ্রেয়ঃ বর্তমান যুগের একশ্রেণীর সমালোচকের মতে কুসংস্কার, নৈতিক শ্রেয়কে ইঁহারা বর্তমান যুগের আদর্শের অনুপযোগী মনে করেন এবং বঙ্কিম-সাহিত্যে সমাজকল্যাণ পদার্থটা বর্ণহিন্দুসমাজকে আশ্রয় করিয়াছিল বলিয়া উদারতন্ত্রী সমালোচকরা তাহাকেও যথার্থ শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন না—বরং তাহার বিপরীত বলিয়াই মনে করেন। প্রবন্ধে তিনি যে কৃষক, রায়ত ইত্যাদির কথা লিখিয়াছেন, সাম্যবাদের উপর গ্রন্থ লিখিয়াছেন—তাহা ত সাহিত্য নয়। অতএব বঙ্কিমেরও শ্রেয়োবোধমূলক সাহিত্য নাই বলিয়া ইঁহাদের ধারণা। রবীন্দ্রনাথ তো রসলক্ষ্মীর মালঞ্চের মালাকর। তাঁহার কবি-ধর্মই তথাকথিত শ্রেয়োধর্মের প্রতি উদাসী। রবীন্দ্রনাথ হইলেন বর্তমান যুগের Escapistদের গুরু। তিনিও প্রবন্ধে শ্রেয়োধর্মের গুণগান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা শ্রেয়োবোধমূলক সাহিত্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ নিজে তথাকথিত ব্যাবহারিক শ্রেয়োধর্ম হইতে বিচ্যুত হইতেছেন বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন 'এবার ফিরাও মোরে' নামক কবিতায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শ্রেয়োধর্মকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনার বস্তু মনে করিয়া তাহাকেই বরণ করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন।

তাঁহার প্রধান শিষ্য শরৎচন্দ্রের স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি দরদের অন্ত ছিল না; ফলে, তাঁহার ছিল শ্রেয়োবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁহার কয়েকখানি পুস্তক রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী। আর কয়েকখানি পুস্তকে তিনি সাহিত্যসেবার সঙ্গে শ্রেয়োবোধের সম্মেলন ঘটাইতে পারিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই পুস্তকগুলিই বর্তমান শ্রেয়োধর্মবাদীদের মতে বাংলার প্রকৃত শ্রৈয়স সাহিত্য। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স হইতে আমরা পাইয়াছিলাম সাহিত্যের মন্ত্র 'art for art's sake', আমরা এত কাল এই মন্ত্রই জপিতেছিলাম। সহসা রুশিয়া হইতে আসিল অন্য মন্ত্র। সাহিত্য ভাববিলাসের বস্তু নয়,—চিত্তবিনোদনের বস্তু নয়, ইহার লক্ষ্য মহত্তর, বৃহত্তর ও ব্যাপকতর ইত্যাদি।

শ্রেয়োবাদীরা বলেন—পরিদৃশ্যমান জগতে নিম্নস্তরের ও মধ্যস্তরের মানুষগুলো যে শোচনীয় জীবন যাপন করিতেছে—তাহাদের প্রতি যে অবিচার, অত্যাচার হইতেছে, তাহাদের অভাব অভিযোগ সমস্ত উপলব্ধি করিয়া সমাজসচেতন হইতে হইবে এবং তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবি স্বীকার করিয়া, তাহাদের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য অর্থাৎ তাহাদের দিকে সকলের অবধান আকর্ষণের জন্যই সাহিত্যিককে লেখনী ধারণ করিতে হইবে। তাহার ফলে যে সাহিত্য জন্মিবে তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। ডস্টয়ভস্কি, চেখভ, গোর্কি ইত্যাদি সাহিত্যরথিগণ এই সাহিত্যের

গুরু। সাহিত্যিকের এই নব ব্রতই শ্রেয়োধর্ম পালন। শ্রেয়োবাদীরা বলেন সাহিত্য যদি কেবল চিত্তবিনোদন করে, তবে তাহা সিনেমা, ক্রীড়াকৌতুক ইত্যাদির চেয়ে বড় কিছু নয়। যদি তাহা ভাববিলাস হয়,—তবে সে-সাহিত্যের স্রষ্টাকে বলিতে হইবে—সংসারসংগ্রাম হইতে পলাতক, ভীরু, অতএব মনুষ্যত্ববর্জিত। যে জগতে লেখক বাস করিতেছে—তাহার অপূর্ণতা, গ্লানি, অন্যায়, অসত্য, পাপ-তাপ কিছুই যদি তাহার হৃদয়কে স্পর্শ না করে, তবে সে কিসের সাহিত্যিক? তাহার জীবন Cloister জীবনের মত। জনগুরু বা গণবরেণ্য হইবার অধিকার তাহার নাই। লক্ষ লক্ষ লোক যে সমাজে অন্নাভাবে ও অবিচারে আর্তনাদ করিতেছে—সে জগতে থাকিয়া সাহিত্যিক যদি কল্পিতা রমণীর শৌখিন বিরহের বেদনায় অশ্রুচ্ছন্দ রচনা করে তবে তাহাকেই সাহিত্য বলিয়া কি করিয়া আদর করা যায়? সেরূপ সাহিত্যিক শ্রদ্ধার পাত্র নয়, দয়ার পাত্র। দায়িত্ববোধ ছাড়া সাহিত্য হয় না, দায়িত্বহীন রচনা সাহিত্য নয়। তাহার স্থায়িত্বই বা কি?

যে যুগে কয়লার ক্বাথ হইতেও বহু মূল্যবান্ সামগ্রী প্রস্তুত হয়, একটা অন্ধ বধিরকেও শিক্ষা দিয়া কাজে লাগানো হইতেছে—পথের আবর্জনারাশিও কোন-না-কোন কাজে লাগানো যায়, সে যুগে সাহিত্য যদি কোন কাজে না লাগে তবে তাহার মূল্য কি? গোরুমহিষের হাড়ও তাহার চেয়ে মূল্যবান্। সাহিত্য কি না করিতে পারে? জগতে শ্রেয়স সাহিত্য একাধিকবার যুগান্তকারী বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে, সাহিত্য রাষ্ট্র ও সমাজকে ভাঙ্গিয়া গড়িয়াছে ও গড়িতেছে। যে সাহিত্য বিশ্বের এত বড় কল্যাণ করিতে পারে তাহা কেবল ভাববিলাস হইয়া থাকিবে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। তিরস্কৃত হইয়া আমরা তথাকথিত Escapist-এর দল এ সমস্ত কথা স্বীকার করি এবং লজ্জাও পাই। যে শ্রেয়োধর্মের কথা বর্তমান যুগের তরুণ চিন্তাশীল সাহিত্যসেবকগণ বলিতেছেন—সে শ্রেয়োধর্ম যে সাহিত্যকে মহত্তর ব্রতে প্রবর্তিত করিতে পারে এবং পারিতেছে তাহা স্বীকার করি। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য তাহাতে সাহিত্যের নিজস্ব মহিমা থাকিতেছে কি না? নিজস্ব আভিজাত্য বলিব না,—কারণ সর্বপ্রকারের আভিজাত্যই এযুগে অপরাধ।

তবে আমাদের পক্ষেও দু-একটি কথা বলিবার আছে। ইঁহারা যাহাকে ভাববিলাস ও চিত্তবিনোদনের অবলম্বন মাত্র বলিতেছেন—রসোত্তীর্ণ হইলে তাহাও শ্রেয়োধর্ম-বিচ্যুত নয়। যাহারা দেহাত্মবাদী তাহারা আত্মাকে অস্বীকার করিতে পারে,—মনকে অস্বীকার করিতে পারে না। মন দেশেরই অঙ্গ। এই মনটাকে

বাঁচাইতে হইলে, তাহাকে তাজা রাখিতে হইলে তাহারও খোরাক চাই। দেহের খোরাক ও মনের খোরাক এক নয়। বিশ্বমৈত্রী বা সাম্যধর্ম মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করিলেও তাহার প্রেমের ক্ষুধা, স্নেহের ক্ষুধা, স্বস্তি-শান্তির ক্ষুধা, তারুণ্যের ক্ষুধা সমানই বিরাজ করিতেছে। মানবজগৎ যে অভাব, দৈন্য, অপূর্ণতা, দুঃখ-পাপ-তাপের দ্বারা উপদ্রুত, সাহিত্যেও যদি তাহারাই সমভাবে বিরাজ করে—তবে সাহিত্য মনের সর্বাঙ্গীন দাবি মিটাইতে পারে না। এই পাপ-তাপ-দুঃখ-জ্বালা-জ্বরা-তপ্ত ভুবন হইতে কিছুকালের জন্য মন যদি বিশ্রাম লাভের জন্য একটা আশ্রয়ই চায়—যদি সে কিছুকাল কল্পনারাজ্যে বিচরণ করিতে চায়, যদি সে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখিতেই চায়,—তবে মনকে কি Escapist বলিয়া গালাগালি দেওয়া চলে? যে সাহিত্য সে সুযোগ দেয় তাহাকে নিছক ভাববিলাস বা স্বপ্নবিলাস বলিয়া অর্ধচন্দ্র দেওয়া উচিত কি? এ সাহিত্যও কাজ করে—তবে সে কাজ Biological বা pragmatic চাহিদার উপরে।

দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সেবার জন্য রাজনীতি আছে, সমাজনীতি আছে, সাংবাদিকতা আছে, বক্তৃতা আছে, প্রবন্ধ আছে, আরো কত কি আছে। সেই সঙ্গে সাহিত্যও অবতীর্ণ হইতেছে, হউক। কিন্তু তাহার একটা শাখা মনো-মধুকরের জন্য কেবল ফুলই যদি ফুটায় তাহাতে আপত্তি কি? ফুল ফুটানোরও একটা pragmatic value আছে—শুধু তা মধুকরকেই তৃপ্ত করে না—মধুকরের সাহায্যে ফলেরও জন্ম দেয়। উদারতান্ত্রিকরা এই ফলেরও প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই বলি, যে সাহিত্যের প্রকাশ্যতঃ ব্যাবহারিক মূল্য নাই—যে সাহিত্যের সহিত লৌকিক জগতের সংস্পর্শ অল্প, তাহারও মূলে একটা শ্রেয়ো-ধর্ম নিগূহিত আছে। কিন্তু এহো বাহ্য। সাহিত্যবিচারে বর্তমান যুগের শ্রেয়ো-ধর্মীদের সঙ্গে আমাদের মূলতঃ জীবনাদর্শেরই একটা প্রভেদ রহিয়াছে। সে প্রভেদ এই—আমরা আত্মা মানি, নীতিধর্ম মানি, ধর্মও মানি। দেহের চাহিদা যে মানি তাহা তো আর বলিবার প্রয়োজন নাই। সে জন্য দেহের চাহিদার সঙ্গে যে সাহিত্যের সম্পর্ক আছে, তাহা যদি নিছক মতবাদ-প্রচার বা প্রোপাগাণ্ডা না হয় তবে তাহাকেও সৎসাহিত্য বলিয়া মানি এবং তাহার উদ্দেশেও শ্রদ্ধায় অবনত হই। কিন্তু সেই সঙ্গে নৈতিক শ্রেয়ঃ, আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ ও ধর্মমূলক শ্রেয়কেও শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করি। যে সাহিত্যের ব্যাবহারিক মূল্য নাই, কিন্তু নৈতিক, আধ্যাত্মিক অথবা হৃদয়-ধর্মমূলক মূল্য আছে, যে সাহিত্য শুধু চিত্তবিনোদন করে না, চিত্তের উৎকর্ষ সাধন করে—চিত্তকে প্রসন্ন করে এবং লৌকিক শ্রেয়োবোধমূলক সাহিত্যের

রসোপলব্ধি করিবার জন্যও মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দেয়—তাহাকে সৎসাহিত্য বলিয়া মনে করি। তাই কালিদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকে আমরা একেবারে ব্যাবহারিক মূল্যহীন বলিয়া বিদায় দিতে পারি না।

যাঁহারা এই সাহিত্যগুরুদের আজও অনুসরণ করিতেছেন—তাঁহাদের অপরাধ, এই সমস্যাঘন যুগে জন্মিয়াও তাঁহারা এই যুগের সমস্যাগুলি এড়াইয়া চলিতেছেন—অতএব তাঁহাদের রচনা সাহিত্য হইতেছে না। সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির আদর্শে যতই বিপ্লববিপর্যয় ঘটুক,—সাহিত্যের একটা চিরন্তনী ধারা বাল্মীকি হইতে আজ পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে,—চিরকালই চলিবে। মানবহৃদয়ের চিরন্তনী বার্তা তাহা বহন করিবে—কোন বিশিষ্ট দেশ বা কালের মানবজীবনের বিক্ষোভ বহন করা তাহার ধর্ম নয়।

চিরন্তনী ধারা কেন বলিলাম—তাহাও বলি। এক এক যুগে এক এক দেশে জাতীয় জীবনের কতকগুলি স্বতন্ত্র সমস্যার আবির্ভাব হয়। পরবর্তী যুগে পরিস্থিতির বদল হয় ও সম্পূর্ণ নূতন নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সকল সমস্যাকে আশ্রয় করিয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাহা পরবর্তী যুগে অচল হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র, সমাজ, সংসার ও জীবনের আবেষ্টনীর বদল হইয়া গেলেই পূর্ববর্তী যুগের সমস্যাশ্রয়ী সাহিত্যের স্থান হয় জাদুঘরে। অবশ্য এই শ্রেণীর সাহিত্যেও সর্বজনীন ও সার্বভৌম আবেদন থাকিতে পারে। যে সাহিত্যে তাহা থাকে তাহা অবশ্য চিরন্তনত্ব লাভ করিতে পারে।

অতএব সর্বসমস্যানিরপেক্ষ সর্বজনীন ও সার্বভৌম আশ্রয় যে সাহিত্যের, সেই সাহিত্যের ধারাই চিরন্তনী। সমস্যা তাহাকে চিরবহমানা রাখে নাই—মানবহৃদয়ের চিরন্তনী রসতৃষাই তাহাকে সেই আদিকাল হইতে আজ পর্যন্ত প্রবাহিত রাখিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে এক দেশে এই ধারার গতি অবরুদ্ধ হইলে অন্য দেশ তাহার প্রবাহ রক্ষা করিবে—এ ধারা শুধু চিরন্তনী নয়, সার্বভৌমী।
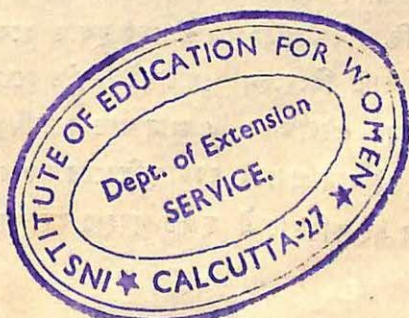
কবিতা-পাঠ

(বক্তৃতার সারাংশ)

স্কুল কলেজের লেখাপড়া শিখলেই সবাই মনে করেন যে তাঁরা যে-কোন আর্ট বুঝবারও অধিকারী, এ ধারণা তাঁদের ভ্রান্ত। উচ্চ শিক্ষা এ বিষয়ে অধিকার লাভের সহায়তা করে মাত্র।

পূর্ণ অধিকার লাভের জন্য পৃথক ট্রেনিং নিতে হয়। চিত্র-প্রদর্শনীতে কত কৃতবিদ্য লোক ছবি দেখতে যান—মনে হয় যেন তাঁরা কতই কলারস উপভোগ করছেন। তাঁদের মতমন্তব্য শুনলে কলারসজ্ঞেরা ক্ষন্তব্য মনে করেন না। ছবির ভাল মন্দ বিচার করবার জন্য পৃথক ট্রেনিং নিতে হয়। গান সম্বন্ধেও সেই কথা, কবিতা সম্বন্ধেও সেই কথা। এম-এ, ডি-ফিল, ডি-এস্-সি, পি-এইচ-ডি বা কেম্ব্রিজের ট্রাইপোজ হলেই এ সবের রসগ্রহণে অধিকার জন্মে না।

কোন কবিতা পড়ে অনেকে 'বাঃ বেশ' বলেন। তাঁদের ভাল লাগল যে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই—কিন্তু তা একটা সুপুষ্ট আপেল দেখে হাতে করে নেড়ে চেড়ে—'বাঃ বেশ' বলার মত। কেবল দৃষ্টিভোগের জন্য আপেলের সৃষ্টি হয় নি—প্রধানতঃ আস্বাদের জন্যই তার সৃষ্টি।

কবিতার কুহরে কুহরে কি রস আছে—তা বুঝবার জন্য পাঠককেও তাঁর মনের প্রসুপ্ত সৃজনী শক্তির উদ্বোধন করতে হয়—নিজের মানসকে কবিমানসের কাছাকাছি নিয়ে যেতে হয়। কবি যে কলাকৌশল, চাতুর্য ও ভাবাবেগের সাহায্যে কাব্য সৃষ্টি করেছেন—পাঠককে সে সকলের অনুসরণ করতে হয়। কাজেই এজন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। পাঠককে হতে হবে নীরব কবি। দেশে যে বহু সৎ কবিতাও আদর পায় না, তার প্রধান কারণ কবিতা বুঝবার অনুশীলন খুব কম লোকেরই আছে। স্কুলকলেজের পরীক্ষাভিমুখিনী পাঠনা থেকে রসবোধ জন্মে না।

আমি এখানে নব্য ধারার কবিতার কথা বলছি না। প্রাক্তনী ধারার কথাই বলছি, কবিতাপাঠকালে প্রথমেই বুঝতে হবে—কবিতার ছন্দটা। কবি যে ছন্দে কবিতাটি লিখেছেন—সে ছন্দটি নিখুঁত হয়েছে কিনা তা বুঝবার জন্য ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানের প্রয়োজন। এ জ্ঞান লাভ করা কিছুই শক্ত নয়। ছন্দটি নিখুঁত এটা বুঝলেই মনে প্রথমেই একটা তৃপ্তিরসের সঞ্চার হয়। নানাবিধ ছন্দ থাকতে কবি কেন এই কবিতায় ঐ ছন্দটি ব্যবহার করলেন একথাও বিবেচ্য। বিষয়বস্তুর ভাবের

যা হৃদয়াবেগের সঙ্গে ছন্দটির মণিকাঞ্চন যোগ ঘটে গেলেই তৃপ্তিরস ঘনীভূত হয়। ভাবের গুরুত্ব বা লঘুত্বের সঙ্গে ছন্দের সামঞ্জস্য না হলে পাঠকচিত্তের প্রসন্নতা নষ্ট হয়ে যায়।

তার পর দেখতে হবে—কবিতাটির Sequence বা পরম্পরা কি? কবিতার পক্ষে বিষয়বস্তুটাই বড় নয়, তার প্রকাশভঙ্গীটাই বড়। এই সাধারণ সত্যটাকে এ যুগের শিক্ষিত পাঠকরা, এমন কি সমালোচকরাও একেবারে আমল দেন না। আশ্চর্যের বিষয়, যাঁরা ইউরোপীয় সাহিত্য পড়েছেন, ইউরোপীয় রসতত্ত্বের আলোচনাও পড়েছেন—তাঁদেরও অনেকে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যকেই কবিতার সর্বস্ব মনে করেন।

এর কারণ হচ্ছে—এঁরা যা পড়েছেন তার ঠিকমত পরিপাক হয় নি এবং কবিতার টেকনিক ও বিবিধ রচনাভঙ্গী সম্বন্ধে এঁদের জ্ঞান নেই। পাণ্ডিত্যের দ্বারা তত্ত্বেরই উদ্‌ঘাটন হয়। রসজ্ঞতা ও শিল্পকৌশল সম্বন্ধে শিক্ষা না থাকলে রসের উদ্‌বোটন হয় না। Intellectual Sentiment আর Aesthetic Sentiment একবস্তু নয়। Intellectual Sentiment আনন্দ বটে, কিন্তু Aesthetic Sentiment দিব্যানন্দের সমীপবর্তী—ব্রহ্মাস্বাদসহোদর।

বাঙ্গালী কবির কবিতায় বাংলার হৃৎস্পন্দন থাকবে এটাই প্রত্যাশিত। বাংলার মাটি জল, বাংলার সুখদুঃখ, আশাআকাঙ্ক্ষা, সমাজসংসার, সংস্কৃতি-সভ্যতার কথাই বাঙ্গালী কবির কাব্যে বাণীরূপ লাভ করবে—এটাই স্বাভাবিক। তা হলেই বাঙ্গালী পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে সহজে। চিরদিন বাংলার কবিতার উপজীব্য ঐ সবই ছিল। অনেকে মনে করেন—সেজন্যই এযুগে তা বর্জনীয়। এ ধারণা ভুল। যুগে যুগে বাংলার প্রাণের কথা নব নব রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। কবিকঙ্কণের দেওয়া বাংলার রূপ আর রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রূপ এক নয়,—তাঁর শিষ্যদের দেওয়া রূপও স্বতন্ত্র। বাংলার জাতীয় জীবনও এক ভাবেই নেই, যুগে যুগে তার পরিবর্তন হয়ে এসেছে। আপন দেশের কথা কখনও পুরনো হয় না।

যাকে ভালবাসা যায় তার কথা অফুরন্ত। দেশকে ভালবাসলে দেশের কথাই নবনবায়মান হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, বাংলার জীবনের সঙ্গে যোগ না থাকলেও যে উৎকৃষ্ট বাংলা কবিতা হতে পারে না তা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে বাংলার প্রাণের সঙ্গে যে কবিতার যোগ নেই—তার উপভোক্তার সংখ্যা অল্পই হয়। যে উচ্চশ্রেণীর কালচারের ফলে পাঠকের মতিবুদ্ধি দেশকাল ছাড়িয়ে বিশ্বাত্মক

হয়ে ওঠে—সে কালচার যাঁদের হয়েছে তাঁরা তো যে কোন দেশের কবিতাই তাঁদের সংখ্যা খুব কম। উপভোগ করতে পারেন—কিন্তু

ইদানীং মুশকিল হয়েছে—এক শ্রেণীর পাঠক বাংলার প্রকৃতি, সংস্কৃতি, সমাজ, সংসার নিয়ে রচিত কবিতা মাত্রকেই অবজ্ঞাভরে বর্জন করেন এবং বিজাতীয় ভাবের রচনা হলেই তার প্রশংসা করেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যা যা আছে—ঠিক সেই সেই বস্তুর বিপরীত কিছু পাবার জন্য একটা অস্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় পাঠকদের। বাল্মীকি হতে সুনির্মল বসু পর্যন্ত কাব্যের যে ধারা চলে আসছে সেই ধারার অনুবর্তী হলেই যে কোন কবি অপাংক্তেয়,—এ মনোভাবও পাঠকসমাজে দেখা যাচ্ছে।

ঐতিহাসিক বিষয়-মাত্র পুরাতন সন্দেহ নেই, কিন্তু কোন ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত কবিতায় যদি যথাযথ ঐতিহাসিক পরিবেশ পরিস্ফুট হয় এবং তদ্দ্বারা রস সৃষ্টি হয় তা হলে অতীতযুগের কথা বলে তা উপেক্ষণীয় নয়। পৌরাণিক বিষয়-বস্তু হয়ত আরও পুরাতন—কিন্তু পৌরাণিক চরিত্রগুলিকে যদি Symbol স্বরূপ অবলম্বন করে কোন কবি সেগুলির নতুন Interpretation দেন—তা হলে তাও ঐতিহ্যমূলক বলে অবজ্ঞেয় হতে পারে না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চরিত্র ও ভাববস্তুগুলিকে যদি এ যুগে নবকলেবর দান করা হয় এবং অভিনব Interpretation দেওয়া হয়—তা হলেও তা সৎ কবিতা হতে পারে। রূপটা যদি নতুন হয়, বিষয়বস্তু পুরনো বলে রসজ্ঞ পাঠক কখনও সেগুলিকে অবজ্ঞা করেন না, অভিনব-সৃষ্টি বলেই মনে করেন।

কোন ছন্দে না লিখলেও কবিতা হতে পারে, কিন্তু আমাদের মতে Sequence একটা চাই, প্রসাদগুণ থাকা চাই, ভাষার স্বচ্ছতা চাই, এবং ফল্গুধারায় বর্তমান থাকলেও একটা হৃদয়াবেগ চাই।

তার পর দেখতে হবে—কবিতার বক্তব্যকে বাচ্যার্থে গ্রহণ করতে হবে—না—লক্ষ্যার্থে গ্রহণ করতে হবে। 'সোনার তরী'র মত কবিতাকে বাচ্যার্থে গ্রহণ করলেও কিছু রস পাওয়া যায়—কিন্তু লক্ষ্যার্থে ও ব্যঙ্গ্যার্থে গ্রহণ না করলে কবির সৃষ্টি পাঠকের মনে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করবে না। মনে রাখতে হবে অধিকাংশ উৎকৃষ্ট কবিতার বিষয়বস্তু একটা Symbol মাত্র। কাজেই Symbolical significance এর সাক্ষাৎ না পেলে কবিতাটি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ সার্থক হয় না। শুধু লিরিক কবিতায় নয়, মহাকাব্য খণ্ডকাব্যের চরিত্রগুলোও সব রক্তমাংসের জীব নয়—তারা Symbol বা ভাববিগ্রহ। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলা যেতে

পারে—কোন নির্দিষ্ট ব্যঙ্গ্যার্থ যদি না-ই পাওয়া যায় তাতেও ক্ষতি নেই। পাঠকচিত্ত ব্যঙ্গ্যার্থের সন্ধানে বাচ্যাতিশায়ী হলেই কবিতার উৎকর্ষ উপলব্ধ হবে।

তার পর দেখতে হবে—কবিতাটি একটি organic wholeএ পরিণত হয়েছে না mechanical structureএ পরিণত হয়েছে। যখন দেখা যাবে—কবিতাটি complete in itself, perfect and rounded as a star, দু লাইন কমানোরও উপায় নেই, দু লাইন বাড়ানোও চলে না এবং গোড়া হতে উদ্বর্তনের ধারা অবলম্বন করে চূড়ান্তে পৌঁছেছে—তখনই বুঝতে হবে—কবিতাটি organic whole হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার পর আর আগালে anti-climax হত। একটা দৃষ্টান্ত দিই—রবীন্দ্রনাথের 'হৃদয়-যমুনা' কবিতাটির গোড়া হতে উদ্বর্তনের ধারাটি কেমন করে স্তবকে স্তবকে অগ্রসর হয়ে চরমে পৌঁছেছে তা লক্ষ্য করতে বলি।

দেখতে হবে কবিতার মধ্যেই তাঁর রসঘন বা ভাবঘন উক্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন কিনা, পাঠক বুঝবে না মনে করে টীকা ভাষ্য করেছেন কিনা, পাঠকের অপটুতা বা ঔদাস্য আশঙ্কা করে কবির উদ্বেগ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কিনা। উৎকৃষ্ট কবিতায় কবিতার অংশবিশেষের এরূপ ব্যাখ্যাদি থাকে না।

দেখতে হবে কবিতাটি চিত্রাত্মক, না গীতাত্মক, না ভাবাত্মক। চিত্রাত্মক কবিতায় চিত্রপরম্পরা ছাড়া অন্য কিছু প্রত্যাশা করতে হবে না। চিত্ররসই উপভোগ করতে হবে, যেমন—রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতায়। গীতাত্মক কবিতায় সুরের পরম্পরাটাই বড়, অন্য পরম্পরা থাকবার প্রয়োজন নেই, যেমন রবীন্দ্রনাথের বর্ষামঙ্গল কবিতায়। ভাবাত্মক কবিতায় অর্থগৌরব থাকবার কথা—যেমন—'শা-জাহান' কবিতায়।

প্রত্যেক উৎকৃষ্ট কবিতায় একটা হৃদয়াবেগ থাকে। হৃদয়াবেগের অভাবের জন্য পোপ aphorism-এর ভাণ্ডারী হয়েও খুব বড় কবি বলে গণ্য হতে পারেন নি, ভারবি প্রচুর অর্থগৌরব সত্ত্বেও কালিদাস-ভবভূতির সমীপবর্তী হতে পারেন নি। হৃদয়াবেগই কবিতায় প্রাণ সঞ্চার করে।

অবশ্য হৃদয়াবেগের আতিশয্যও দোষাবহ। অতিরিক্ত হৃদয়াবেগ নবীন সেন, দেবেন সেন ইত্যাদি কবির কবিতাকে অনেকক্ষেত্রে দুর্বল করে তুলেছে। সংযত হৃদয়াবেগই উৎকৃষ্ট কবিতার উপজীব্য। উৎকৃষ্ট কবিতায় হৃদয়াবেগ ফল্গুধারার মত কবিতার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কিনা, তা লক্ষ্য করতে হবে।

ঘৃণা, বিদ্বেষ, রিরংসা, প্রমত্ততা, লোভ ইত্যাদিও হৃদয়াবেগ—কিন্তু এ সমস্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর তামসিক হৃদয়াবেগ। বিদ্রোহী মনোভাব ভগবানের বিরুদ্ধেই হোক,

মানুষের বিরুদ্ধেই হোক—তাও হৃদয়াবেগ। কিন্তু এ হল রাজসিক শ্রেণীর। সাত্ত্বিক হৃদয়াবেগই উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গীতিকবিতার প্রধান উপজীব্য। উৎকৃষ্ট নাটকে সকল শ্রেণীর হৃদয়াবেগের স্থান আছে—নাটকের বিচার সমস্ত মিলিয়ে তার ফলশ্রুতিতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত তামসিক মনোভাবের পরাভব দেখানো হয়—এণ্টোনিওদের জয় হয়—শাইলকদের পরাভব হয়।

বিদ্রোহী মনোভাবের কবিতা অনেক সময় বক্তৃতার রূপ ধরে—উচ্ছ্বাস আস্ফালনে পরিণত হয়।

যুগধর্ম ক্রমে হৃদয়াবেগকে দুর্বলতা বলে ঘোষণা করছে। তাই ক্ষমা আজ চিত্তের শিথিলতা, দয়া আজ হৃদয়ের তরলতা বলে ব্যাখ্যাত হচ্ছে। তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিশ্লেষণের ফলে কৃতজ্ঞতা মানবহৃদয় হতে চিরবিদায় গ্রহণ করছে। এর পরে যদি মানুষের জন্ম হয়, হাসপাতালে, মৃত্যু হয় হাসপাতালে, তার রোগশয্যা পাতা থাকে যদি নার্সিং হোমে, শিশু যদি মানুষ হয় নার্সারীতে, শিক্ষালাভ করে যদি বোর্ডিং হাউসে থেকে এবং কর্মক্ষেত্র যদি হয় দুনিয়ার যেখানে সেখানে, তাহলে স্নেহ, মায়া, ভালবাসা, সৌভ্রাত্র ইত্যাদি সবই বিদায় নেবে। ভগবান একটা জড়শক্তিতে পরিণত হয়েছেন। পাতিব্রত্য একটা অন্ধসংস্কারের মধ্যে গণ্য হচ্ছে। ধর্মের যে Ritualism রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রধান আশ্রয়, তা জগতের সকল ধর্ম হতেই বিদায় নিয়েছে। সকল দেশের কবিদের কবিতা হতেই হৃদয়াবেগও বিদায় নিচ্ছে।

গদ্যাত্মক ভাষায় verse হতে পারে, poetry হয় না। বড় বড় কবিদের আবার নিজস্ব ভাষা থাকে, যেমন—বিদ্যাপতির, মাইকেলের, রবীন্দ্রনাথের ভাষা। কবির নিজস্ব ভাষার সঙ্গে সুপরিচয় থাকার প্রয়োজন।

আজকাল কবিতাবিচারে কবির কবিতায় কোন্ মতবাদটা উপজীব্য, তাই নিয়ে কবিপ্রতিভার উৎকর্ষাপকর্ষ নির্দেশ করা হয়।

কবিতার পক্ষে যদি কোন 'বাদ' অপরিহার্য হয়—তবে তা রসবাদ। কবিতায় রসসৃষ্টি হল কিনা তাই দেখতে হবে---তার মূলে যে মতবাদই থাকুক। কবির সৃষ্টির উৎকর্ষ বিচার করতে গিয়ে এ কালের সমালোচকের দল—ভোগবাদ, দেহাত্মবাদ, দুঃখবাদ নিয়ে খুব বাদানুবাদ করেন। আবার বিষয়বস্তুকে প্রাধান্য দিয়েও কাব্য বিচার করা হয়। যেমন—রচনায় পরলোকে অবিশ্বাস, ভগবানকে অস্বীকার, দারিদ্র্য পূজা, দুর্গত জীবনের বীভৎসতা, সামাজিক আদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, হৃদয়ধর্মকে কুসংস্কার বলে ঘোষণা, অন্নকষ্ট, ধনিকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম,

নাগরিক বিজাতীয় ভাববিলাস ইত্যাদি বিষয়বস্তুকে এবং পুঁথিপড়া বিদ্যাকে কাব্যের উৎকর্ষের আশ্রয় বলে গণ্য করে চির-প্রচলিত রসবাদের কবিদের তুচ্ছ-জ্ঞান করা হয়।

কবিতার পক্ষে কোন মতবাদ বা কোন বিষয়বস্তু মুখ্য নয়। একই মতবাদ নিয়ে বা বিষয়বস্তু নিয়ে বহু কবিই লিখতে পারেন—লিখেওছেন। সকলের রচনা উৎকৃষ্ট হয় না বা হয় নি, দুই-এক জনেরই হয়েছে। কোন মতবাদ বা বিষয়বস্তু কোন কবির আবিষ্কারও নয়,—সবই পুরনো। আজ যদি কোনটা নতুন বলে মনে হয়, কাল তা মনে হবে না।

দুই পরস্পর-বিসংবাদী মতবাদের কবিতাই উৎকৃষ্ট হতে পারে। দেহাত্মবাদের কবিতা যেমন উৎকৃষ্ট হতে পারে,—অধ্যাত্মবাদের কবিতাও তেমনি উৎকৃষ্ট হতে পারে। শ্রীরামের আধ্যাত্মিক ও সাত্ত্বিক আদর্শ নিয়ে যেমন উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয়েছে,—রাবণের জড়বাদাত্মক ও রাজসিক আদর্শ নিয়ে রচিত কাব্যও তেমনি উৎকৃষ্ট হয়েছে। শেক্সপীয়রের লেডি ম্যাকবেথ ও ডেসডিমনা দুই চরিত্রই রসোত্তীর্ণ সৃষ্টি।

প্রকৃত পক্ষে কবিতার পক্ষে মুখ্য উপজীব্য কবির নিজস্ব কলাকৌশলে গভীর অনুভূতির রসানুকূল অভিব্যক্তি। বিষয়বস্তু যাই হোক, কবির দৃষ্টিভঙ্গী যাই হোক—তাঁর রচনাকৌশল ও প্রকাশভঙ্গীটাই কবিতার পক্ষে প্রধান বিচার্য।

Allusiveness কবিতার একটা অলঙ্কার। এতে কবিতার আস্বাদ্যমানতা বাড়ে—এ হল পরমান্নে কর্পূর-সংযোগের মত। Allusion, referenceকে সংস্কৃতে বলে উদ্‌ঘাত। উদ্‌ঘাতের নিজস্ব একটা রসময় পরিবেশমণ্ডল আছে—উদ্‌ঘাতের পরিবেশ কবিতার রসকে পরিপুষ্ট করে। উদ্‌ঘাতের সার্থকতা না বুঝলে কবিতার সার্থকতায় অঙ্গহানি হয়। এই উদ্‌ঘাত উপমার ছদ্মেও কবিতায় আসতে পারে। কবিতার মধ্যস্থ উদ্‌ঘাতের সার্থকতা জেনে নিতে হয়। আর এক শ্রেণীর উদ্‌ঘাত আছে—কোন প্রাচীন শ্রেষ্ঠ কবির বিখ্যাত রচনায় ব্যবহৃত পদগুচ্ছ কবিতার মধ্যে থাকতে পারে তাতে ঐ প্রাচীন কবিকে রসপুষ্টির সহায়তার জন্য আহ্বান করা হয়। একটি দৃষ্টান্ত দিই—'রবে কুসুমৈকপাত্রে দুজনের মধুপানস্মৃতি।' কুসুমৈকপাত্র—এই পদগুচ্ছের প্রয়োগ অনর্থক নয়। এতে মনে পড়বে—'মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।' কুমারসম্ভবের অকাল বসন্তের সমস্ত পরিবেশটা এসে রসসৃষ্টির সহায়তা করবে। অবশ্য কালিদাসের কুমারের অকালবসন্ত-বর্ণনার মত শ্রেষ্ঠ রচনা যার পড়া নেই—তার কাছে এ এই উদ্‌ঘাতের প্রয়োগ ব্যর্থ।

কবিতার পদবিন্যাসের সার্থকতাও বুঝতে হয়। এক শব্দের বহু প্রতিশব্দের মধ্যে একটি বিশিষ্ট শব্দকে কবি কেন নির্বাচন করেছেন তার সার্থকতা বুঝতে হয়। কালিদাস 'সঞ্চারিণী পল্লবিনীব বল্লী'—না বলে কেন 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'—বলেছেন? রবীন্দ্রনাথ—কেন 'হে রবি তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা'—না বলে—'তপন, তোমার স্বপন দেখি যে করিতে পারি না সেবা'। বলেছেন তা বুঝতে হয়। অথচ লীলাসঙ্গিনী কবিতায় কেন বলেছেন?—

দেখ নাকি হায় বেলা চলে যায় শেষ হয়ে এল দিন,
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির শেষ রাগিণীর বীণ।

এখানে 'রবি' শব্দেরই সার্থকতা আছে শ্লেষের জন্য। আবার 'বর্ম আবরিত দ্বারীর চোখে অশ্রু করে ছলছল'—এখানে 'বর্ম আবরিত' বিশেষণের সার্থকতা কি? 'এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার'—এখানে শুচি বিশেষণের সার্থকতা কি? এইরূপ শব্দপ্রয়োগের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয়তা বুঝতে হয়। অনুপ্রাস, শ্লেষ ইত্যাদি শব্দালঙ্কারের ও মোটামুটি অর্থালঙ্কারের জ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। কোন প্রকারে মিল হলেই হল না। মিলের উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। সার্বঙ্গসুন্দর মিল কবিতায় লাবণ্য বর্ধন করে।

তার পরে এল বৈয়াকরণ
ধূলিমাখা দুটি লৈয়া চরণ

ইত্যাদিতে মিলের চাতুর্য একরূপ। আবার—

শ্রাবণে ডেপুটিপনা
এত কভু নয় সনা-
তন প্রথা এযে অনা-
সৃষ্টি অনাচার।

ইত্যাদিতে আর এক ধরণের চাতুর্য। কেবল অপ্রত্যাশিত মিল দেওয়ার চাতুর্য কিরূপ রসের সৃষ্টি করে—তা রবীন্দ্রনাথের 'শিলঙের চিঠি' কবিতাটি বা দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান পড়লেই বোঝা যায়।

অকারণে-ব্যাকরণ দোষের সৃষ্টি, অকারণে অপ্রচলিত ও গ্রাম্য শব্দের প্রয়োগ, দুর্বল মিল, শব্দবিকৃতি, একই শব্দের বার বার প্রয়োগ ইত্যাদি কবিতার অঙ্গহানি ঘটায়। উৎকৃষ্ট কবিতায় এসব দোষ থাকে না।

ছন্দোহিল্লোল (Rhythm) থাকলে আবৃত্তির সময় লক্ষ্য করতে হয়। স্তবক বাঁধা কবিতা হলে তার চরণবিন্যাসে Uniformity আছে কিনা লক্ষ্য করতে হয়।

মনে রাখতে হবে—গদ্যের ভাষা ও কবিতার ভাষা এক নয়। ছন্দে ফেললেই গদ্যের ভাষা কবিতার ভাষা হয়ে ওঠে না। গদ্যাত্মকতা কবিতার একটা দোষ। কবিতার নিজস্ব বাচনভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়।

এ সব কথা বলে লাভ নেই। কারণ এত ক্লেশ স্বীকার করে কবিতা বুঝবার জন্য এ যুগে কেউ প্রস্তুত হবে না। যার স্বাভাবিক রসবোধ আছে—তাকেই এসব কথা বলা চলে।

এ যুগের সাংঘাতিক মারণাস্ত্রগুলি শুধু লক্ষ লক্ষ মানুষকেই ধ্বংস করে নি, মানুষের হৃদয়বৃত্তিগুলিকেও হত বা আহত করেছে। তাই মনে হয়, কবিতার দিন ফুরিয়ে আসছে।

কাব্যে পৌরুষশক্তি

আজকাল কেহ কেহ দুঃখ করিয়া বলেন—কাব্যে পৌরুষশক্তির অভিব্যক্তি আর দেখা যায় না। পৌরুষশক্তির অভাবে বাঙ্গালা কাব্য প্রাণহীন হইয়া পড়িতেছে। ইঁহারা প্রেম, সহৃদয়তা, মমতা, কারুণ্য, বাৎসল্য, আত্মোৎসর্গ, ধর্মনিষ্ঠা ইত্যাদিকে পৌরুষধর্ম মনে করেন না, বোধ হয় নারীর ধর্ম বলিয়া গণ্য করেন এবং আস্ফালন, হুঙ্কার, অসহিষ্ণুতা, প্রতিহিংসা, বিদ্রোহ, বাহ্বাস্ফোটন ইত্যাদিকেই পুরুষের ধর্ম বলিয়া গণ্য করেন এবং ধীর শান্ত চিত্তে হৃদয়বৃত্তির অনুশীলনকে প্রাণহীনতার লক্ষণ মনে করেন। ইঁহারা বলেন মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রে যে পৌরুষ ভাব আছে—এমন কি কাজী নজরুলের কবিতাতেও যাহা আছে—তাহা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নাই। তথাকথিত পৌরুষভাব গীতিকাব্যের অপরিহার্য অঙ্গ নয়,—অর্থাৎ কোন কবিতার মধ্যে খানিকটা দুর্দম উত্তেজনা না থাকিলে সেটা নিস্তেজ কবিতাই হইবে—ইহা রসজ্ঞের কথা নয়। কোন কবির কোন কবিতায় পৌরুষভাব না থাকিলে তিনি উচ্চশ্রেণীর কবি নহেন, আশা করি কেহ তাহা বলিবেন না। তবে পৌরুষভাবদ্যোতক কবিতা একেবারে না থাকিলে জাতীয় সাহিত্যের পক্ষ হইতে অঙ্গহানি যে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সকলপ্রকার সুকুমার, শান্ত, সংযত হৃদয়বৃত্তিকে নারীপ্রকৃতির অঙ্গীভূত বলিয়া বাদ দিলে যে কয়টি হৃদয়বৃত্তি বাকী থাকে—গীতিকবিতার পক্ষে তাহারা উৎকৃষ্ট

রসবস্তু নয়। মহাকাব্যে বহু রসের সমাবেশ থাকিত, চরিত্র-সৃষ্টি এবং বিপরীত প্রকৃতির চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত থাকিত. একটা কথা-বস্তু তাহার মেরুদণ্ডস্বরূপ বর্তমান থাকিত—ঘটনা-পরম্পরা থাকিত,—তাহাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য পৌরুষ-ভাব-দ্যোতক সৃষ্টির প্রয়োজন হইত। মহাকাব্যের মধ্যে রৌদ্র, বীর, ভয়ানক ইত্যাদি রসের যথাযথ অভিব্যক্তি অন্যান্য সুকুমার রসের সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করিত, অশোভন হইত না।

খণ্ডকাব্যগুলিতেও মহাকাব্যের অনেক ধর্ম বর্তমান আছে। কাজেই এই-গুলিতেও, অতিরিক্ত মর্যাদা লাভ না করিলেও, উদ্দীপক ওজোভাব বা তেজো-ভাবের যথাযোগ্য স্থান হইয়াছে। পরে যখন খণ্ড-কাব্যের উপজীব্যের বিভাগ হইয়া গেল—অর্থাৎ যখন নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, সঙ্গীত ও গীতি-কবিতা খণ্ড-কাব্যের দায়িত্বকে আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইল—তখন নাটক এবং উপন্যাস কতকটা খণ্ডকাব্যের পৌরুষাংশটা পাইয়া গেল, বহু রসের একত্র সমবায়ের দায়িত্ব-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে।

যে কয়টি রসবস্তু অবলম্বনে তথাকথিত পৌরুষশক্তির অভিব্যক্তি, রসশাস্ত্রের রসপর্যায়ে তাহারা নিম্নজাতীয়। সে জন্য গীতি-কবিতা সেগুলিকে বর্জন করিতে বাধ্য হইল। গীতি-কবিতা একটি কোন বিশেষ রসবস্তুকে অবলম্বন করিয়া রচিত। তাহাকে যখন একটিমাত্র রসবস্তুকেই অবলম্বন করিতে হইবে, তখন সে নিম্নশ্রেণীর কোন রসবস্তুকে গ্রহণ করিবে কেন? নাটকের পক্ষে সে অসুবিধা বা আপত্তি নাই।

মাইকেল বীররসের কাব্য লিখিব বলিয়া মেঘনাদবধ রচনায় হাত দেন—কিন্তু সেই রসই তাঁহার কাব্যে প্রবল হইয়া উঠিল না। সেই সঙ্গে করুণ রস ও নারীত্বের মাধুর্যকে তিনিও প্রাধান্য দিতে বাধ্য হইলেন। কারণ, তিনি প্রথমশ্রেণীর গীতি-কবি। তাহা না হইলে বেণীসংহারের দশা হইত মেঘনাদবধের। তথাকথিত পৌরুষভাব যে গীতিকাব্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট উপজীব্য নয় তাহা বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তিনি বীরাঙ্গনা ও চতুর্দশ পদাবলীতে তাহাকে স্থান দেন নাই—বীরাঙ্গনার জনা-ও কৈকেয়ী-চরিত্রে সন্তানবাৎসল্যই মৌলিক রসবস্তু। গীতিকাব্য রচনায় তিনি ব্রজলীলাকেই বিষয়বস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন। মাইকেল বাংলা দেশে পৌরুষ ওজস্বিতার জন্য সবচেয়ে প্রখ্যাত কবি—কিন্তু তিনি কেবল তাহারই উপর নির্ভর করিতে পারেন নাই।

হেমচন্দ্রের কবিতাবলীর অনেক কবিতায় পৌরুষ ওজস্বিতা দেখা যায়,—কিন্তু

সেগুলির আজ কি দুর্দশা! সেগুলিকে কেহ ছন্দে বক্তৃতা ছাড়া আর কিছু কি মনে করে?

যাঁহারা পৌরুষভাবের অভাবে জাতীয় সাহিত্যের অঙ্গহানি হইতেছে মনে করেন—তাঁহারা নাটকগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারেন। নাটকগুলিতে ঐ ভাব যথেষ্ট পাইবেন। আর যদি সংযম, সাহস, উৎসাহ, তেজস্বিতা, আত্মোৎসর্গ, ক্ষমা, মুক্তি-তৃষ্ণা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ইত্যাদিকে পৌরুষ-ধর্মের অন্তর্গত মনে করেন—তবে রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও তাহা যথেষ্ট পাইবেন!

যাঁহারা কাব্যে পৌরুষ-শক্তির অভিব্যক্তির পক্ষপাতী, তাঁহাদের কেহ কেহ চাহেন কাব্যে বিদ্রোহ, আস্ফালন, পরুষতা ও কর্কশতা। কোন কবি যদি তাঁহার কাব্যে বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হন, ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রগণকে হেয় বা হীন প্রতিপন্ন করিয়া অপূর্ব সাহস দেখান, অথবা শত শত বৎসরের সভ্যতার সহস্র চেষ্টায় যে আদিম বর্বর মনোবৃত্তিগুলি শাসিত হইয়া আছে, সেই মনোবৃত্তিগুলির উন্মত্ত উত্তেজিত অভিব্যক্তি দ্বারা বাহাদুরি দেখান, তবে এই শ্রেণীর পাঠকগণ বোধ হয় পৌরুষশক্তির প্রকৃত বিকাশ বলিয়া স্বীকার করিবেন।

এই রূপ প্রয়াস তথাকথিত পৌরুষ নহে—ইহা পরুষতা। বলাবাহুল্য, পৌরুষভাব থাকিলেই শুধু চলিবে না—আর্ট হইয়া উঠা চাই। এই শ্রেণীর রূঢ়তা বা পরুষতা আর্টের পক্ষে গুণ নহে—দোষ। সাধারণতঃ কর্কশকে মসৃণ-চিক্কণ ও পেলব করিয়া তোলাই গীতিকাব্যের আর্ট। কার্কশ্য প্রকৃতির মধ্যে আছে সত্য—কিন্তু প্রকৃতির অনুকরণই ত শ্রেষ্ঠ আর্ট নয়, পাশবিকতা ও তামসিকতাও পৌরুষ নয়। পাশবিকতার সংযমনের নামই পৌরুষ। সকল মনোবৃত্তিই সাহিত্যের উপাদান হইতে পারে। কবির সরস লেখনীর স্পর্শে মানুষের বর্বর বৃত্তির ও পাশবিকতার কদর্যতা দূর হইয়া যায়। তাহা পৌরুষশক্তির উচ্ছেদন নয়। আর্টের সঙ্গে ব্রীড়ার অর্থাৎ শ্রীর সঙ্গে হ্রীর অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। নির্লজ্জতা কখনও শ্রীসম্পাদন করে না।

যাহা কিছু পুরাতন নির্বিচারে তাহাকে নিন্দা করায় বা তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার নাম পৌরুষ নয়। 'পুরাতন' মানুষের চিত্তহরণ করিয়া আসিয়াছে—আজ তাহাতে মানুষের আর ততটা তৃপ্তি হইতেছে না বটে। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে মানুষের মনকে বিষাক্ত করিয়া তোলায় পৌরুষ নাই। পুরাতনের পাশে নূতনকে দাঁড় করাইয়া, বাহুবলে নয়,—অসামান্য সৃজনশক্তির বলে, তাহাকে অধিকতর চিত্তহর করিয়া তোলাতেই পৌরুষ। জোর গলায় একটা বিদ্রোহের কথা হুঙ্কার

করিয়া বলিলেই পৌরুষভাবের কবি হওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে উদাত্ত ভাষায় রচিত চিত্তবিস্ফারক কবিতাই পৌরুষ ভাবের কবিতা। সন্ধান করিলে বাংলা সাহিত্যে তাহা মিলিবে। ছন্দে উত্তেজিকা বক্তৃতা বা ভাষায় পেশী-শক্তির প্রয়োগই পৌরুষ কাব্য নয়।

আমাদের দেশের কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে শৃঙ্খলা, গঠন-পারিপাট্য, সংযম ও শান্ত-শ্রীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এগুলি কাব্যসাহিত্যের পক্ষে এমনি স্বাভাবিক ও অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে যে অনেকের নিকট অতিপরিচয়ের জন্য তাহাতে বৈচিত্র্য বা অপূর্বতা নাই, অনেকে তাহার মধ্যে একটা সুলভতার গ্লানি অনুভব করেন, পরিপাট্য পরিচ্ছন্নতাকে অনেকে মেয়েলী ভাব বলিয়া মনে করেন, বলেন—এসব গৃহিণীপনা। তাঁহারা চাহেন,—ইহার বিপরীত প্রকাশভঙ্গী, একটা নূতন বিরুদ্ধ ধরণের বাণী, শৃঙ্খলাকে শৃঙ্খল মনে করিয়া তাহা হইতে মুক্তি চাহেন,—শুনিতে চাহেন একটা চমকপ্রদ নূতন কোন ঘোষণা, তাই সংযম ও শৃঙ্খলার বিপরীত একটা কিছু দেখিলেই পৌরুষশক্তির আবির্ভাব মনে করিয়া আশ্বস্ত হন।

জাতীয় জীবন ও সাহিত্য

[১]

প্রাচীন কাব্য যে অনেক সময় আদর পায় না, তাহার কারণ সর্বক্ষেত্রেই কাব্যের অপকৃষ্টতা নহে। প্রাচীন কবি যে-সমাজের বা যে-যুগের প্রতিনিধি,—যে-সমাজ বা যে-যুগের পাঠকগণের রুচি, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি বা মনোভাবের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বা সামঞ্জস্য সাধন করিয়া প্রাচীন কাব্য রচিত,—সেই সমাজ বা সেই যুগের সহিত বর্তমান সমাজ বা যুগের মানসিক ও ব্যাবহারিক আদর্শের মিলই নাই। তাই প্রাচীন কাব্যের আবেদনে আমাদের হৃদয় সাড়া দেয় না। যে পাঠক শিক্ষাদীক্ষা, অনুশীলন ও কল্পনাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন কবির সামসময়িক যুগ ও সমাজের অন্তরের পরিচয় লাভ করিতে পারেন,—আপনাকে কল্পনাবলে অক্লেশে অনায়াসে প্রাচীনযুগ ও সমাজের পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বচ্ছন্দে উপনিবিষ্ট করিতে পারেন, তিনি প্রাচীন কাব্যের রসও উপভোগ করিতে পারেন। বিনা 'কালচারে'

বর্তমান সাহিত্যের রস উপভোগ যদি বা কতকটা সম্ভবে,—প্রকৃষ্ট কালচার ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের রস উপভোগ সম্ভব নয়।

তবে যদি কোন প্রাচীন কবি,—মানুষের যে মনোবৃত্তি, যে রুচিপ্রবৃত্তি, যে সৌন্দর্যবুদ্ধি সর্বযুগে সর্বদেশে চিরন্তন,—তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কাব্য-রচনা করিয়া থাকেন,—যদি তিনি মহামানবের ও সর্বকালের প্রতিনিধি হইয়া অর্থাৎ দেশকালাতীত ভাবলোকে বিহার করিয়া কাব্য রচনা করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার কাব্য সর্বযুগে সর্বকালেই সমান উপভোগ্য।

ঠিক এই শ্রেণীর কাব্যের কথায় কবিগুরু বলিয়াছেন—

মেঘমন্দ্র শ্লোক,
বিশ্বের বিরহী যত সকলের শোক,
রাখিয়াছে আপনার অন্ধকার-স্তরে
সঘন সঙ্গীত মাঝে পুঞ্জীভূত ক'রে।

এই শ্রেণীর সার্বভৌম কবির কথা বাদ দিলে অন্যান্য কবিদের সম্বন্ধে আমাদের দুইটি কথা মনে হয়। কবির অন্তরে যে ভাব বা অনুভূতি প্রকাশ মাগিতেছে,—সে ভাব বা অনুভূতি তো কবির একার নহে। কবি যে-সমাজে বা যে যুগে জন্মিয়াছেন, সে সমাজে বা সে যুগের সকলের মনেই কতকগুলি বিশেষ-বিশেষ চিন্তা ও অনুভূতি অস্ফুট, অর্ধস্ফুট বা পরিস্ফুট-ভাবে বর্তমান ছিল। সেগুলি প্রত্যেক অন্তরেই রসরূপে সার্থকতা লাভ করিতে চায়, কেবল কবির অন্তরেই সম্পূর্ণ সুপরিণতি লাভ করিয়া কাব্য-রূপ ধারণ করে। অন্যের অন্তরে যাহা অঙ্কুরিত, কবির অন্তরে তাহা পুষ্পিত। কারণ,—"কবির চিত্তেই ভাবনাগুলি পূরাপূরি ভাব হইয়া উঠিতে পারে, এমন রস, এমন তেজ আছে।"

অর্থাৎ ঐ ভাব বা অনুভূতি অন্য সকলের অন্তরেও প্রকাশ মাগে, কিন্তু সৃজন-শক্তির অভাবে অন্যে তাহাকে রূপদান করিতে পারে না, কেবল কবিই তাহাকে রূপদান করিতে পারেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"ঐ ভাব বা অনুভূতি কবির একার নহে।" কেবল কবির মনেই যদি ঐ সকল ভাব বা অনুভূতির জন্ম হইত—তাহা হইলে কবির কাব্য সামসময়িক স্বদেশবাসীদেরও উপভোগ্য হইত না।

কবির মনে যদি এমন কোন ভাব বা অনুভূতির উদয় হয়—সামসময়িক জনগণের মনে তখনও যাহার উদয় হয় নাই—তবে কি কবি তাহাকে কাব্যে রূপ-দান করেন না?—কবি জানেন যে, হয়ত তাহা কোন প্রাণে সাড়া জাগাইবে না,

তবু তিনি তাহাকে বাণী-রূপ দান করেন। কবি যদি ঐ ভাব বা অনুভূতিকে সকলের মনেই সঞ্চারিত করিতে চাহেন—তবে তিনি আগে তাহা অন্য ভাবে প্রচার করিয়া মনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে পারেন, পরে কাব্য-লক্ষ্মীকে প্রেরণ করেন। প্রথম প্রথম পুরাতন ভাবধারাকে নবভাবের অভিমুখী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে তাহাই করিয়াছেন। এযুগে অনেক কবি এই জন্যই গদ্যও লিখেন। গদ্যরচনার দ্বারা প্রথমে নিজস্ব বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও অনুভূতির প্রেরণা পাঠকগণের মনে সঞ্চারিত করিয়া, হয়ত কিছুকাল পরে ঐগুলিকে কাব্যে রূপদান করেন।

সাধারণ কবিরা চিরদিনই তাঁহাদের ভক্ত পাঠকগণের বাধ্য। পাঠকগণের রুচিপ্রবৃত্তি ও চিন্তানুভূতির সহিত আপস করিয়াই তাঁহারা কাব্য সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের রচনায় দেখা যায়—তাঁহাদের অনুভূতি ও চিন্তার সহিত সবার অনুভূতি ও চিন্তার সন্ধি-সামঞ্জস্য। কবি জানেন—

"একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হ'বে দুইজনে।
গাহিবে একজন ছাড়িয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।"

পাঠক সমাজের আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই খ্রীষ্টান মধুসূদন, ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ও মুসলমান কাজী নজরুল হিন্দু সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান-গুলিকেও কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

কবি যতই গর্বভরে বলুন,—কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ বিপুলা চ পৃথ্বী ইত্যাদি—তিনিও, যাহা চারিপাশের প্রাণে প্রতিধ্বনিত হইবে না, সাধারণতঃ কাব্যে সে বাণী ধ্বনিত করিতে চান না। যিনি ঐকথা বলিয়াছিলেন—তিনি জানিতেন, তাঁহার চারিপাশে—'সমানধর্মারাই' বিরাজ করিতেছে। তাহা না করিলে ঐ উক্তি বড়ই অশোভন হইত।

কবির কাব্য অর্ধ সৃষ্টি,—সমানধর্মা পাঠকের মনের দ্বারাই সে সৃষ্টি সম্পূর্ণ হয়। যে কাব্যের অন্তঃস্থ চিন্তা ও অনুভূতিকে পাঠকচিত্ত চিরপরিচিত নিজস্ব চিন্তা ও অনুভূতি বলিয়া চিনিতে পারিয়া আলিঙ্গন করিবে না—সে কাব্য অর্ধ সৃষ্টি হইয়াই থাকিয়া যায়, সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না। নিজের চিন্তা অনুভূতিকে কাব্যে ফিরিয়া পাওয়ায় এত আনন্দ কেন? যে চিন্তা ও অনুভূতি পাঠকের চিত্তে রহিয়াছে,—কিন্তু পাঠক তাহাকে শোভনসুন্দর রূপ দিতে পারিতেছে না—তাহাকে রসমূর্ত দেখায় যে

মধুময় বিস্ময়, তাহাতেই তো আনন্দ।

কবির কথায়—

যাহা ছিল চিরপুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।

হারাধনকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দ কি কম?

কবিগুরু তাই বলিয়াছেন—"আমাদের কথা শ্রোতা ও বক্তা দুইজনের যোগেই তৈরি হইয়া উঠে। এজন্য সাহিত্যের লেখক যাহার কাছে লেখাটি ধরিতেছে, মনে মনে নিজের অজ্ঞাতসারেও তাহার প্রকৃতির সঙ্গে নিজের লেখাটি মিলাইয়া লইতেছে। দাশুরায়ের পাঁচালি দাশরথির ঠিক একলার নহে—যে সমাজ তাহার পাঁচালি শুনিতেছে, তাহার সঙ্গে ও যোগে এই পাঁচালি রচিত, এই জন্য এই পাঁচালিতে কেবল দাশরথির একলার মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, ইহাতে একটি বিশেষ কালের বিশেষ মণ্ডলীর অনুরাগ-বিরাগ-শ্রদ্ধা-বিশ্বাস-রুচি আপনি প্রকাশ পাইতেছে।" অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষ উপলক্ষ মাত্র,—ঐ পাঁচালি একটি সমাজেরই সৃষ্টি।

আপন যুগের ও সমাজের যাহাদের জন্য এবং যাহাদের সহযোগে কবি কাব্যরচনা করিয়াছেন, কবির কাব্য তাহাদের মনের সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা এমন কি সমস্ত মনোবৃত্তির ছন্দোময় সরস বিবৃতি।

তাই কোন দেশের বা যুগের, কোন সমাজের বা সম্প্রদায়ের মনের বার্তা জানিতে হইলে সেই সেই দেশ, যুগ, সমাজ ও সম্প্রদায়ের কাব্য পাঠ করিলেই চলে।

কবিগুরু বলিয়াছেন—

"এমন করিয়া লেখকদের মধ্যে কেহ বা বন্ধুকে, কেহ বা সম্প্রদায়কে, কেহ বা সমাজকে, কেহ বা সর্বকালের মানবকে আপনার কথা শুনাইতে চাহিয়াছেন। যাঁহারা কৃতকার্য হইয়াছেন, তাঁহাদের লেখার মধ্যে বিশেষভাবে সেই বন্ধুর, সম্প্রদায়ের বা বিশ্বমানবের কিছু-না-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এমন করিয়া সাহিত্য, কেবল লেখকের নয়—যাহাদের জন্য লিখিত তাহাদেরও পরিচয় বহন করে * * যে বস্তুটা টিকিয়া আছে—সে শুধু নিজের পরিচয় দেয় তাহা নহে সে তাহার চারিপাশেরও পরিচয় দেয়। সে কেবল নিজের গুণে নহে, চারিদিকের গুণেই টিকিয়া থাকে।"

যে কবি সমাজবিশেষ বা যুগবিশেষের জন্য কাব্য-রচনা করিয়াছেন, পরবর্তী কালে তাঁহার কাব্য অর্ধসৃষ্ট হইয়াই থাকে। যদি কেহ তদনুরূপ শিক্ষাদীক্ষা

অনুশীলনের দ্বারা ঐ যুগ বা সমাজের মনোভাব অধিগত করে এবং সেই মনোভাবে আবিষ্ট হইয়া কাব্যপাঠ করে, তবে কেবল তাহারই মনে তাহা পূর্ণসৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

পূর্ব হইতেই আসন্ন জাতীয় যুগান্তরের বাণী যাঁহার কাব্যে ধ্বনিত হয়, তাঁহার কাব্য জাতির মনে সঙ্গে সঙ্গে না হউক অনতিবিলম্বে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করিতে পারে। কারণ, যুগান্তরের উষার অরুণচ্ছটা সমগ্র জাতির মনকে অভিরঞ্জিত ও আশান্বিত করিয়া রাখে। যাহা স্বপ্নের বস্তু, যাহা আশাআকাঙ্ক্ষার ধন, তাহার আগমনী-গান জাতির প্রাণে আনন্দসঞ্চারই করে! এই শ্রেণীর কবিদের লক্ষ্য করিয়াই কবিগুরু বলিয়াছেন,—

ভোরের পাখী ডাকে রে ঐ ভোরের পাখী ডাকে,
ভোর না হতে কেমন ক'রে ভোরের খবর রাখে?

যে কবি মহামানবের জন্য লেখেন অর্থাৎ নিখিল মানবগণের চিরন্তন চিন্তা অনুভূতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া লেখেন, তিনিই মহাকবি,—সর্বযুগে সর্বদেশে অধিকারী আদর্শ পাঠকদের মনে তাঁহার কাব্য পূর্ণসৃষ্টি। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্রভাবে আলোচ্য।

জাতীয় জীবন ও সাহিত্য

[২]

একটা কথা চলিয়া আসিতেছে—সাহিত্য জাতীয় জীবনের বাঙ্ময় অভিব্যক্তি—জাতীয় জীবনই সামসময়িক সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। এই তথ্যটিকে প্রতিপন্ন করিবার জন্য সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের সহিত সামসময়িক সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি মিলাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কতক কতক মিলিয়া যায় সত্য—কিন্তু যাহা মিলে না, তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নীরব থাকেন। অধিকাংশ কবিই তাঁহার সামসময়িক জাতীয় জীবনের প্রভাব এড়াইতে পারেন না—তাঁহাদের সাহিত্যে সমালোচকগণ জাতীয় জীবনের প্রতিধ্বনি পাইয়া থাকেন। কিন্তু কোন কোন কবির কাব্যকে অবলম্বন করিয়া বর্ণে বর্ণে তাহার সহযোগিতা যদি জাতীয় জীবনে খুঁজিয়া দেখিতে যান তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন—কাব্যের

অনেকাংশই কবির সম্পূর্ণ কল্পনাসৃষ্ট ও চিন্তাপ্রসূত,—জাতীয় জীবন হইতে আদৌ আহৃত নয়।

যাহাই হউক, কোন কোন কবির কাব্য যে জাতীয় জীবনেরই অভিব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু এমন কবিও তো সকল দেশেই জন্মগ্রহণ করেন—যাঁহারা জাতীয় জীবনকেই যথাযথ চিত্রিত করেন না। তাঁহাদের কাব্যে ধ্বনিত হয় সর্বদেশের সর্বযুগের মানবের সর্বজনীন জীবনবাণী,—তাঁহারা কল্পনাপ্রসূত একটা আদর্শ জাতীয় জীবনের চিত্রাভাস দেন তাঁহাদের কাব্যে। হয়তো তাঁহারা জাতীয় জীবনকে ভাঙ্গিয়া গড়িবার জন্য একটা আদর্শ দেন তাঁহাদের রচনায়। হয়তো জাতীয় জীবনকে নবীন পথে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করিতেই তাঁহারা অবতীর্ণ। হয়তো তাঁহাদের কাব্যে একটা অপূর্ব অপরিচিত message বা বাণী থাকে। হয়তো তাঁহারা ভোরের পাখী, ভোর না হইতেই ভোরের খবর রটাইয়া দেন অর্থাৎ যে নবজীবনধারা জাতীয় দেহে এখনও সঞ্চারিত হয় নাই, সঞ্চার আসন্নমাত্র, সেই জীবনেরই উদ্বোধন করেন অথবা তাহার পরিচয় দান করেন।

এমন কবির আকস্মিক আবির্ভাব-ও হইতে পারে, অপরিসর সংকীর্ণ জাতীয় জীবনটুকু যাঁহার বিরাট শক্তির পক্ষে যৎসামান্য, পূর্ব পূর্ব কবিগণের সহিত যাঁহার সুস্পষ্ট যোগসূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং যাঁহার নিজস্ব জীবন, জাতীয় জীবন হইতে অনেক ঊর্ধ্বে বা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কবি তাঁহার নিজের মানসজীবনকেই তাঁহার সাহিত্যে ফুটাইয়া যাইতে পারেন। কবি হয়তো এমন একটা স্বপ্নলোক বা কল্পলোকের সৃষ্টি করিলেন, যাহার উপাদান উপকরণ আহরণ করিলেন আপনার বিরাট কল্পনা অথবা অতীত যুগের স্মৃতিলোক হইতে, চিরজীবন তিনি হয়তো একটা millennium-এরই স্বপ্ন দেখিয়া গেলেন অথবা অতীন্দ্রিয় ভাবালোকেই বিচরণ করিয়া গেলেন। মোটের উপর, সাহিত্য যে সামসময়িক জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি হইবেই এমন কোন কথা নাই।

তবে এক্ষেত্রে একটা বিপদ এই হইতে পারে, এইসকল কবির কাব্য আপন দেশে এবং আপন যুগে আদৃত না হইতেও পারে। জীবদ্দশায় আপন দেশে আদর পান নাই, এমন কবি তো সকল দেশেই দুই-এক জন জন্মগ্রহণ করেন। জাতীয় মনে যে সাহিত্যের ভাব অনুভূতি ইত্যাদি উপকরণ উপাদানের বোধ বা অভিজ্ঞতা নাই, সে সাহিত্য যে আদৃত হইবে না তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্যই তো বহু কবি নিরবধি কাল ও বিপুলা পৃথ্বীর উপর নির্ভর করিয়া কাব্য লিখিয়া যান।

যে বাসনা জাতীয় মনে পূর্ব হইতে বর্তমান নাই—সেই শ্রেণীর কবি জাতীয়

মনে সেই 'বাসনা'র সৃষ্টি করিয়া যান—পরবর্তী যুগ সে বাসনার অধিকারী হয় এবং তাঁহাদের কাব্যকে উপভোগ করিতে পারে। ঐ শ্রেণীর কবি যদি দীর্ঘজীবী হন, তবে তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় কাল অভিনব 'বাসনা' প্রবুদ্ধ করিতেই কাটিয়া যায় বটে, কিন্তু বৃদ্ধবয়সে দেশের লোকের সমাদর লাভ করিতে পারেন।

বিদ্বৎসমাজের মনে সহজেই অভিনব 'বাসনা' প্রবুদ্ধ করা যায় এবং দেশের বিদ্বৎসমাজের মানসজীবনের সহিত কবির মানসজীবনের অনেকটা মিল থাকিবার কথা। কবি সমগ্র জাতির প্রতিনিধি বা মুখপাত্র না-ও হইতে পারেন, কিন্তু জাতির রসিক সমাজ বা বিদ্বৎসমাজের বাণীদূত তাঁহাকে বলা যাইতে পারে। সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রতিবিম্ব তাঁহার কাব্যে না মিলিতে পারে—বিদ্বৎসমাজের মানসজীবনের পরিচয় অবশ্যই পাওয়া যায়। সে জন্য মনে হয়, এই শ্রেণীর সাহিত্যকে জাতীয় অভিব্যক্তি না বলিয়া দেশের বিদ্বৎসমাজের ভাব-জীবনের অভিব্যক্তি বলিলে কতকটা সত্যের কাছাকাছি যায়।

সাহিত্যে ন্যায়নিষ্ঠার স্থান

ভগবান নারীজাতিকে বড় দুর্বল করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার মনের বল থাকিতে পারে—কিন্তু তাহার দৈহিক সামর্থ্য এত সামান্য যে, সে বেশীক্ষণ অদৃষ্টের সঙ্গে যুঝিতে পারে না। সেজন্য তাহার দুঃখ-যাতনা, তাহার অসহায়তা, তাহার উপর দৈবের, প্রকৃতির ও পুরুষের অত্যাচার, আমাদিগকে সহজেই ব্যথিত করে। বৃদ্ধ, বালক, অশক্ত ও দীন-হীন ব্যক্তিগণ সম্বন্ধেও এই কথা। ইহাদের বেদনা আমাদিগকে ব্যথিত করে বলিয়াই সাহিত্যে ইহাদের বেদনাকে অনেক সময় উপজীব্য ও অবলম্ব করিয়া তোলা হয়। ইহাদের বেদনার পরিমাণ যদি অতি-দারুণ বা মর্মন্তুদ না হয় এবং তাহার প্রতিকারের বা প্রতিবিধানের কোন ব্যবস্থা বা ইঙ্গিত যদি ঐ সাহিত্যের মধ্যেই থাকে—তবে ঐ বেদনা রসে উত্তীর্ণ হইতে পারে। নিরপরাধা সবলা বা অশক্ত অসহায় অবলার উপর যদি কোন মানুষ উৎপীড়ন করে—তাহা হইলে সাহিত্যেও তাহার যথোচিত দণ্ডবিধান না হইলে আমাদের অন্তরের ন্যায়নিষ্ঠা পরিতৃপ্ত হয় না এবং সেই জন্যই আমরা রসানন্দ উপভোগ করিতে পারি না। সেজন্য রসসৃষ্টির জন্যই উৎপীড়কের দণ্ড সাহিত্যে

দেখানোর প্রয়োজন হয়। দৈব, প্রকৃতি বা সামাজিক প্রথা-পদ্ধতি উৎপীড়ক হইলে গত্যন্তরহীন হইয়া আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা নীরবে সহ্য করে—এবং আমরা তখন অশ্রুসিক্ত রসানন্দ উপভোগ করিতে বাধ্য হই।

সবল পুরুষ মহাষ্টমীর ছাগের মত উৎপীড়ন সহ্য করে না,—সে ভাগ্যের সহিত প্রাণপণে সংগ্রাম করে। হয় জয়ী হয়,—না হয় হতচেতন হইয়া পড়ে। তাহার বেদনাও আমাদের অন্তর স্পর্শ করে—কিন্তু সে যে রণদক্ষ ও শক্তিমান, সে যে ভাগ্যের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে এই সান্ত্বনা ঐ বেদনাকে কেবল মাত্র অশ্রুজলে পরিণত করে না—তাহাকে রসে উত্তীর্ণ হইতেও সাহায্য করে। জগতের বড় বড় কাব্য উপন্যাস ও নাটক সবল পুরুষের সংগ্রাম ও বেদনাকে অবলম্বন করিয়াই রসস্থষ্টি করিতে পারিয়াছে।

এই সবল পুরুষ যখন অতি বড় দুর্দান্ত দানব ও কল্যাণের মহাশত্রুরূপে ভীষণভাবে চিত্রিত হয়—তখন ভাগ্যের সহিত তাহার সংগ্রাম আমাদের সহানুভূতির উদ্রেক করে না। তাহার দারুণ প্রায়শ্চিত্তের ক্লেশ আমাদিগকে একপ্রকারের তৃপ্তির আনন্দ দেয়। এই আনন্দ রসানন্দ নয়,—ইহা নৈতিক আনন্দ। অবশ্য লেখকের রচনাগুণে এই আনন্দও রসে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু আমাদের নৈতিক বুদ্ধি ও ন্যায়নিষ্ঠার তৃষ্ণানিবৃত্তির আনন্দই এক্ষেত্রে প্রবল।

এ সংসারে সকল পাষণ্ডেরই দণ্ড হয় না। সকল পাপিষ্ঠেরই প্রায়শ্চিত্ত ইহলোকে দৃষ্ট হয় না। যাঁহারা বাস্তববাদী সাহিত্যিক তাঁহারা তাই পাষণ্ডের প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিতেই হইবে একথা মানেন না। তাই তাঁহারা তাঁহাদের চিত্রিত পাষণ্ডচরিত্রের অনেক সময় অবশ্যপ্রাপ্য দণ্ডের বিধান করেন না—তাঁহারা শুধু দেখেন স্বভাবানুবর্তী হইল কিনা।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রায়শ্চিত্ত ও দণ্ড হইতে ঐ পাষণ্ডের অব্যাহতি লাভ রসানন্দ সৃষ্টি করে না। পাঠকের নৈতিক ক্ষুধা যেখানে অতৃপ্ত থাকিয়া গেল—সেখানে তাহার অতৃপ্তিজনিত চিত্তের অপ্রসন্নতা রসোদ্বোধনে বাধা দিবেই। কবির সৃষ্টি স্বভাবানুগত হইয়াছে বলিয়া যে কবির কৃতিত্ব তাহা পাঠকের বুদ্ধিবৃত্তির কাছে প্রশংসা আদায় করে, কিন্তু রসতৃপ্ত মনের কোন ধন্যবাদ লাভ করে না।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিল্পী যখন রসসৃষ্টির জন্য পাষণ্ডচরিত্র অঙ্কন করেন, তখন তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত হইতে অব্যাহতিও দেন না, একেবারে তাহাকে অমানুষ দানবও করেন না, স্বাভাবিক মানুষই রাখেন। তাহা না হইলে পাঠকের অন্তরে কোন সহানুভূতির সৃষ্টি করিতে পারে না। শিল্পী ঐ পাষণ্ড মানবচরিত্রের মধ্যে কতকগুলি মানবিক গুণের

সমাবেশ করেন, নিম্নস্তরের হইলেও তাহার জীবনেও একটা আদর্শের প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার জীবনটাকে ভুলভ্রান্তি, দুরদৃষ্ট, আত্মগ্লানি ও অনুতাপের মধ্য দিয়া আগাইয়া লইয়া যান।

তাহার প্রায়শ্চিত্ত হয়, তখন আমাদের নৈতিক আদর্শের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য আমাদের মনে একটা তৃপ্তি ও প্রসন্নতা আসে, সেই সঙ্গে পাষণ্ড হইলেও একটা বিরাট পুরুষের পতনের জন্য, তাহার বিপথে চালিত মনুষ্যত্বের জন্য, একটা সংযত ধরনের বেদনাও জন্মে। এই তৃপ্তি ও বেদনাই পরিপূর্ণ রসানন্দের সৃষ্টি করে। আমি মেঘনাদবধের রাবণ-চরিত্রের কথা স্মরণ করিতে বলি। ইন্দ্রজিতের পতনই ঐ চরিত্রের পরম প্রায়শ্চিত্ত ধরা যাইতে পারে।

কাব্যে কারুণ্য

অনেকের ধারণা, যে কবিতায় কারুণ্যের ঝরণা ঝরে এবং পাঠকের নয়নে করুণার ঝরণা ঝরায়, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিতা। এ কথার সমর্থনচ্ছলে Shelleyর "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."—এই পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়। কিন্তু খেয়াল থাকে না যে, যাহা কিছু করুণ, তাহাই sweetest নয়। ঘুরাইয়া বলিলে দাঁড়ায় কতকগুলি করুণরসাত্মক রচনা মধুরতম। কারুণ্য সহজে চিত্ত বিগলিত করে—সহসা মনের ভাবান্তর আনয়ন করে—নয়নে অশ্রু ফুটায়, এ জন্য কারুণ্য-গুণোপেত কবিতাকেই সাধারণ পাঠক শ্রেষ্ঠ স্থান দিতে চায়। করুণ কবিতা Sweetest হইতে পারে, Best না-ও হইতে পারে,—যাহা কিছু সুমিষ্ট, তাহাই উৎকৃষ্ট নহে।

রাতভিখারী ছন্দ করিয়া সুর করিয়া ভিক্ষা করে, তাহাতে হৃদয় সকলেরই বিগলিত হয়, সে জন্য তাহার করুণ চীৎকার কবিতা হয় না। অনেকে কীর্তনের গৌরচন্দ্রিকার খচমচ ও অস্পষ্ট সুর শুনিয়াই কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেন, তবু উহা কবিতা তো নয়ই—উৎকৃষ্ট সঙ্গীতও নহে। সহজে হৃদয় বিগলিত হওয়া না হওয়া সম্পূর্ণ হৃদয়ের গঠনের উপর নির্ভর করিতেছে। একটি করুণ রসের কবিতা শুনিয়া এক জনের চিত্ত সামান্যমাত্র উদ্বেল হইতে পারে, কাহারও বা নেত্রে বন্যা ছুটিতে পারে, তাহা হইতে কবিতাটি কেমন হইয়াছে, ঠিক করা যায় না। এরূপ পরি-

বর্তনশীল, চঞ্চল, ভিত্তিহীন ও অনিশ্চিত আদর্শের দ্বারা কবিতার সৌন্দর্য পরিমাপ করা যায় না। যিনি অত্যন্ত বিচলিত হন, তিনি বলিবেন—এমন রচনা হয় না; যিনি একেবারেই বিচলিত হন না, তিনি বলিবেন,—ইহা ব্যথার বিলাসমাত্র।

তাহা ছাড়া আমরা 'করুণ সুরে'র জন্য অনেক সাধারণ সঙ্গীতকে কাব্যাংশেও শ্রেষ্ঠ গণ্য করি; আবৃত্তি-ভঙ্গীতে কারুণ্য ও সহানুভূতির উদ্দীপকতা লক্ষ্য করিয়া অ-কবিতাকেও উৎকৃষ্ট কবিতা মনে করি; কবির জীবনের কোন শোকাবহ ঘটনার সহিত বিজড়িত বলিয়াও অনেক সময় নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতাকে উৎকৃষ্ট মনে করি। এ জন্য কবির পত্নীবিয়োগ, পুত্রবিয়োগ, দারিদ্র্য ইত্যাদি অবলম্বনে রচিত কবিতা সহজেই কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হইলেও লোককান্ত হইতে পারে। যাহাকে ভালবাসি, তাহার বিয়োগে বা বিশেষ কোন বেদনাকে আশ্রয় করিয়া যাহা কিছু লেখা হউক, তাহাই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে হইতে পারে। পাঠক আপন মনের কারুণ্য মিলাইয়া সেগুলিকে এত করুণ করিয়া তুলে—আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া আপনার মনে উহাদিগের পুনর্বিরচন করে। অনেক কবিতাতেই পাঠককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া লইতে হয়, এ কথাও সত্য, কিন্তু কবি অপেক্ষা পাঠকের কৃতিত্ব অধিক হইলে চলিবে না। মাধুর্য বা সৌন্দর্যের অধিকাংশই যেখানে পাঠকের মন হইতে প্রাপ্ত, সেখানে কবির শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মাধুর্যের বা সৌন্দর্যের অধিকাংশই কবিকে দিতে হইবে।

এ সকল কবিতার বিচারে লক্ষ্য করিতে হইবে—কবিতা দ্বারা পাঠকচিত্তে যে রসের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার কতটা বা কবির দেওয়া, কতটা বা পাঠকের দেওয়া। যে চিত্ত কিণাঙ্ককঠিন বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত, সে চিত্ত এ শ্রেণীর কবিতার বিচারক হইতে পারে না। যে চিত্তে মনোবেগের সংযম বা ভাবোচ্ছ্বাসের শাসনবল্গা নাই, সে চিত্ত বিচারক হইতে পারে না। যে চিত্ত রসময়, কোমল ও ললিত অথচ সংযত, ধীর ও প্রশান্ত, সেই চিত্ত এই শ্রেণীর কাব্যবিচারে প্রকৃত অধিকারী। বিষয়-বস্তুটির প্রতি কোন বিশেষ কারণে আপনার ভালবাসা থাকিলে সেটিকে তৎকালের জন্য ভুলিয়া কেবলমাত্র কাব্যাংশের সৌষ্ঠব ও রসোদ্দীপকতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পাঠকের এ শ্রেণীর কবিতার বিচারে অগ্রসর হওয়া উচিত।

রচনার অবল্গিত ভাবোচ্ছ্বাসই কাব্য নহে—ঐ উচ্ছ্বাসকে কবি সুপরিচালিত সংযত, সংহত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া যখন কাব্যের অন্যান্য উপাদানে সমৃদ্ধ করিয়া প্রকাশ করেন, তখনই প্রকৃত কবিতা হয়। সে হিসাবে এই করুণ কবিতাও কেবল-মাত্র কারুণ্যের বলেই শ্রেষ্ঠ হইবে না—কবিতাও হওয়া চাই—উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে

উৎকৃষ্ট কবিতার রীতি-পদ্ধতি, শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সীমা ও বন্ধন অতিক্রম করিলে চলিবে না। যে কোন রস বা যে কোন ভাবকে অবলম্বন করিয়া কবির কলা-কৌশলগুণে একটি রচনা উৎকৃষ্ট হইতে পারে। কারুণ্যরসের এ বিষয়ে পৃথক্ একটা বিশিষ্ট অধিকার বা মর্যাদা নাই।

তবে কারুণ্যরসকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট কাব্য-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। একটি কবিতাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্য পাঠকমনের যে আনুকূল্য ও পরিপূরকতা কবি প্রার্থনা করেন, তাহা অন্য শ্রেণীর কবিতার পক্ষে সহজে এবং সর্বত্র না মিলিতেও পারে, কারণ, সকল প্রকার ভাব ও রস সকল চিত্তে সুলভ নহে এবং যে চিত্তে তাহার সন্ধান মিলে, সে চিত্তেও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না। "শৈলে শৈলে ন মাণিক্যং মৌক্তিকং ন গজে গজে।" কিন্তু কারুণ্যরস মানবচিত্তের সাধারণ সম্পত্তি—চন্দ্রের জ্যোৎস্নার ন্যায়—"নোপসংহরতে জ্যোৎস্নাং চন্দ্রশ্চণ্ডালবেশ্মনি।" বিধাতাও এই রস হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করেন নাই। সকল চিত্তেই কিছু না কিছু ঐ রস, হয় ফল্গুর মত, নয় পাগলা ঝোরার মতই বর্তমান। অধিকাংশ চিত্তেই প্রচুর পরিমাণেই বিশেষতঃ এই বাঙ্গালা দেশের হৃদয়গুলিতে আরও প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। কাজেই কবি যতটুকু চান, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশীই পাইয়া থাকেন। কবির করুণবাণী সে জন্য সহজেই বাঙ্গালী পাঠকের চিত্তে ঘন ঘন প্রতিধ্বনি লাভ করে।

কবি বলিয়াছেন—

"একাকী গায়কের নহে তো গান গাহিতে হবে দুই জনে।
গাহিবে এক জন ছাড়িয়া গলা আর এক জন গা'বে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে তো কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে তো মর্মর ফুটে।"

কিন্তু সকল ঢেউ-ই তটের বুকে সহজে কলতান তুলে না, সকল বাতাসই বন-সভায় সহজে মর্মরধ্বনি ফুটায় না। অশ্রুর ঢেউ সহজেই আমাদের চিত্তে কলতান তুলে, দীর্ঘশ্বাসের বাতাসই সহজে আমাদের মর্মে মর্মরধ্বনি ফুটাইতে পারে। অনেক সময় কবি পাঠকচিত্তের এই সহজ মাধুর্যের সুযোগটি উপভোগ করিবার জন্য প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন এবং পাঠকচিত্তের ঐ প্রকার তরলতা ও অসংযমের উপর নির্ভর করিয়া করুণ রচনায় শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রধান উপাদানগুলির সংযোগ বিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়েন—সে জন্য অনেক করুণ কবিতা যথেষ্ট জনপ্রিয়, কিন্তু কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট নয়।

কারুণ্যরসের ন্যায় অন্যান্য ভাব বা রস সুলভ এবং প্রচুর নহে। পাঠকের চিত্তে সহজেই পরিপূর্ণতা লাভ করে না বলিয়াই তাহারা কারুণ্য অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। বরং সরলতা ও প্রাচুর্যের যে অনিবার্য ফল, তাহা কারুণ্যরসের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে—উচ্চ শ্রেণীর কবিরা ঐ রসের প্রতি অনেকটা উদাসীন হইয়া পড়িয়াছেন। তাই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমে'র মত চমৎকার গ্রন্থেরও ভক্ত অনেক কমিয়া আসিয়াছে। করুণরস বিগলিত হইয়া অশ্রুতে ঝরিয়া পড়ে, উহা তরল অগভীর—সাময়িক উত্তেজনা প্রসূত এবং অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী, উহা মানব-জীবনের গভীরতম প্রদেশে স্থায়ী আসন লাভ করে না—মানব-চিত্তের অঙ্গীভূত হইতে পারে না। আনন্দ মানব-চিত্তের সাধনার ধন, পরম কাম্য—মানব-চিত্তের সিংহাসনই তাহার লক্ষ্য, বেদনা তাহার অরাতি—প্রতিদ্বন্দ্বী, তাহাকে সে তাই চিত্তে স্থায়িভাবে বাস করিতে দেয় না। কারুণ্য যত বশীভূতই হউক, তাহাকে সে সন্দেহ করে, সে জন্য যত শীঘ্র তাহাকে চিত্ত হইতে দূর করিতে পারে, ততই সে নিশ্চিন্ত হয়। তাহা ছাড়া এত বেশী ব্যথা-দুঃখের সহিত তাহার নিত্য সংগ্রাম করিতে হয় যে, নূতন কোনও ব্যথা সত্যই হউক আর কাল্পনিকই হউক, তাহার রাজ্যে প্রবেশ করিলে তাহাকে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে দেয় না। তরল অগভীর সাময়িক হাস্য-ফেনিল উল্লাসেরও চিত্তে স্থায়ী আসন নাই। যে আনন্দ চিত্তে স্থায়ী, নিশ্চিত, ধ্রুব আসন প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তাহা সংযত চিন্তাময় ও গভীর,—তাহা উচ্ছৃঙ্খল, চপল, অসহিষ্ণু ও প্রমত্ত উল্লাসকে চিত্তে স্থান দেয় না, স্থান দিলে তাহার নিবিষ্ট সাধনায় ব্যাঘাত ঘটে। তাই কান্নার গান ও হাসির গান উভয়েরই সুধীচিত্তে স্থায়িত্বলাভ সম্বন্ধে একই অবস্থা।

তাই বলিয়া যে উহাদের প্রয়োজন নাই, তাহা বলিতেছি না। আমাদের গভীর চিন্ময় মূল জীবনধারার উপরের স্তরে আমাদের দৈনিক ও প্রাহরিক জীবনের উপধারা আছে। তাহার কতকগুলি বাহির হইতে ঐরূপ হাসি-কান্নার যোগান না পাইলে শুকাইয়া যাইবে। তখন আমাদের দৈনিক জীবন নীরস ও কঙ্কালময় হইয়া উঠিবে। সে জন্য কারুণ্য ও কৌতুকরসের প্রয়োজনীয়তা যথেষ্টই আছে। কিন্তু যে সকল ভাবরস গভীর ও নিবিড়, ফল্গুধারার ন্যায় হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে যাহাদের নিভৃত প্রবাহ, তাহা সুলভ নয়, প্রচুরও নয়; বাহির হতে তাহাদের যোগান আমাদের চিন্ময় জীবনগঠনে সাহায্য করে, সহজেই তাহা চিন্ময় জীবনের অঙ্গীভূত হইয়া আমাদের চিত্তে স্থায়িত্ব লাভ করে, গভীর আনন্দের রাজ্যবিস্তারে তাহার সাহায্য করে। সে সকল কবিতা এই অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে অবলম্বন করিয়া রচিত, তাহারা তাই উচ্চশ্রেণীর। ঐ সকল কবিতার পাঠক অল্প, কিন্তু উহাদের আয়ুষ্কালও অতি

সুদীর্ঘ, এমন কি চিরন্তন; কাজেই নিরবধি কালে ও বিপুলা পৃথ্বীতে সমানধর্মা নিতান্ত অল্প জুটে না, এবং পাঠকসংখ্যা অল্প হইলেও তাহাদের জীবনগঠনের উপাদান কিন্তু ঐ কবিতাগুলি। শুধু নিবিড়তা ও গভীরতার প্রাপ্য লাভ করিয়াই উহারা বিজয়ী নহে—দুর্লভতা ও স্বল্পতার যে প্রাপ্য, তাহাও তাহারা লাভ করে। কারুণ্য কাব্যসরস্বতীর নয়নে ফুটিয়া মুক্তার সহিত উপমিত হইয়া ঝরিয়া পড়ে—শ্রীও বাড়ায়, কিন্তু ঐ নিবিড় রস গজমৌক্তিকের মত চিরদিন তাঁহার কণ্ঠের হারে স্থান পাইয়া বক্ষেই বিরাজ করে।

করুণ রসের কবিতা যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর হইতে পারে না, এ কথা বলিতেছি না। আমার বক্তব্য, কেবলমাত্র কারুণ্যের বলেই কোন কবিতা শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। কারুণ্যকে আশ্রয় করিয়া কাব্যের অন্যান্য উপাদানের সমবায়ে অনেক প্রথম শ্রেণীর রচনাই সম্ভব হইয়াছে। কারুণ্যের অন্তরালে একটি উচ্চতর রসের ও গভীরতর ভাবের সমাবেশ করিয়াও অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম হইয়াছে। কারুণ্যের উচ্ছ্বাসকে সৌন্দর্যসৃষ্টির অপরাপর উপাদান বা গভীরতর অনুভূতি সেগুলিকে সংযত, সংহত ও শৃঙ্খলিত করিয়াছে। বাধাবন্ধহীন অবল্গিত কলাসৌষ্ঠবহীন করুণ রসোচ্ছ্বাস কেবলমাত্র পাঠকের সহজ সরল সহানুভূতির বলে ও আনুকূল্যে শ্রেষ্ঠ কবিতার গৌরব লাভ করিতে পারে না।

কালিদাসের অজবিলাপ, রতিবিলাপ ও যক্ষবিলাপ কেবল যদি করুণরসের উচ্ছ্বাসমাত্র হইত, তবে বিলাপমাত্র হইয়া এত দিনে বিলোপ পাইত, রসালাপ হইয়া উঠিত না। মহাকবি পাঠকের করুণার ভিখারী নহেন, পাঠকের চোখে সুলভ অশ্রু ঝরাইয়া সহজে কৃতিত্ব লাভ করিতে চাহেন না, তাঁহার উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি, শোককে অবলম্বন করিয়া সরস সুন্দর শ্লোকরচনা। ঐ সকল কাব্যাংশে এমন অনেক কথাই আছে, যাহা সাধারণ বিলাপের পক্ষে স্বাভাবিক নহে, কাব্যের অন্যান্য সৌষ্ঠবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পদে পদে কবি কারুশৃঙ্খলার দ্বারা উচ্ছ্বাসকে সংযত করিয়া সাধারণ বিলাপ হইতে স্বাতন্ত্র্য দান করিয়াছেন, তাই ঐগুলি কাব্যের বিলাপ হইয়াও অমরতা লাভ করিয়াছে। উহাদিগকে স্বাভাবিক করিয়া তুলিতে হইলে, সাধারণ বিলাপকারীর ন্যায় অনেক অসংবদ্ধ অসন্নদ্ধ কথা বলাইতে হইত, আরও করুণ করিয়া তুলিতে হইত। কিন্তু তাহাতে কাব্য হইত না। কাব্যের স্বভাব আর প্রাকৃত জনের স্বভাব এক নহে, প্রাকৃত জনের স্বভাব অনুকরণ করিতে হইলে কাব্যের স্বাভাবিকতা নষ্ট হইয়া যাইত।

"সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো

কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্য এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এ স্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কাজ করিতে পারে না। এই প্রত্যক্ষতার অভাববশতঃ সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কলবল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়াছে" (রবীন্দ্রনাথ)।

ঐ 'ছন্দোবন্ধ ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কলবল' সম্পূর্ণাঙ্গ না হইলে উৎকৃষ্ট কবিতা হইবে না। করুণরসের কবি অনেক সময় এ সত্যটি লক্ষ্য করেন না, অতিরিক্ত অশ্রুপাতনের লোভে প্রাকৃত শোকের স্বাভাবিক অনুকরণ করেন,—সরলহৃদয় পাঠকগণ অশ্রুপাতের প্রাচুর্যের পরিমাণ অনুসারে কাব্যের চমৎকারিতা নির্ধারণ করেন। সাহিত্যের সত্য কৃত্রিমতাকে উপেক্ষা করে না, প্রকৃত কবি তাই করুণরসাশ্রিত কবিতার কারুণ্যকে উচ্ছ্বাসময় ও ব্যক্তিগত করিয়া তুলেন না, কারুকৌশলের সাহায্যে তাহাকে বিশ্বজনীন, রহস্যময় ও শান্তরসের সান্ত্বনাবারি বর্ষণে সংযত সংহত করিয়া তুলেন, প্রাকৃত শোকদুঃখের স্বাভাবিক অভিব্যক্তির স্থলে তাঁহারা ব্যঞ্জনার কৌশল প্রয়োগ করেন, হাহাকার হা-হুতাশকে প্রশ্রয় না দিয়া ইঙ্গিত ও মিতবচনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অশ্রু তাহাতে বহির্মুখী না হইয়া অন্তর্মুখী হয়, তাঁহাদের কবিতাপাঠে এক বিন্দু অশ্রুও বহির্গত না হইতে পারে, সমস্তটুকুই ভিতরদিকে গড়াইয়া মর্মকোষকে সিক্ত করিয়া তুলে। কবির কথায় বলিতে গেলে, এ ভাবকে Too deep for tears বলা যাইতে পারে এবং এ ভাব কেবল কারুণ্যে কেন, একটি তুচ্ছতম ফুল, একটি ধূলিকণা, মানুষের কৃতজ্ঞতা, ভগবানের মহিমা, প্রকৃতির শোভা-বৈচিত্র্য দর্শনেও জাগিতে পারে। নাট্যাভিনয়ে ও যাত্রার গীতাভিনয়ে প্রাকৃত দুঃখেরই অনুকরণ চলে, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দ কাঁদিয়া আকুল হয়, কিন্তু যে রচনা অবলম্বন করিয়া এই অশ্রুবন্যার সৃষ্টি হয়, তাহাকে সুধীগণ সৎকাব্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য করেন না। সে জন্য তাঁহাদের অভিমন্যু-বিলাপ, সীতার বনবাস, গান্ধারীর খেদ অপেক্ষা মাইকেলের সীতা-সরমার উপাখ্যান, অক্ষয়কুমারের এষা, চন্দ্রশেখরের উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম এবং রবীন্দ্রনাথের বিদায় অভিশাপ ইত্যাদি রসসংযত ভাবসংযত রচনা কারুণ্যময় কাব্যের হিসাবে উৎকৃষ্টতর। ভবভূতির উত্তরচরিতের স্থানে স্থানে ও কালিদাসের শকুন্তলা-বিদায়ের চতুর্থ অঙ্কে করুণরসাত্মক অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য সম্ভব হইয়াছে। এই দুই ক্ষেত্রে কারুণ্যরসের অন্তরালে একটি গভীরতর অনুভূতি ও নিবিড়তর রস প্রচ্ছন্ন আছে, তদ্ব্যতীত কাব্যের অন্যান্য উপাদানও

শোভনাঙ্গ লাভ করিয়াছে। কেবলমাত্র কারুণ্যের জন্যই উহা এত উৎকৃষ্ট নয়, কারুণ্যও যাহা আছে, তাহা এমনই সংযত, ধীর ও উদার যে, হৃদয়কে উদ্বেল ফেনিল করিয়া তুলে না, বরং প্রশান্ত ও প্রসন্ন করে।

রবীন্দ্রনাথের চিত্তে যে কারুণ্য ছিল, তাহাকে প্রশ্রয় দিলে তিনি দেশকে কাঁদাইয়া ভাসাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার মধ্যে যে কৌতুকরস আছে, তাহার বন্যা মুক্ত করিলে দেশকে হাসাইয়া মাৎ করিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা হইলে এত বড় কবি হইতে পারিতেন না। রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি করুণ-রসাত্মকই নয়, করুণরস অপেক্ষা অধিকতর স্থায়ী, গভীর ও নিবিড় রসে অভিষিক্ত। তাঁহার মধ্যম শ্রেণীর অনেক কবিতায় কারুণ্য সংযতবেগ হইয়া ফল্গুর মত প্রবাহিত। কবি ধনীর দুয়ারে কাঙালিনীকে অনেকক্ষণ করুণ বিলাপ করাইতে পারিতেন, অদৃষ্টকে অনেক ধিক্কার দেওয়াইতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে তাহার ম্লান মুখখানি চিরদিনের জন্য আমাদের মনে থাকিয়া যাইত না। কারুণ্যের তারল্যকে নিবিড় করিয়া দিয়া শেষ করিয়াছেন, 'মাতৃহারা মা যদি না পায়, তবে আজ কিসের উৎসব, তবে মিছে সহকার-শাখা তবে মিছে মঙ্গল-কলস।'

'পুরাতন ভৃত্য' একটি কৌতুকাবহ কবিতা, কারুণ্যে শেষ হইয়াছে। যেখানে কারুণ্য আরম্ভ হইল, কবিও সেইখানেই শেষ করিলেন। 'দুই বিঘা জমি'কে উচ্চ শ্রেণীর কবিতায় পরিণত করিবার জন্য তাহার সুলভ ও সহজ কারুণ্যকে মাঝে মাঝে রসান্তরের রশ্মিতে সংযত করিয়াছেন। এ কারুণ্য আমাদের কাঁদায় না, আমাদিগকে ভাবায়, গভীরতর ভাবে আবিষ্ট করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণে' ও 'লোকালয়ে'র অধিকাংশ কবিতা, পতিতা, বধূ, গানভঙ্গ, যেতে নাহি দিব, দেবতার গ্রাস ইত্যাদি কবিতায় কারুণ্যের সহিত কাব্যের উপকরণগুলি পূরামাত্রায় আছে বলিয়া এগুলি এত সুন্দর। কেবলমাত্র অশ্রুদ্গমই ইহাদের উদ্দেশ্য নহে, অন্যান্য গভীর ও নিবিড় অনুভূতির কবিতা পাঠকের চিত্তে যে আন্দোলন ঘটায়, এগুলিও তাহাই। জীবনের এক-একটি সমস্যা ইহার সঙ্গে বিজড়িত ; পাঠকচিত্তকে কারুণ্যময় আহ্বানে সেই সকল সমস্যার দিকে লইয়া যায়। করুণ বলিয়াই এত সুন্দর নহে, ভাবঘন বলিয়া এত সুন্দর। দর্শনেন্দ্রিয়কে বাষ্পাকুল করে বলিয়া এত মধুর নয়, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি জাগায় বলিয়া এত মধুর। তাঁহার করুণ কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য তাঁহার কথাতেই বলা যাইতে পারে,—

"করুণ চক্ষু মেলে ইহার মর্মপানে চাও,
এই যে মুদে আছে লাজে, পড়বে তুমি এরি ভাঁজে,
জীবনমৃত্যু রৌদ্র-ছায়া ঝটিকার বারতা।"

ধর্ম ও সাহিত্য

আমরা যদি চর্যাপদ হইতে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বঙ্গসাহিত্য লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব—এই সাহিত্য হিন্দুধর্মের বিবিধ শাখায় পুষ্পিত। অন্য দেশের সাহিত্য দেশের ধর্মকে এত নিবিড় ভাবে আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। বঙ্গসাহিত্যের অবশ্য ইহা যে গুণ তাহা আমি বলি না। গুণই হউক আর দোষই হউক, বঙ্গসাহিত্যের প্রধান উপজীব্য দেশের ধর্ম। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের শ্রেণী-বিভাগ করিতে গেলেই আমাদিগকে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের নামে বিভাগ করিতে হয়। (১) বৌদ্ধ সাহিত্য (২) বৈষ্ণব সাহিত্য (৩) শাক্ত সাহিত্য (৪) শৈব সাহিত্য। ইহার বাহিরে যাহা পড়ে—তাহা সামান্যই। তাহাকে Secular বা Unorthodox সাহিত্য বলা হয়। ইহার প্রধান অংশ পূর্ববঙ্গ-গীতিকা।

চর্যাপদ হইতেই বঙ্গসাহিত্যের সূত্রপাত। ইহা বৌদ্ধ সাহিত্য। নাথ সাহিত্য, গোপীচাঁদের গান, শূন্য পুরাণ ও ধর্মমঙ্গলও বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। ইহাতে পৌত্তলিকতা নাই, কিন্তু গুরুবাদ আছে, বৌদ্ধ সাধন-ভজনের কথা আছে, মন্ত্রতন্ত্রের শক্তির কথা আছে—আত্মনিগ্রহবাদ আছে—দেবদেবীর পদবী নিম্নতর হইলেও তাহাদের কথা আছে।

সমগ্র পদাবলী সাহিত্য বৈষ্ণব সাহিত্য। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার বর্ণনা আছে। অন্য ধর্মের লোকের চোখে হয়তো এ সাহিত্য কুরুচিপূর্ণ এবং অশ্লীল ; তবু সাহিত্য তো। আমাদের দেশে ধর্ম হইতে বিযুক্ত করিয়া এ সাহিত্যকে দেখা হয় নাই। চরিত-সাহিত্যও বৈষ্ণব সাহিত্য। চরিত-সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে ভগবানের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে।

মঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, কালিকামঙ্গল এইগুলি শাক্ত সাহিত্য। এ সাহিত্য লৌকিক ধর্মের দ্বারা আবিষ্ট। আগমনী-বিজয়ার গানও শাক্ত সাহিত্য। বাঙ্গালীর দুর্গোৎসবের সহিত এ গান জড়িত—কাজেই ইহাতেও পৌত্তলিকতার প্রভাব আছে।

গম্ভীরা গান, শিবায়ন, গাজনের গান ইত্যাদি শৈব সাহিত্য। ইহাতে ভগবানকে আত্মভোলা নেশাখোর পাগলের রূপ দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন অনুবাদ সাহিত্য বলিতে আমরা প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ বুঝি ; কাজেই এইগুলি হিন্দুর পুরাণ ও ধর্মপুস্তকের অনুবাদ। বাঙ্গালার সঙ্গীত-সাহিত্য

শিব, শ্রীকৃষ্ণ, দুর্গা ইত্যাদি দেবদেবীর মহিমা অবলম্বনে রচিত। যাত্রা ও পাঁচালীর গানগুলি পুরাণ অবলম্বনে রচিত।

ইংরাজ অধিকারের পর যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইল—তাহাও হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র বা পুরাণ সাহিত্য হইতেই উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত একেশ্বরবাদী হিন্দু ছিলেন, তাঁহারও ধর্মমূলক কবিতা অনেক। মাইকেলের রচনায় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ তাহার উপকরণ রামায়ণ ও মহাভারত হইতে সংগৃহীত। তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য বৈষ্ণব কবিদের অনুস্মৃতি। মাইকেল খ্রীষ্টান ছিলেন—কিন্তু ইউরোপীয় শিক্ষাদীক্ষার গুণে তিনি বুঝিয়াছিলেন—সাহিত্যের সঙ্গে ধর্মমতের কোন সম্পর্ক নাই। রস আগে—ধর্মমত পরে। তাই রসসৃষ্টির জন্য তিনি হিন্দু আদর্শেরও গুণগান করিতে পারিয়াছিলেন।

রঙ্গলাল পুরাণাদি হইতে সাহিত্যের উপকরণ গ্রহণ করেন নাই, প্রধানতঃ রাজস্থানের ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু নরনারীর উচ্চাদর্শ-প্রতিষ্ঠাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার পুরাণ অবলম্বনে রচিত। দশমহাবিদ্যায় তিনি পৌত্তলিক হিন্দু ধর্মকে প্রাধান্য দান করিয়াছেন। অন্যান্য অধিকাংশ কবিতায় তিনি হিন্দু আদর্শের জয় গান করিয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের প্রধান অবদান—শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের সার্বভৌমতা ও পূর্ণাদর্শ লইয়া রচিত তিনখানি কাব্য। অন্যতর শ্রেষ্ঠ কাব্য পলাসীর যুদ্ধের সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক নাই। নবীনচন্দ্র প্রধানতঃ ধর্মক্ষেত্রের কবি।

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে হিন্দুমুসলমানের দ্বন্দ্ব দেখাইয়াছেন—তাহাতে সংস্কৃতিগত দ্বন্দ্বও আছে—রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্বও আছে। ইহা ছাড়া, তাঁহার রচনা হিন্দু ভাবাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। প্রবন্ধাদিতে তিনি হিন্দু সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা এমন কি সার্বভৌমতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছেন। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ইত্যাদি উপন্যাস ধর্মমূলক। তাঁহার অধিকাংশ প্রবন্ধ হিন্দুধর্মমূলক। কৃষ্ণচরিত্র তো রীতিমত ধর্মপুস্তক।

রবীন্দ্রনাথের বহু রচনার উপাদান হিন্দুর উপনিষদ, পুরাণ ও প্রাচীন সাহিত্য হইতে সংগৃহীত। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁহার রচনায় ওতপ্রোত। বিশ্বপ্রকৃতির লীলায় তিনি শিবরুদ্রের লীলাই দেখিয়াছেন। তাহা ছাড়া হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান পূজোপচার তাঁহার রচনার উপাদান উপকরণ হইয়াছে।

শরৎচন্দ্রের রচনায় হিন্দু সংসারের পুণ্যানুষ্ঠানের পরিবেষ্টনী প্রায় সর্বত্র—হিন্দুর

নিষ্ঠাবতী রমণীর চিত্র তাঁহার বহু উপন্যাসে। পতিতা সাবিত্রী পর্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী।

এখন আমাদের বক্তব্য—এই তো বঙ্গসাহিত্য। এখনও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে এই সাহিত্যের অবাধ না হইলেও প্রবেশাধিকার আছে। এই সাহিত্যের মধ্য দিয়াই আমাদের দেশের ছাত্রগণ জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় পায়, জাতীয় আদর্শে দীক্ষা লাভ করে এবং সাহিত্যরসের আস্বাদ পায়। বালকগণের চিত্তগঠনে এই সাহিত্যই সহায়তা করে।

সাহিত্যকে তাহার নিজস্ব মূল্য-মর্যাদার আদর্শে বিচার করিলে কোন গোল নাই। সাহিত্য যে কোন ধর্মমত, যে কোন ধর্মপুস্তক, যে কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মাদর্শকে অবলম্বন করুক না কেন যদি তাহা রসোত্তীর্ণ হয়—তবে বিদ্বৎসমাজ—বিশেষতঃ রসিকসমাজ কখনও তাহাকে অপাংক্তেয় মনে করেন না,—তাঁহারা সাহিত্যের উপাদান উপকরণ বা বহিরঙ্গের জাতিবিচার করেন না—তাঁহারা সাহিত্যের ভাব ও রসের কথাই ভাবেন। খ্রীষ্টান মাইকেলের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুলতান হোসেন শাহ, তৎপুত্র নসরৎ শাহ, তাঁহার অমাত্য পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ ইত্যাদি সাহিত্যের অভিভাবকগণ সাহিত্যকে ঐরূপ বিদগ্ধ জনের চোখেই দেখিতেন—তাই বঙ্গসাহিত্যের একটা অঙ্গ পরিপুষ্ট হইতে পারিয়াছিল।

যে সকল অহিন্দু লেখক যুগে যুগে হিন্দুর পুরাণাদি লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন তাঁহারা কোন দিন ভাবেন নাই—ইহাতে তাঁহাদের নিজস্ব ধর্মনিষ্ঠার কোন হানি হইতেছে। সাহিত্যের রাজ্য রসের রাজ্য—অলৌকিক রাজ্য। এরাজ্যে কোন লৌকিক ধর্মমতের সঙ্গে সাহিত্যের কোন দ্বন্দ্ব নাই। সাহিত্যের দেবদেবী এবং পৌরাণিক চরিত্রগুলি Symbol মাত্র, তাহাদের Idea ও Idealকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এই রাজ্যে দান্তে, মিলটন, নাস্তিক শেলি, বায়রন, ধর্মভীরু কুপার, সাদী, হাফেজ, ওমার খৈয়াম, চণ্ডীদাস ইত্যাদি কবিগণ—সকলেই এক গোষ্ঠীর সন্তান—সগোত্র।

বিশিষ্ট ধর্মতন্ত্র, পৌত্তলিকতা, নাস্তিকতা, সাকারবাদ ইত্যাদির অজুহাতে যদি বঙ্গসাহিত্য অপাঠ্য হইয়া উঠে—তবে প্রাচীন সাহিত্যের নামে থাকিবে—পূর্ববঙ্গ-গীতিকার কতক অংশ আর বর্তমান যুগের সাহিত্যের মধ্যে থাকিবে কতকগুলি উদীয়মান লেখকদের রাচত সাহিত্য। বর্তমান লেখকগণের অনেকেই যতদূর সম্ভব ধর্ম, দেশ, জাতীয় সংস্কৃতি, দেবদেবী, হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান এমনকি ভগবানকেও বর্জন করিয়া চলেন। হিন্দু সংস্কৃতির নামগন্ধও তাঁহাদের রচনায় নাই। ধর্ম-

নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এক হিসাবে এ সাহিত্য অতি নিরাপদ। ধর্মের বা ধর্মগ্রন্থের গন্ধ থাকিলেই যদি সাহিত্য বর্জনীয় হয় তাহা হইলে ভারতচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র সকল চন্দ্রই অর্ধচন্দ্র লাভ করিবেন। এ আশঙ্কা ভিত্তিহীন নয়। কারণ, এইদিকে একটা প্রবণতা ইতিপূর্বেই গ্রন্থাদি বিচারে দৃষ্ট হইতেছে।

যে কালচার থাকিলে যে কোন জাতি যে কোন দেশ যে কোন ভাষার সাহিত্য উপভোগ্য হয়, সেই কালচারের গুণে এ দেশের সাহিত্য কেন উপভোগ্য হইবে না? যাঁহাদের নিকট ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তুর নামগন্ধ থাকিলেই সাহিত্য সেকেলে বলিয়া বর্জিত হয়—তাঁহাদের কালচার সম্যক এবং সম্পূর্ণাঙ্গ নয়। হিন্দুর প্রাচীন সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া যদি কিছু সৃষ্টি করা হয়. তবে তাহাকে মৌলিক সাহিত্যের সমান মর্যাদা দেওয়াই উচিত। অবশ্য বর্তমান কালের ভাষায় পুনরাবৃত্তি মাত্র সাহিত্য নয়। যেমন—রাধাকৃষ্ণকে প্রণয়ীপ্রণয়িনী কল্পনা করিয়া কবিতা লিখিলেই বৈষ্ণব সাহিত্য হয় না বা বৈষ্ণবপদাবলীর পুনরাবৃত্তি হয় না। ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীকে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্য মনে করি না—মৌলিক Experimentই মনে করি। দ্বিজেন্দ্রলালের Lyrics of Indএর রাধার প্রতি কৃষ্ণ এবং তাহার অনুবাদকে মৌলিক প্রেম-কবিতাই মনে করি। এই শ্রেণীর প্রেম-কবিতায় নূতন আকৃতি আছে কিনা দেখিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ধর্মমূলক কবিতা-সংগ্রহ বলিয়া ইউরোপেও অনাদৃত হয় নাই।

উপাদান যাহাই হউক—রসসৃষ্টি হইলেই উৎকৃষ্ট সাহিত্যের মর্যাদা লাভ করে। ডাইনী, পরী, ভূত ও এরিয়েলের মত অশরীরী আত্মার সাহায্যেও শেক্সপীয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

সকল দেশে ধর্মপুস্তক চিরকাল উৎকৃষ্ট সাহিত্যের উপাদান যোগাইয়াছে। ধর্ম সাহিত্যের একটা বড় উপাদান। এই উপাদানকে আবর্জনা বলিয়া দূর করিলে সাহিত্যের যে কত বড় ক্ষতি হইবে ধর্মবিমুখ—বঙ্কিমের ভাষায় কৃতবিদ্য কুলাঙ্গাররা তাহা বুঝিবেন না।

প্রবন্ধের যুগ

উনবিংশ শতাব্দীতে এমন কি আমাদের যৌবনকালে, লোকে বাংলা প্রবন্ধ যত্ন-সহকারে খোঁজ করিয়া পড়িত, আর পড়িত ইংরাজী খবরের কাগজ এবং ইংরেজীতে লেখা গল্প-উপন্যাস। বাংলা গল্প-উপন্যাসের এতটা প্রাদুর্ভাব তখন হয় নাই। বাংলা প্রবন্ধের সেকালে বেশ চাহিদা ছিল। সেকালের মাসিকপত্রগুলি প্রধানতঃ প্রবন্ধ প্রকাশের জন্যই প্রবর্তিত হইত। মাসিকপত্রগুলির তাগিদেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রবন্ধ রচিত হইত। এখন যেমন গল্প-উপন্যাসের লেখকরাই সাহিত্যরথী বলিয়া গণ্য হন—সেকালে তেমনি প্রবন্ধ-লেখকরাই সাহিত্যরথী বলিয়া গণ্য হইতেন। আমাদের সময়ে—পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, শশাঙ্কমোহন সেন, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, অমূল্য বিদ্যাভূষণ, রামপ্রাণ গুপ্ত, রমাপ্রসাদ চন্দ ইত্যাদি প্রবন্ধকাররাই সাহিত্যরথীর মর্যাদা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও কাহারও প্রবন্ধ ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় কিছু কিছু দান ছিল; কিন্তু সেগুলিকে ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য করা হইত না। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কেবল কবিতা গল্প গানে তুষ্ট হন নাই—তিনি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন রাশিরাশি। প্রবন্ধ না লিখিলে সাহিত্যসেবা সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না বলিয়াই তিনি মনে করিতেন।

ইহাদের আগেকার যুগ তো রীতিমত প্রবন্ধেরই যুগ—সে যুগেও প্রবন্ধ-কাররাই ছিলেন সাহিত্যরথী। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন ও প্রচারের বঙ্কিমচন্দ্র, আচার্য অক্ষয়চন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুপ্ত ইত্যাদি প্রবন্ধকাররাই ছিলেন সাহিত্যরথী।

সেকালের ইংরেজি-শিক্ষিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত লেখকেরা তাঁহাদের বহু শ্রমে অর্জিত বিদ্যাকে দেশের লোকের মধ্যে প্রচার করিতে চাহিতেন এবং লোক-শিক্ষাদানকেই পবিত্র সাহিত্যকৃত্য বলিয়া মনে করিতেন। ইহাকেই তাঁহারা ভাবিতেন সারস্বত ঋণপরিশোধ। এখনকার সাহিত্যিকরা পাঠকদের আনন্দ ও প্রমোদ পরিবেশন করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে চান। তখনকার সাহিত্যিকরা

দেশের লোকের মানসিক উৎকর্ষ সাধন করিতে চাহিতেন।

সেকালের স্কুল কলেজের সাহায্যে খুব অল্পসংখ্যক লোককেই সুশিক্ষিত করিয়া তোলা সম্ভব হইত। দেশের জ্ঞানগুরুগণ তাঁহাদের অধীতবিদ্যা প্রবন্ধাকারে প্রচার করিয়া অল্পশিক্ষিত লোকদের শিক্ষাকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিতে চাহিতেন। সেকালের প্রকাশকরাও প্রবন্ধের বই প্রকাশ করিত।

তারপর দেশে তথাকথিত শিক্ষার বহুল প্রচার হইল। প্রবন্ধকাররা হয়তো মনে করিলেন, আমরা ডিগ্রী পাইয়া কৃতবিদ্য হইয়াছি, শ্রমস্বীকার করিয়া আর কিছু পড়িবার কী প্রয়োজন? প্রকৃতপক্ষে ছাত্রেরা গত চল্লিশ বছর যে শিক্ষা পাইতে থাকিল, তাহাতে জ্ঞানগর্ভ বিষয়ের প্রতি তাহাদের অনুরাগ জন্মিল না। দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্রগণ ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার ও সরকারী চাকুরিয়া হইয়া গেল, তাঁহাদের আর পড়াশুনা করিবার অবসরই থাকিল কম। অন্যান্য ছাত্রদের আর পূর্বের মত শ্রম স্বীকার করিয়া একনিষ্ঠ অধ্যবসায়ের সঙ্গে পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা পাশ করিতে হইল না। তাহার ফলে তাহাদের শ্রম স্বীকার করিয়া কিছু পড়িবার অভ্যাসই হইল না। ফলে তাহাদের কাছে ইংরেজী নভেল পড়াও ক্লেশকর বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তারা দুটো লঘু তরল পাঠ্যবস্তু পাইয়া গেল—বাংলা দৈনিকপত্র ও বহু গল্প-উপন্যাস। দৈনিক পত্রের রবিবারের সংখ্যায় কিন্তু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকিল। কিন্তু তাহার তো আয়ু এক দিনের। কাজেই তাহাতে চোখ বুলানোই চলে—সহজপাঠ্য লেখাগুলোই পড়া সম্ভব হয়। আমি সাধারণভাবেই এই কথাগুলো বলিলাম—তাই বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন একালের শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কাহারও জ্ঞানানুরাগ নাই। আমার বক্তব্য খুব কম শিক্ষিত লোকেরই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জ্ঞানবৃদ্ধির বা চিত্তোন্নতি সাধনের প্রবৃত্তি আছে। আর একথাও বলিতে হয়—এযুগে জীবনসংগ্রাম এতই কঠোর এবং লোকের অবসর এতই কম যে, ইচ্ছা থাকিলেও ক্লেশ স্বীকার করিয়া যাহা পড়িতে হয়, তাহা পড়া অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। মোট কথা প্রবন্ধের চাহিদা পাঠকগণের পক্ষ হইতে নাই—তাহা থাকিলে সে চাহিদার ফল প্রকাশকের কাজে ও সাময়িক পত্রিকায় সঞ্চারিত হইত।

আগেকার মাসিকপত্রগুলিতে প্রবন্ধেরই প্রাধান্য থাকিত। কারণ সেগুলি ব্যবসায় হিসাবে পরিচালিত হইত না। সেগুলি চালাইবার জন্য কেহ না কেহ ঘর হইতে টাকা খরচ করিতেন। সবুজ পত্র, নারায়ণ, বঙ্গবাণী ইত্যাদি পত্রিকাই ঐ শ্রেণীর পত্রিকার শেষগোষ্ঠী। ব্যবসায় হিসাবে যে-সব পত্রিকা পরিচালিত

হইয়াছে সেগুলিতে অনেকটা বাধ্য হইয়া প্রবন্ধের স্থান সংকীর্ণ করিতে হইয়াছে। গ্রাহক যাহা চায়, তাহা দিতে না পারিলে কাগজ টিকাইয়া রাখা কঠিন।

অফিসের সাধারণ কর্মীরা এবং শহর ও গণ্ডগ্রামের বেকার যুবকেরা পাঠাগার গঠন করিয়া তুলিল অবসর বিনোদনেরই অঙ্গস্বরূপ। সেগুলিতে কথাসাহিত্য ছাড়া অন্যান্য শাখার বই সতর্কতার সঙ্গেই বর্জিত হইল। তাহাদেরই বা দোষ কী? তাহারা যদি পাঠাগারে একখানা প্রবন্ধের বই কিনে, তবে কেহ তাহা স্পর্শও করিবে না। বরং একখানা চৈতন্যভাগবত রাখিলেও দু-একজন বুড়ো মানুষ পড়িতে পারে।

পাঠাগারের চাহিদা নাই বলিয়াই প্রকাশকরা প্রবন্ধের বই ছাপিতে চান না।

মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ফলে বাংলা বইএর পাঠিকার সংখ্যা বাড়িয়াছে। পাঠিকাদের মধ্যে অল্প-শিক্ষিতার সংখ্যা বেশী এবং তাহাদের অধিকাংশই অন্তঃপুরিকা। ইহাদের কেহ গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য বই পড়ে না। ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের অনেক সময়ই ট্রেনে কাটাইতে হয়—তাহাদের হাতে উপন্যাসের বই-ই দেখিতে পাওয়া যায়। ট্রেনে-ট্রামে গল্প-উপন্যাস ছাড়া অন্য বই পড়াও চলে না।

পাঠাগারের সদস্য-সদস্যা, ডেলি-প্যাসেঞ্জার ও অন্তঃপুরিকাদের বাদ দিলে দেশে বাংলা বই-এর পাঠক-পাঠিকা খুব কমই অবশিষ্ট থাকে। প্রবন্ধের পাঠক-পাঠিকা ইহাদের মধ্যে নাই বলিলেই হয়।

বাংলা সাহিত্যের আলোচনামূলক প্রবন্ধের বই বাংলা এম এ ও অনার্স পরীক্ষার্থীরা পড়িতে বাধ্য হয়, সেজন্য এই শ্রেণীর বই আজকাল কিছু কিছু রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই শ্রেণীর অধিকাংশ বই ক্রীত হইলেও ভাষার জটিলতার জন্য পঠিত হয় না। তাহাছাড়া, প্রবন্ধে যে-সাহিত্যের আলোচনা থাকে, সে-সাহিত্য পড়া না থাকিলে আলোচনা পড়ায় বিশেষ সার্থকতা নেই। প্রবন্ধপাঠকের অভাব হওয়ার প্রধান কারণ, দেশের প্রচলিত শিক্ষা পল্লব-গ্রাহিতার স্তর অতিক্রম করিতেছে না এবং শিক্ষার্থীরা নোট মুখস্থ করিয়া পাশ করে বলিয়া তাহাদের জ্ঞানে অনুরাগ জন্মাইতেছে না। যাহাই হউক, বাঙালীর চিন্তাশক্তি ও মনীষা দেউলিয়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যাঁহারা প্রবন্ধ লিখিতে পারেন, তাঁহাদের জ্ঞানানুশীলনের ফল দেশকে দিতে পারেন—কিন্তু তাঁহারা কোনদিক হইতে উৎসাহ না পাইয়া লিখিতে চান না। প্রবন্ধ লেখা হইলে তাহা প্রকাশ করা সহজসাধ্য হয় না—প্রকাশিত হইলেও কেহ পড়িতে চায় না। এজন্য নিরুৎসাহ হইয়া সুপণ্ডিত লেখকেরা প্রবন্ধরচনায় প্রলুব্ধ হ'ন না। এমনও দেখা যাইতেছে কোন কোন সুপণ্ডিত

লেখক তৃতীয় শ্রেণীর গল্প উপন্যাস লিখেন, তবু প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধ লিখিতে চান না।

আমি জানি, অনেক অবসরপ্রাপ্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি প্রবন্ধের পুস্তক রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দপ্তরেই বাঁধা আছে, প্রকাশক পান নাই। কেহ কেহ নিজের খরচে পুস্তক ছাপিতেছেন, কিন্তু সে-পুস্তকের প্রচার হয় না। তাঁহারা লিখিতে জানেন কিন্তু প্রচার করিতে হয় কেমন করিয়া তাহা জানেন না। তাহা ছাড়া, সে বিষয়ে তাঁহাদের উদ্যমও নাই।

ধর্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনার ধারা অবশ্য বিলুপ্ত হয় নাই কারণ আট দশখানা ধর্মের পত্রিকা কেবল ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধই ছাপে। এই সব পত্রিকার ধর্ম-মূলক প্রবন্ধের চাহিদাও আছে। কিন্তু ঐ সকল প্রবন্ধ গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য ত প্রকাশক চাই। প্রকাশকরা সাধারণ পাঠকদের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই বই ছাপেন। ধর্মপিপাসুদের কথা চিন্তা করিয়া বই ছাপিতে সাহসী হন না।

আজকাল সাহিত্যপাঠকরা এমন কি কথাসাহিত্যকরাও প্রবন্ধকে সাহিত্য বলিয়া মনে করেন না। বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য আজও প্রবন্ধকেও সাহিত্যের মধ্যেই গণ্য করে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কয়টি প্রবন্ধ বা কয়খানি প্রবন্ধ-পুস্তককে পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিতে পারে ?

বাঙালীর মনীষা বা চিন্তাশীলতা একেবারে দেউলিয়া হইয়া যায় নাই—দেশের লোকের রুচিপ্রবৃত্তির পরিবর্তনের জন্য প্রবন্ধ অল্পই রচিত হয়! রচিত হইলেও প্রকাশিত হয় না, প্রকাশিত হইলেও প্রচারিত হয় না।

কবিতাপাঠের প্রয়োজনীয়তা

কবিতায় ছন্দ থাকে, মিল থাকে। মিল না থাকিলেও স্বরহিন্দোল বা রিদ্‌ম থাকে, সঙ্গীতের মাধুর্য থাকে, ললিত পদবিন্যাস থাকে, বাচন-চাতুর্য থাকে। এ সমস্ত কৈশোরযৌবনে যেমন উপভোগ্য, বয়ঃপ্রাবীণ্যে তেমন উপভোগ্য হয় না। কবিতায় হৃদয়াবেগের প্রাধান্য থাকে, তাহার মাধুর্য উপলব্ধির কালও কৈশোর-যৌবন। বয়োবৃদ্ধির সহিত সংসারের তিক্ত অভিজ্ঞতা ক্রমে হৃদয়কে কিণাঙ্ক-কঠোর করিয়া তুলে। তখন এই মাধুর্য আর উপভুক্ত হয় না, হৃদয়ের বিগলিত ভাবকে

দুর্বলতা বলিয়া মনে হয়। কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ও প্রকৃতির সহিত মানব-হৃদয়ের রসসংযোগ বাণীরূপ লাভ করে। এই প্রকৃতি কিশোর-যুবকদের চোখেই অপূর্ব, মোহন ও নবনবায়মান। বয়স বেশী হইলে প্রকৃতিও পুরাতন ও বৈচিত্র্যহীন হইয়া যায়, তাহার অপূর্বতা ও আকর্ষিকা শক্তি থাকে না। কবিতাপাঠের অনুকূল সময় কৈশোর-যৌবন কাল। স্বীকার করি, অনেকের অন্তর্জীবনে জরার অন্তরালেও যৌবন সজীব থাকিয়া যায়। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। একজন ইউরোপীয় মনীষী ছাত্রদের উদ্দেশে ঠিকই বলিয়াছেন—

"Youth is the season in which to learn to love poetry. If you do not care for it then, you will hardly do it later."

ছাত্রজীবন অতীত হইলে খুব কম লোকই কবিতা পড়ে। অনেকেরই ছাত্র-জীবনে পঠিত—এমন কি পাঠ্যপুস্তকে পঠিত—কবিতা কয়েকটিই সম্বল। পরবর্তী জীবনে লোকে সাধারণতঃ পড়ে বৈষয়িক নথিপত্র এবং কর্মক্লান্ত মনকে একটু বিশ্রাম, বিনোদন ও আনন্দদানের জন্য কথা-সাহিত্য। অল্প দুই-চারিজন জ্ঞানপিপাসু অবশ্য অনেক-কিছু পড়েন, তাঁহাদের কথা বলিতেছি না। ছাত্রজীবন ছাড়া যখন কেহ কবিতা পড়িতে চায় না—তখন ছাত্রদের যতগুলি সম্ভব সুরচিত কবিতা পড়িতে দেওয়া উচিত। এই কথায় কেহ কেহ হয়ত চমকাইয়া উঠিবেন এবং বলিবেন—পাঠ্য-পুস্তকে পরীক্ষার জন্য যে কবিতাগুলি থাকে, সেগুলিই ছাত্রছাত্রীরা অধিগত করিতে পারে না,—আবার তাহার সংখ্যাবৃদ্ধি ?

আমি পাঠ্যপুস্তকে কবিতার সংখ্যা বাড়াইতে বলিতেছি না, পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট কবিতার সংখ্যা বরং কমাইতেই বলি। পরীক্ষার জন্য কবিতা পড়িতে হয় বলিয়াই ছাত্রগণ কবিতার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। তাহারা মূল কবিতা না পড়িয়া নোট মুখস্থ করে এবং কবি ও কবিতাকে গালি দিতে থাকে। আমি পরীক্ষার তাগিদে কবিতা পাঠের কথা বলিতেছি না। তবে কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা (ইংরেজী ও বাংলা) মুখস্থ করা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত মনে করি।

উৎকৃষ্ট কবিতা (যেমন রবীন্দ্রনাথের) মুখস্থ রাখা কালচারের একটি অঙ্গ মনে করি। শিক্ষক ও অভিভাবকদের উচিত বাছা বাছা কতকগুলি কবিতা ছাত্রছাত্রীদের পাঠ করিতে এবং যতদূর সম্ভব মুখস্থ করিতে উৎসাহিত করা।

কবিতার আবৃত্তি বাধ্যতামূলক হইলেই ভাল হয়। প্রত্যেক মেয়েকে ইদানীং গান শিখানো হয়, প্রত্যেক ছেলেকে ত গান শিখানো হয় না। গানের অনুকল্পস্বরূপ ছেলেদের কবিতা আবৃত্তি করিতে শিখাইলে অন্যায় কি হয় ?

স্কুল-কলেজে ও পাঠাগারের বিশিষ্ট অনুষ্ঠানগুলিতে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা হয়। এই অনুষ্ঠানটি কালচারের দিক হইতে হিতকর। এইরূপ অনুষ্ঠানের সংখ্যা যত বাড়ে, ততই মঙ্গল। এইরূপ প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের পরিমাণ ও সংখ্যা বাড়াইয়া দেওয়া উচিত।

অনেক উৎকৃষ্ট কবিতার অর্থ ছাত্র-ছাত্রীগণ বিনা সহায়তায় বুঝে না। না বুঝিলেও সেগুলির স্বরধ্বনির একটা মূল্য আছে। এক্ষেত্রে আবৃত্তি 'বোধাদপি গরীয়সী।' এই শ্রেণীর কবিতার স্বরের রেশ মনের শ্রুতিতে থাকিয়া যায়—পরে একদিন উহাদের অর্থ পরিস্ফুট হয়—কোরকের বিকাশের মত। ছাত্রজীবনে বহু কবিতার সঙ্গে সামান্য পরিচয় মাত্র থাকিলেও সে-পরিচয় একদিন ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়।

ছাত্রছাত্রীদের ধীশক্তি যথেষ্টরূপ পরিপক্ক নয়—তাহাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও বেশী নয়, কিন্তু তাহাদের চিত্তফলক থাকে দর্পণের মত স্বচ্ছ, অমলিন ও অকলঙ্কিত। তাহাতে সহজে প্রতিবিম্বন হয় সুপরিস্ফুট। যেসব কবিতা হৃদয় দিয়া বুঝিতে হয় (মস্তিষ্ক দিয়া নয়), সেসব কবিতার রস তাহারা বয়ঃপ্রবীণদের চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ করে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই একথা বলিতেছি।

এখন কথা হইতে পারে, কবিতা ইহকালে পরকালে কী কাজে লাগিবে? যাঁহারা "সাহিত্যসঙ্গীতরসানভিজ্ঞ"—তাঁহাদের এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। তবু বলি, কবিতা শিক্ষা-সংস্কৃতির অঙ্গে লাবণ্য সঞ্চার করে। লাবণ্যের যদি কিছু মূল্য থাকে, তবে কবিতারও আছে। অফিসে আদালতে কারখানায় কবিতায় প্রয়োজন নাই। কবিতার প্রতি অনুরাগ জীবনকে সরস রাখে, মুখের ও লেখার ভাষাকে সরস করে, ধূসরতা দূর করিয়া মনোবৃত্তিগুলিকে সবুজ রঙে রাঙাইয়া দেয়, সুকুমার মনোবৃত্তিগুলিকে সজীব রাখে। কবিতা প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসিতে শিখায়। কার্লাইলের ভাষায় কবিতা Harmonious union of man with nature. অন্তর্জীবনের কন্দরে ইহা আনন্দের নূতন উৎসমুখ খুলিয়া দেয়। আদর্শ নাগরিক জীবনগঠনে ও চিত্তোৎকর্ষ সাধনে ইহার দান অসামান্য। ছাত্র-জীবনে যদি কাব্যানুরাগের উন্মেষ হয়, তবে জীবনে তাহা চিরসঙ্গী হইয়া অন্যান্য শিল্পকলার প্রতিও অনুরাগ বাড়াইয়া থাকে।

ইহাতে সাংসারিক বা বৈষয়িক লাভ নাই সত্য, কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক হইতে ইহাতে পরম লাভই হয়।

কবিতা পাঠ তাহার পাঠকের চিত্তশুদ্ধি ঘটায়, ক্ষণকালের জন্যও। বার বার

বিবিধ কবিতা পাঠের ফল তাহা হইতেই অনুমেয়। নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের এত বড় পরিপোষক আর নাই।

কবিতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যরথীদের কয়েকটি উক্তি তুলিয়া দিই—

কবি কীটস্ বলিয়াছেন,—

"Let us therefore deem the glorious art of poetry a kind of medicine divinely bestowed upon man."

শেলী বলিয়াছেন—

"Poetry is the record of the best and happiest mements of the happiest and best minds."

কবি সমালোচক ম্যাথিউ আর্নলড্ বলিয়াছেন,—

"Poetry is simply the most beautiful impressive and widely effective mode of saying things and hence its importance,"

এইসব হইল কবিদের উক্তি। কবিরা ত কবিতার জয়গান করিবেনই। গদ্য-সাহিত্যিকরাও কবিতার চিত্তোৎকর্ষিকা শক্তি স্বীকার করিয়াছেন—

বেকন বলিয়াছেন,—

"Poetry was ever thought to have some participation of divineness because it doth raise and erect the mind."

মিসেস জর্জ পিয়ার্স বলিয়াছেন,—

"Poetry is criticism of life in terms of beauty."

স্যামুয়েল জনসন (প্রধানত গদ্যশিল্পী) :—

"The essence of poetry is invention—such invention as, by producing something unexpected, surprises and delights."

জনসনের মতো (প্রধানত গদ্যশিল্পী) এমার্সন বলিয়াছেন,—

"Only that is poetry which cleanses and mans me...Poetry is only verity—the expression of a sound mind speaking after the ideal not after the apparent."

এইভাবে কবিতার মাহাত্ম্য মহিমা বুঝাইয়া কিশোর যুবকদের মনে কাব্যানু-রাগের সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। যেসব কবিতা শ্রুতিতর্পণ, যেসব কবিতায় সঙ্গীতের মাধুর্য আছে, যেসব কবিতায় ছন্দোহিন্দোল আছে, যেসব কবিতায় তরুণ মনের আবেগের প্রাধান্য আছে, যেসব কবিতা উদ্দীপনাময়ী, যেসব কবিতায় একটা

উপাখ্যান বা আখ্যায়িকার মেরুদণ্ড আছে, প্রাথমিক স্তরে সেই সব কবিতার সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটাইতে হইবে। পরীক্ষাবিভীষিকা না থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের উপভোগ্য হইবে। পরে ক্রমে ক্রমে ভাবগর্ভ ও রসাঢ্য কবিতাও তাহাদের উপভোগ্য হইবে। আরও পরে তাহারা আধুনিক যুগের কবিতারও রস গ্রহণ করিতে পারিবে। এজন্য ছাত্রজীবনের বিভিন্ন স্তরের জন্য বিভিন্ন কবিতা-সংকলন প্রকাশ করা চাই। প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দুই একজন কাব্যানুরাগী শিক্ষক থাকিলে ভাল হয়, তাহাদের হাতেই কবিতা পাঠ ও আবৃত্তির ভার দিতে হয়।

কবিতা বিশ্লেষণ

যে-সকল কাব্য-পাঠকেরা কাব্যের রস ও আনন্দকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিয়া কাব্যের মধ্যে লাভের বস্তুর সন্ধান করেন তাঁহারা কৃপার পাত্র। Di-electricকে Electroscope বা বিদ্যুৎমান হইতে পৃথক করিলে তাহাতে যেমন বিদ্যুৎ-প্রবাহের লক্ষণ পাওয়া যায় না, কাব্যের প্রত্যেক অংশকে পৃথক করিয়া দেখিলেও তেমনি রসের উপলব্ধি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনস্মৃতিতে বলিয়াছেন—"শৈশবে মরা মানুষ দেখিয়া তাঁহার চিত্তবিকার হইত না। কিন্তু সমগ্র দেহ হইতে বিযুক্ত একখানা হাত দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন!" কাব্যের সজীব আশ্রয় হইতে পৃথক করিয়া কোন জিনিসের মূল্য নিরূপণ, একটা কাটা অঙ্গের শারীরবিদ্যাগত বিশ্লেষণের ন্যায়। কবিতার ঐ ভাবে মূল্য সন্ধান করিতে গেলে ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থের কথায় তাহার হত্যা সাধন করা হয়—"We murder to dissect." রস-সাহিত্যের বাস্তব মূল্য বিচার—"Botanisation over mother's grave."

যাহা mechanical mixture তাহারি উপাদান পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে মিশ্রণটি বুঝার অসুবিধা হয় না—কিন্তু যাহা chemical compound তাহার উপাদানগুলিকে পৃথক পৃথক করিয়া দেখিলে সৃষ্ট বস্তুটিকে ঠিক বুঝা হয় না—কারণ এই-প্রকার মিশ্র পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের শক্তি-সমষ্টি হইতে সম্পূর্ণ একটি পৃথক শক্তি ও ধর্ম ধারণ করে, তাহা শুধু সমষ্টিতেই বর্তমান থাকে। কবিতারও তাই—ইহার সৌন্দর্য ইহার শব্দ এবং শব্দচিত্রাবলীর সমবায়েই। বিশ্লেষণ করিয়া

সৌন্দর্য উপভোগ করিতে যে যাইবে সে হতভাগ্য, সে রসোপভোগে বঞ্চিত হইবে।

যাঁহারা কবিতার রসসৃষ্টির মধ্যে নীতি বা বাস্তব কিছু লাভ প্রত্যাশা করেন অথবা যাঁহারা Paradise Lost গ্রন্থ কোন্ বিষয় প্রতিপাদন করিতেছে জানিতে উদ্‌গ্রীব, তাঁহাদিগকে টেনিসনের কয়েক পংক্তি কবিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি—

So Lady Flora, take my lay,
And if you find no moral there,
Go look in any glass and say
What moral is in being fair.
Oh, to what uses shall we put
The wild weed flower that simply blows ?
And is there any moral shut
Within the bosom of the rose ?
But any man that walks the mead
In bud or blade or bloom, may find
According as his humours lead
A meaning suited to his mind.
And liberal applications lie
In Art, like Nature, dearest friend ;
So 't were to cramp its use, if I
Should hook it to some useful end.

সুন্দরী কুসুমরাণী, মম গীতি লহ,
খুঁজে নাহি পাও যদি সার্থকতা তায়
দাঁড়ায়ে দর্পণ পাশে কহ দেবি কহ
কোন্ নীতিবস্তু আছে রূপের প্রভায় !
নামহীন বনফুল কোন্ প্রয়োজনে
লাগিবে, যাহারা শুধু আত্মানন্দে ফুটে,
কোন্ সে নৈতিক লক্ষ্য রয়েছে গোপনে
অবরুদ্ধ গোলাপের মর্মকোষপুটে !

ভমি নদীতটে মাঠে কাননে যখন
হেরি মোরা পুষ্প শষ্প তরু গুল্ম লতা,
অনুসরি মতিগতি আপন আপন
ভিন্ন ভিন্ন তাহাদের বুঝি সার্থকতা।
বড়ই উদার দেবি রসের বিচার
নিসর্গ-সৌন্দর্যে, শিল্পে—একই তার রীতি,
করিনিক খর্ব আমি লক্ষ্য কবিতার
জুড়ে দিয়ে কোনো এক কার্যকরী নীতি।

ইন্দ্রধনুর সৌন্দর্য উপভোগ সম্বন্ধে ইংরেজ কবিগণ যাহা বলিয়াছেন কাব্যের রসবোধ সম্বন্ধে সেই কথাই বলা যায়। ইন্দ্রধনু দর্শনে ক্যাম্বেল বলিয়াছেন—

*   *   *

*A mid-way station given
For happy spirits to alight
Betwixt the earth and heaven.

Can all that optics teach, unfold
Thy form to please me so
As when I dreamt of gems and gold
Hid in thy radiant bow ?

(ভাবানুবাদ)

* * স্বর্গে মর্তে রঙীন সেতু,
ধরণীর পরে দেবতাগণের
রচিত গমনাগমন-হেতু।
তোমার মাঝারে হেম রতনের
স্বপন হেরি যে উন্মাদনা,
জগতের শত দৃগ্‌বিজ্ঞানে
দিতে পারে তার একটি কণা ?

এই চির মনোহর ইন্দ্রধনু যে আনন্দ দান করে তাহা দর্শনে ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ নিম্নলিখিত পংক্তিনিচয়ে বলিয়াছেন—

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky.

So was it when my life began
So it is now I am a man,
So be it when I shall grow old,
Or let me die."

হৃদয় আমার নেচে উঠে, যবে
শোভে রামধনু গগনে উদি',
তা'র উপাদান বিচারের তরে
ভাবিনিক কভু নেত্র রুধি।
কিবা শিশু যুবা কিবা এ প্রবীণ
একই ভাব আমি পুষি চিরদিন,
এ ভাবের ঘোর ঘুচে যাবে মোর ?
তার আগে যেন নয়ন মুদি।

(ভাবানুবাদ)

এই রমণীয় সৌন্দর্যানুভূতিকেই কবি জীবনের সার কাম্য মনে করিতেন, তাই বলিয়াছিলেন ইহার অভাব হইলে যেন আর বাঁচিয়া থাকিতে হয় না। এই রমণীয় সৌন্দর্য-রাশিকে যাঁহারা যথেষ্ট লাভ মনে না করিয়া ইহার মধ্যে বস্তুনিচয়ের সন্ধান করেন তাঁহাদের কাণ্ড দেখিয়া কবি কীট্স দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—

"Newton had destroyed all the properties of the rainbow by reducing it to prismatie colours."

আরও বলিয়াছেন—

"Do not all charms fly
At the mere touch of cold philosophy ?
There was an awful rainbow once in heaven
We know her woof, her texture ; she is given
In the dull catalogue of common things.
Philosophy will clip an angel's wings,
Conquer all mysteries by rule and line,
Empty the haunted air, and gnomed mine
Unweave a rainbow."

(ভাবানুবাদ)

নিষ্ঠুর বিজ্ঞানতত্ত্ব-পরশন লভি
মিলাইছে একে একে বিশ্ব হ'তে মাধুরীর ছবি।
গগনে আছিল রামধনু
জানিতাম কি মোহন উপাদানে গড়া তা'র তনু ;
আজি তাহা রাজে
অবজ্ঞাত সাধারণ-বস্তুপুঞ্জ-তালিকার মাঝে।
বিজ্ঞানের তীক্ষ্ণ কাঁচিখানি
ছেঁটে দিবে পাখাগুলি দেবদূতগণে টেনে আনি।
বিজ্ঞানের বিধান নিদেশ
সকল রহস্য স্বপ্নে করিছে নিঃশেষ।
ধরণীর কোষাগার খুলি
রত্নবেদী ভগ্ন করি মণিমুক্তা করি চূর্ণ ধূলি
নিখিল জীবনময় বায়ু ব্যোমে শূন্য করে' তুলি
বিশ্লেষিছে হায়
আখণ্ডল-ধনুখানি খণ্ড খণ্ড তুচ্ছ ক্ষুদ্রতায়!

রামধনুর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মতো কবিতাকে যাঁহারা বিচার বিশ্লেষণ করেন, চতুরাননের নিকট "ইতর তাপশতানি"র বিনিময়েও তাঁহাদের হস্ত হইতে নিস্তার প্রার্থনা করি।

প্যারডি

কাহারও কাহারও বিশ্বাস কোন কবির কোন কবিতা বা গানের প্যারডি লিখিলে সেই কবিতা বা গানের বুঝি অবমাননা করা হয়। প্যারডি-রচনা-পদ্ধতিটা বাংলা ভাষায় ছিল না। পূর্বকালে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিত ও ছাত্রগণ রসিকতা করিবার জন্য কোনকোন মহাকবি-রচিত শ্লোকের ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া কৌতুকগর্ভ শ্লোক রচনা করিতেন। সে সকল শ্লোক টোলের পড়ুয়াগণের মুখে মুখে প্রচারিত হইত। সেগুলি উদ্ভট শ্লোকের পর্যায়ে পড়ে। সেগুলিকে ঠিক প্যারডি বলা যায় না—তবে প্যারডির সগোত্র বটে।

বাংলার লোক-সাহিত্যের মধ্যে টুকরা-টুকরা প্যারডির ছত্র পাওয়া যায়—সেগুলি কোন শ্রেণীর বঙ্কিমচন্দ্র তাহার আভাস দিয়াছেন তাঁহার "মুচিরাম গুড়ে"র মধ্যে একস্থলে। একদিন যাত্রার দলের বালক মুচিরাম গান গাহিতেছে—একজন পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—মুচিরামের গানের পদ মনে থাকে না। মুচিরাম গাহিল,—"নীরদ-কুন্তলা"—থামিল, আবার পিছন হইতে বলিল—"লোচন-চঞ্চলা" —মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গাহিল—লুচি-চিনি-ছোলা—পিছন হইতে বলিয়া দিল —দধাতি সুন্দর রূপং। মুচিরাম না বুঝিয়া গাহিল—দধিতে সন্দেশ-রূপম্। লোচন-চঞ্চলা দধাতি সুন্দররূপং—ইহার প্যারডি দাঁড়াইল—"লুচি-চিনি-ছোলা দধিতে সন্দেশরূপং।" এই ভাবে "পার্ব্বতীসুত লম্বোদরে"র প্যারডি 'পাক দিয়ে সুতো লম্বা কর" ইত্যাদি। মোট কথা, আমরা প্যারডি বলিতে আজকাল যাহা বুঝি—ঠিক সেই ধরণের সম্পূর্ণাঙ্গ প্যারডিকবিতা আগে ছিল না।

ইহা বিলাত হইতে আমদানী। অতএব সে দেশের পাঠকরা যে ভাবে প্যারডির বিচার করেন, সেই ভাবেই বাংলার প্যারডিরও বিচার করা উচিত।

বাংলা ভাষার প্রথম প্যারডি ছুছুন্দর-বধ-কাব্য। মেঘনাদ বধের ভাষা ছন্দ ও ভঙ্গি লইয়া রঙ্গ ব্যঙ্গ করিয়া এই প্যারডি রচিত হয়। পংক্তিতে পংক্তিতে অক্ষরে অক্ষরে বৃহৎ কাব্যের প্যারডি হইতে পারে না—সুর, ছন্দ ও ভাষাভঙ্গিরই প্যারডি সম্ভব। গীতিকাব্যের দুই শ্রেণীর প্যারডিই হইতে পারে। সেই প্যারডিই শ্রেষ্ঠ যাহা—কেবল ভাষাভঙ্গীর নয়—প্রত্যেক শব্দেরও প্যারডি। এইশ্রেণীর প্যারডিগুলি একটু কষ্টসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য বলিয়াই সব সময়ে খুব স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল হইয়া উঠে না,—স্থলে স্থলে দুষ্পাঠ্যও হইয়া উঠে।

যে কবিতা বা যে গানের প্যারডি করিতে হইবে তাহা পাঠকের সম্পূর্ণ পরিচিত, এমন কি, পাঠকের মুখস্থ না থাকিলে প্যারডির রসবোধ কিছুতেই সম্ভব নয়। সেজন্য মুখে মুখে যে গান বা কবিতা চলিতেছে তাহারই প্যারডি করিতে হয়। পাঠক-সাধারণ এই মূল কবিতা বা গানের প্রত্যেক শব্দটির সহিত তাহার প্যারডির তদনুবর্ত্তী শব্দটিকে মিলাইয়া দেখিতে পারেন কিরূপ আক্ষরিক সংযোটনার কৃতিত্ব ঘটিয়াছে এবং এই কৃতিত্ব কতটা রস-সঞ্চারে সহায়তা করিতেছে।

প্যারডি উচ্চশ্রেণীর কাব্য নহে, ইহা শব্দশিল্পমাত্র—ইহা সম্পূর্ণ শব্দালঙ্কারের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। ইহার অর্থে কোন অনির্বচনীয়তা নাই, তবু ইহা এক-প্রকার রসের সৃষ্টি করে, সে কাব্যের ঘনীভূত রস নহে, তরল হাস্য রস।

উচ্চশ্রেণীর কাব্য না হইলেও উৎকৃষ্ট প্যারডি রচনা বড়ই কঠিন—ইহাতে যে কৃতিত্বের, যে কলাকৌশলের, যে সামঞ্জস্যবোধের প্রয়োগ করিতে হয়, তারও মূল্য সামান্য নয়। প্যারডির হাস্যরস উইট শ্রেণীর হাস্যরস। সে জন্য এই রস সৃষ্টি করিতে হইলে লেখককে একাধারে পণ্ডিত, রসিক ও রসজ্ঞ হইতে হয়—নিখিল শব্দভাণ্ডারের অধিকারী হইতে হয়—ছন্দে নানা প্রকার চাতুর্যসৃষ্টির জন্য প্রথম শ্রেণীর ছান্দসিকও হইতে হয়।

সাধারণতঃ দেশবিখ্যাত কবির সর্বজন-পরিচিত গান বা কবিতারই প্যারডি রচিত হইয়া থাকে। যে গানের প্যারডি করা হয়…সে গানটী সম্পূর্ণ স্মরণে না থাকিলে প্যারডি উপভোগ করা যায় না। সেজন্য যে সঙ্গীতটী সকলেই জানেন তাহারি প্যারডি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সর্বজন-সমাদৃত সঙ্গীত, ভগবৎ-প্রেম, দেশপ্রেম বা নরনারীর পবিত্র প্রেমকে অবলম্বন করিয়াই রচিত। ভাষার ঈষৎ পরিবর্তন করিয়া ছন্দ সুর ও ধ্বনিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া Sublime শব্দ-সমুচ্চয়কে কেমন করিয়া Ridiculous করিয়া তোলা যায়, শান্তরসোপেত রচনাকে কিরূপ কৌতুকরচনায় পরিবর্তিত করা যায়, সেই কলা-কৌশল দেখাইবার জন্য প্যারডি। কাজেই প্যারডি-রচনার দ্বারা আদৌ সূচিত হয় না যে, প্যারডিকারের মনে মূল সঙ্গীতের প্রতি ভক্তি বা শ্রদ্ধা নাই, অথবা সঙ্গীতের পবিত্র বিষয়বস্তুকে অবমাননা করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। বরং পক্ষান্তরে কবির প্রতি প্যারডিকারের গভীর শ্রদ্ধাই সূচিত হয়। সেইজন্যই সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কবি সজনীকান্ত পর্যন্ত অনেকেই নিঃসঙ্কোচে যুগ-পাবন শ্লোক বা সঙ্গীতের প্যারডি লিখিয়াছেন। বিষবৃক্ষে চণ্ডীর শ্লোকের প্যারডি পড়িয়া কে বলিবে চণ্ডীর প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্তি ছিল না। কে না জানে গীতা ও চণ্ডী বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের প্রধান

উপাস্য ছিল ? তাই সতীশচন্দ্র রচিত—"আমার জন্মভূমি" গানের প্যারডি "আমার কর্ম্মভূমি" ও 'সোনার তরী'র প্যারডি "সোনার ঘড়ি" পড়িয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ প্রশংসা করিয়াছিলেন। প্যারডি রচনায় সতীশচন্দ্রকে দ্বিজেন্দ্রলালও পরাভূত করিতে পারেন নাই।

জীবিত কবিদের মধ্যে নলিনীকান্ত সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ প্যারডিকার। ইঁহার রচিত আমার "অন্ধকার বৃন্দাবন" গানের দুইটি প্যারডি (শনিবারের চিঠিতে প্রকাশিত) কাব্যামোদীদের যথেষ্ট আনন্দ দান করিয়াছে। প্যারডি রচনার দ্বারা আমার উক্ত গানটিকে নলিনীকান্ত ব্যঙ্গ করিয়াছেন আমি নিজে তাহা মনে করি নাই, বরং অভিনন্দিতই হইয়াছি।

প্যারডি একশ্রেণীর শাব্দিক শিল্পকলা। উহাকে শিল্প হিসাবেই বিচার করিতে হইবে—উহার ঈষদম্ল রস উপভোগ করিতে হইলে অন্য কোন রসের পাত্রে অথবা কোন বিশিষ্ট সংস্কারের পিতল-কাঁসার বাটিতে ঢালিয়া সেবন করিলে চলিবে না।

সাহিত্যবিচারের দুই একটি সূত্র

(১)

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে আমাদের মনটাকে যে কতদূর শাসনসংযত, সুনিয়ন্ত্রিত ও একাগ্র করিতে হয়, কবিদের উপমা-প্রয়োগের কথা ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

অর্জুন যখন একটী পাখীর চক্ষু বিদ্ধ করিবার জন্য আদিষ্ট হন, তখন গুরু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি কি দেখিতেছ ? অর্জ্জুন বলিয়াছিলেন—একটী পাখীর চোখ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। সত্যই সে-সময়ের জন্য তাঁহার দৃষ্টি হইতে বিশ্বজগৎ অপসারিত।

সাহিত্যের রসবোধ করিতে হইলে বিবিধ সংস্কার হইতে মনকে মুক্ত করিয়া কেবলমাত্র রসোপভোগিনী বৃত্তিকে উন্মুখ ও একাগ্র করিয়া তুলিতে হইবে—ক্ষণকালের জন্য অন্যান্য বৃত্তির সহিত সম্বন্ধ লোপ করিাত হইবে। যাঁহারা ইহা করিতে পারেন না—তাঁহারা নাটকপাঠকালে ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষিত হইল না—লালিকা (প্যারডি) পাঠকালে কোন কবির শ্রেষ্ঠ একটী রচনার অপমান হইল—

উপন্যাসপাঠকালে সামাজিক, পারিবারিক বা গার্হস্থ্য নীতি ক্ষুণ্ণ হইল—কবিতাপাঠকালে তাহার বিষয় বস্তুর গুরুত্ব নাই—তাহাতে মননশীলতাব পরিচয় নাই—এইরূপ মনে করিয়া ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হন; সেই ক্ষোভ বা বিরক্তির জন্য তাঁহাদের ভাগ্যে সাহিত্য-রস-বোধের আনন্দ লাভ ঘটিয়া উঠে না।

অনেকে আবার সাহিত্যপাঠকালে সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে আপনার মনোমত সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মগত আদর্শকে পাইয়া অথবা আপনার চিরপোষিত মতামত, সিদ্ধান্ত, মীমাংসা ইত্যাদিকে পাইয়া এই সকল অবান্তর ব্যাপারে পরিতুষ্ট হ'ন। তাহার প্রধান উপজীব্য যে রস, তাহার উপভোগে যে আনন্দ, তাহা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। রঙ্গীন কাচ পাইয়াই সন্তুষ্ট—কাঞ্চনকে হেলায় ঠেলিয়া রাখেন। রসবোধের জন্য চিত্তকে কিরূপ ভাবে—শাসন-সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে হয়—কবিদের উপমা-প্রয়োগের প্রকৃতি হইতেই বুঝানো যাইতে পারে।

চন্দ্রবদন বলিলে চাঁদের এক কান্তি ছাড়া কিছু ভাবিতে হইবে না, ইহা অতি সোজা কথা। 'সাপের মত বেণী' বলিলে কেবল সাপের আকার, দোদুল্যমানতা ও চিক্কণতাটুকু লইতে হইবে—সাপের সমস্ত উপদ্রব, সমস্ত বিষ, সরীসৃপের সমস্ত জঘন্যতা ভুলিতে হইবে। ইহায় চেয়েও ভীষণ আছে—গৃধিনীর মত কান। গৃধিনীর সমস্তই ন্যক্কারজনক; কিন্তু সমস্ত ভুলিয়া তাহার আকারটুকুই লইতে হইবে। করিশুণ্ড ও সিংহকটীর উপমাতে সমগ্র হইতে অংশ বাছিয়া লইতে হইবে। সেই অংশের আবার ক্ষীণতা বা পীনতাটুকু আকারের কতকটা সাদৃশ্যের সঙ্গেই ভাবিতে হইবে। সবচেয়ে বেশী সতর্কতার প্রয়োজন 'গজেন্দ্রগমনে'। সব বাদ দিয়া শুধু গতিটুকুকে লইতে হইবে, একটু এধার-ওধার হইলেই বীভৎসতা। এইসকল উপমার রসবোধে যে সতর্ককার প্রয়োজন, সকল সাহিত্য-বিচারেই সেই সতর্কতার প্রয়োজন আছে। নতুবা রসের বদলে হয়ত ন্যক্কারজনক বীভৎসতাই লভ্য হইবে। একজন অখ্যাতনামা কবি লিখিয়াছেন—

> শিরঃ শার্ব্বং স্বর্গাৎ পততি শিরসস্তৎ ক্ষিতিধরম্
> মহীধ্রাদুত্তুঙ্গাদবনিমবনেশ্চাপি জলধিম্।
> অধোগঙ্গা সেয়ং পদমুপগতা স্তোকমথবা
> বিবেকভ্রষ্টানাং ভবতি বিনিপাতঃ শতমুখঃ ॥

গঙ্গা যেমন স্বর্গ হইতে মহাদেবের শিরোদেশে পড়িয়া তথা হইতে গিরিশিখরে, গিরিশিখর হইতে ধরাতলে, ধরাতল হইতে সমুদ্রে এইরূপ ক্রমাগত নিম্নগামিনী,

বিবেক-ভ্রষ্টদেরও সেইরূপ ক্রমে ক্রমে অধঃপতন ঘটিয়া গঙ্গার মতই শতমুখী হইয়া গতির অবসান হয়।

কি সর্ব্বনাশ! হরিপদোদ্ভবা গঙ্গার সঙ্গে বিবেকভ্রষ্টের অধঃপাতের উপমা! গঙ্গা যে হরিপদ হইতে মোহনা পর্য্যন্ত আগাগোড়া পতিতপাবনী এই ভাবটী মনকে সম্পূর্ণ অধিকার করিলেই রসাভাস ঘটিবে। এখানে গঙ্গার পতনের ক্রমটীকেই শুধু ভাবিতে হইবে, অন্য কিছু না। কোথায় শিবজটা—আর কোথায় তাহার সাগর সন্নিকটে সুন্দরবনে ধীবরনাবিকসঙ্কুল শতমুখ। অধঃপতন ছাড়া আর কি ইহাকে বলা যাইবে?

উপমার জন্য গঙ্গাকে নানাভাবে গ্রহণ করিতে পারা যায়, এখানে যেভাবে গ্রহণ করা হইয়াছে সংস্কারমুক্ত মনে কেবল তাহারই সার্থকতা খুঁজিতে হইবে।

সাহিত্য রসবোধ করিতে হইলে আপনার ব্যক্তিগত বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও সংস্কারের দ্বারা রচনাবিশেষকে পরীক্ষা করিলে চলিবে না, ক্ষণকালের জন্য মনকে সর্ব্বসংস্কারের উপরে তুলিয়া কবির মনের কামনাকে অনুসরণ করিতে হইবে। কবির নিজের উদ্দেশ্যটীকে লক্ষ্য করিয়া কবির ইঙ্গিতে ও পরিচালনায় কবিরই সৃষ্ট বা কল্পিত পথে মনোরথ চালাইতে হইবে।

(২)

বাস্তব-তান্ত্রিক (Realistic) কথাসাহিত্যে পরিকল্পিত চরিত্রগুলির বিচারে চরিত্রের প্রত্যেক বাক্যে, আচরণে, গতিপ্রকৃতিতে, পুংখানুপুংখ ভাবে স্বভাবানুগতা ও যথাযথতা দেখিতে হইবে। কারণ, তাহাতেই চরিত্রসৃষ্টির উৎকর্ষ। কথাসাহিত্য ছাড়া অন্যত্র কি পৌরাণিক চরিত্র কি ঐতিহাসিক চরিত্র কি কল্পিত অপ্রাকৃত চরিত্র সব ক্ষেত্রেই মনে করিতে হইবে চরিত্রগুলি সবই ভাববিগ্রহ (Ideas personified)। এই ভাববিগ্রহের যথাযথতা বিচার বাস্তবতান্ত্রিক কথাসাহিত্যের-চরিত্রের মানদণ্ডে করিলে চলিবে না! দেখিতে হইবে এই ভাববিগ্রহগুলির মধ্যে ভাবসামঞ্জস্য আছে কি না। মহাভারতের যুধিষ্ঠির বা অশ্বত্থামা, রামায়ণের লক্ষ্মণ বা হনুমান, কবিকঙ্কণের খুল্লনা, মনসামঙ্গলের চাঁদসদাগর বা বেহুলা, বঙ্কিমের প্রতাপ বা কপালকুণ্ডলা, রবীন্দ্রনাথের সন্দীপ বা অমিত, গোবিন্দ মাণিক্য বা রঞ্জন এ সমস্তই ভাববিগ্রহ—ইহাদের রক্তমাংসে জীবন্ত মানুষ কল্পনা করিয়া ইহাদের চরিত্র বিচার করিলে রস-সঞ্চারে ব্যাঘাত হইবে। রামের সীতাত্যাগই হউক আর ভীষ্মের রাজ্যাধিকার

ত্যাগই হউক—এ সমস্ত লৌকিক বাস্তবতন্ত্রীয় বিচারের অধীন নয়। শরৎচন্দ্র পর্যন্ত ভাবতান্ত্রিকতার ধারা চলিয়াছে—শরৎচন্দ্রের পরিকল্পিত অনেক চরিত্র ভাব-বিগ্রহ। শরৎচন্দ্রের পরে এদেশের কথাসাহিত্যে বাস্তবতন্ত্রের পুরা আধিপত্য চলিতেছে। এখনকার কথাসাহিত্যের চরিত্র বিচারে পুংখানুপুংখ ভাবে লৌকিক স্বভাবানুগতার সন্ধান করিতে হইবে।

সাহিত্যে মাৎস্য ন্যায়

ছোট মাছ ছোট ছোট পোকা ধরিয়া খায়, তাহাকে ধরিয়া খায় বড় মাছ, তাহাকে আবার ধরিয়া খায় তাহার চেয়ে বড় মাছ। সেই বড় মাছকে গিলিয়া ফেলে তিমিমাছ। তিমির চেয়েও বড়বড় কাল্পনিক জলচর জীব আছে। তাহারা তিমিকেও গিলিয়া ফেলে।

…"তিমিঙ্গিল-গিলোঽপ্যস্তি তদ্গিলোঽপ্যস্তি রাঘবঃ।"

তিমিকে গিলিয়া ফেলে যে জীব তাহাকেও গিলিয়া ফেলিতে পারে এমন জীবও আছে। তাহার নাম রাঘব। মাৎস্য ন্যায় বলিতে আমরা এই 'গ্রস্তগ্রাসক-পরম্পরা' বুঝিতেছি।

সাহিত্যক্ষেত্রে একটি যে-কোন নূতন প্রয়াস হইলেই তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু তাহা কত ক্ষণ? একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির আবির্ভাব হইলেই তাহা পূর্ববর্তী সৃষ্টিকে গ্রাস করিয়া ফেলে। গ্রাস করিয়া ফেলিলেও সেই সৃষ্টিও চিরদিন টিকিয়া থাকে না—তাহারও আয়ু শেষ হয়। সেও উৎকৃষ্টতর সৃষ্টির দ্বারা কবলিত হয়। এই ভাবে মাৎস্য-ন্যায়সূত্রে গ্রস্তগ্রাসক-পরম্পরা চলিতে থাকে। তারপর এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি হয়—যাহা অপেক্ষা ঐ একই শ্রেণীর উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি আর সম্ভব হয় না। তখন সে-ই অমরতা লাভ করে।

পূর্ববর্তী সৃষ্টিগুলি উৎকৃষ্টতর পরবর্তী সৃষ্টিকে পরিপুষ্টি দান করে, প্রেরণা ও উপাদান যোগায়, আগাইয়া দেয়, কিন্তু তাহারা নিজে পাঠকসাধারণের স্মৃতিপথ হইতে এমন কি সাহিত্যের ইতিহাস হইতেও লুপ্ত হইয়া যায়, তাহাদের কথা আর কেহ ভাবিয়াও দেখে না। সাধারণতঃ জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামোল্লেখ ও পরিচয় থাকিতে পারে। জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পাঠক

তাহাদের কিছু সন্ধান রাখে—রসিক-সমাজের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না।

এইভাবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত এইশ্রেণীর একই বিষয়বস্তুর পূর্ববর্তী সৃষ্টিগুলিকে কবলিত করিয়াছে। শুধু তাহাই নয় পরবর্তীগুলিকেও গ্রাস করিয়াছে।

সাহিত্যক্ষেত্রে অনুকরণকে সকলে উপেক্ষা করে; কিন্তু কত উৎকৃষ্ট সৎসাহিত্য যে পূর্ববর্তী সৃষ্টির অনুকরণ, তাহা কেহ খোঁজ রাখে না। অনুকৃতি যদি মূলকে ভাবে ও রসে অতিক্রম করিয়া যায়, মূল অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর সৃষ্টি হইয়া পড়ে—তবে মূলকে আর কে মনে রাখে? তখন সে অনুকরণকে কে উপেক্ষা করিবে? মূলের কথাটা দুইদিন লোকে মনে রাখিতে পারে—কিন্তু ক্রমে মূল তাহার সকল গৌরব হারায়, অনুকৃতিই মৌলিক সৃষ্টি বলিয়া আদৃত হইতে থাকে।

আবার এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি রসিক-সমাজে সমাদৃত হইলে তাহার অসংখ্য অনুকরণ চলিতে থাকে। তাহার মধ্যে কোনটি যদি উৎকৃষ্টতর হইয়া পড়ে—তবে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পূর্ববর্তী সৃষ্টিরও আসন টলে, আর যদি সমকক্ষ হইয়া উঠে তবে সমকক্ষের দলে অনেক সময় মূল সৃষ্টিটির গৌরব হ্রাস পায়। সেজন্য যাঁহারা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন তাঁহারা পাঠক সমাজকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন—কোনটি মৌলিক এবং কোনগুলি অনুকৃতির ফল। যাঁহার সৃষ্টি মৌলিক অথবা যাঁহার সৃষ্টি অনুকরণরণে বিজয়ী হইয়া উঠিয়াছে—তাঁহার কৃতিত্ব, তাঁহার প্রতিভার মর্যাদা যাহাতে অক্ষুণ্ণ থাকে—সেজন্য বিদ্বৎসমাজ যথেষ্টই চেষ্টা করেন।

পূর্বেই বলিয়াছি পূর্ববর্তী দুর্বলতর প্রয়াসগুলিকে গ্রাস করিতে করিতে একটী সৃষ্টি যখন পরাক্রান্ত হইয়া উঠে—তখন সে পরবর্ত্তী অনুকৃতিগুলিকেও গ্রাস করিতে থাকে।

মেঘদূত-রচনার আগে ঠিক ঐ-শ্রেণীর কত প্রয়াস হইয়াছিল তাহা আমরা জানি না। ঐশ্রেণীর সৃষ্টি যদি পূর্বে হইয়া থাকে তবে মেঘদূত তাহাদের গ্রাস করিয়াছে। সে যুগের সাহিত্যের ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে মেঘদূতের অনুকরণে যে সকল কাব্য রচিত হইয়া তাহার সমকক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই—তাহাদের সন্ধান আমরা কিছু কিছু রাখি।

মেঘদূত সেগুলিকে গ্রাসই করিয়াছে বলিতে হইবে। পবনদূত, হংসদূত, পদাঙ্কদূত—ইত্যাদির নাম লোকে শুনিয়াই আসিতেছে। আজ মুদ্রাযন্ত্রের কৃপায় সেগুলি অধিগম্য হওয়া সত্ত্বেও যে তাহাদের আদর নাই, তাহার কারণ মেঘদূতই তাহাদের

সকল প্রতিষ্ঠা গ্রাস করিয়াছে। একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া কত 'দূত' যে 'ভূত' হইয়াছে—তাহার সন্ধানও আমরা রাখি না।

মেঘনাদ-বধের অনুকরণে কত 'বধ' কত 'সংহার' কত'পতনেই' না সৃষ্টি হইয়াছে—কিন্তু কেহই মেঘনাদ-বধকে বধ করিতে পারে নাই। মেঘনাদ বধই একে একে সকলগুলিকে গ্রাস করিয়াছে। সাহিত্যের ইতিহাসে তাহাদের নামের তালিকা পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের দুর্দান্ত সর্বগ্রাসী কাব্যও পূর্ববর্তী কবিতা-বলীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। পরবর্তী গুলিকেও গ্রাস করিতেছে। এইভাবে মাৎস্য ন্যায়ের ধারাই চিরদিন চলিতেছে।

বর্তমান সাহিত্যের পরমায়ু

আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে—রবীন্দ্রনাথের পূর্বের বা পরের কাব্যসাহিত্য টিকিবে না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য যে হিসাবে টিকিবে, হয়তো সেই হিসাবে কোনটাই টিকিবে না, কিন্তু উদ্ধত কণ্ঠে কেহ যদি বলেন, কোনটাই টিকিবে না—তাহা হইলে দুই-একটা কথা বলিতে হয়। সগৌরবে বা জনাদরের মধ্যে না টিকিলেও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইবে এ কথা আমি মনে করি না। আমি জিজ্ঞাসা করি,—যদি বা রবীন্দ্রেতর সাহিত্য নিজস্ব গুণ-গৌরবে না-ই টেকে, ক্রমোন্নতিশীল জাতির স্বাভাবিক সংরক্ষণী প্রবৃত্তি কি তাহাকে টিকাইয়া রাখিবে না? কোহিনুর পাইলে কি কেহ ধনভাণ্ডারের স্বর্ণরৌপ্য সব ডাষ্টবিনে ফেলিয়া দেয়?

এই সংরক্ষণী প্রবৃত্তি আগের চেয়ে আজকাল যে ঢের বেশী বাড়িয়া গিয়াছে এ কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। এ প্রবৃত্তি আমাদের একপ্রকার ছিল না বলিলেই হয়—এটা ইউরোপীয় শিক্ষা হইতেই পাওয়া। এ প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়াই এদেশের ইতিহাস নাই—অনেক উৎকৃষ্ট জিনিসও ক্রমে ধ্বংস পাইয়াছে। অজান্তা-ইলোরাও বহু শত বর্ষ ধরিয়া অনাবিষ্কৃত ছিল। এখন জ্ঞানভাণ্ডারের তুচ্ছ জিনিসটী পর্যন্ত রক্ষা করিবার যে একটা প্রবৃত্তি জাগিতেছে—তাহা ক্রমে বাড়িয়াই চলিবে বলিয়া আশা হয়।

গুণী, জ্ঞানী ও শিল্পিগণ শিক্ষা, দীক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা উৎকৃষ্ট হউক, চলনসই হউক, সমস্তকেই নির্বিচারে রক্ষা করিবার

চেষ্টা ও বাসনা বর্তমান সভ্যতার একটা অঙ্গ। এ প্রবৃত্তিটা অনেকটা ঐতিহাসিক প্রেরণার নামান্তর। যাহা কিছু প্রাচীন, যাহা আর ফিরিবে না, তাহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা—এই প্রবৃত্তিরই অঙ্গীভূত।

ইতিহাস-রচনার উপকরণহিসাবে—জ্ঞানপিপাসুদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে সকল সৃষ্টিকেই তাই রক্ষা করিতে হয়। বর্তমান সভ্যতা একদিকে সর্বধ্বংসী মহাকালের সঙ্গে যেমন যুদ্ধ করিতেছে—অন্যদিকে তেমনি রসায়ন প্রয়োগে অল্পায়ুর আয়ু বৃদ্ধি করিতেছে।

মহাকালই বিচারক সন্দেহ নাই—কিন্তু মহাকালের মতিগতি বুঝিয়া তাহার হাতে বিচার্যকে যোগাইয়া দিতে হয়।

দেশাত্মবোধের দৃষ্টিতে দেশের তুচ্ছতম সৃষ্টিটী পর্যন্ত আদরের জিনিস। দেশাত্মবোধ যত বাড়িবে—দেশের সাহিত্যিকদের রচনার আদরও তত বাড়িবে। জীবিত সাহিত্যিককে কতকটা উপেক্ষা করিলেও মৃত সাহিত্যিকের রচনাকে দেশের লোক ক্রমে আরও শ্রদ্ধাই করিবে—কতকটা উদারতার সহিতই বহু সাহিত্যিকের রচনাকে গ্রহণ করিবে এবং দোষ ত্রুটী ক্ষমা করিবে। সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া সাহিত্যের অপকৃষ্টতা বা আদর্শের হীনতার জন্য জাতীয় জীবনকেই দায়ী করিবে—সাহিত্যিকের সাধ্যমত সারস্বত সাধনার অবমাননা করিবে না।

যতদিন বিদেশীয় সাহিত্য দেশে সমাদৃত হইবে—ততদিন দেশী সাহিত্যেরও সমাদর থাকিতে বাধ্য। অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট হইলেও আমাদের যে জাতীয় সাহিত্য বলিয়া কিছু আছে, তাহার গৌরব করা দেশাত্মবোধেরই অঙ্গ।

একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির জীবন-চরিত্র লিখিতে হইলে তাঁহার পিতা-পিতামহের, ও বংশধারারও পরিচয় দিতে হয়। কোন্ আবহাওয়াতে, কাহাদের সংস্পর্শে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছেন তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। দেশে যদি একজনও অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন মৃত্যুঞ্জয় সাহিত্যিক জন্মিয়া থাকেন, তবে তাঁহার অভ্যুদয়ের মূলে যে সকল শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল—তাহাদের সন্ধানের প্রয়োজন। দেশের যে যে সাহিত্যসাধক বিবিধ শ্রেণীর রচনার দ্বারা দেশের সাহিত্যধারাকে পরিপুষ্ট করিয়া যুগন্ধর সাহিত্যিকের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনযাত্রা এবং তাঁহাদের রচনা চিরদিনই আলোচনার বস্তু কেন না হইয়া থাকিবে? চরম সার্থকতার পূর্ববর্তী স্তরগুলি কখনই উপেক্ষণীয় নহে, সাহিত্যের যাহারা ইতিহাস অনুসন্ধান করিবে, তাহাদের কাছে সে সকল স্তরের মূল্য ঢের বেশী। জাতীয় সাহিত্যের বিচারে

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ, সকল যুগন্ধর সাহিত্যিকের রস-সৃষ্টির উপাদান, মূলসূত্র, অঙ্কুর—এমন কি প্রেরণা পর্যন্ত পূর্ববর্তী সাহিত্যের মধ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। অন্যান্য মহা-পুরুষের জন্মের মত তাঁহার আবির্ভাব আকস্মিক নহে। শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকগুলির উৎস সন্ধানের প্রয়াসের কথা সকলেই জানেন। বাল্মীকির মত কেহই ভুঁইফোড় (স্বয়ম্ভূ) নহেন, বল্মীক হইতে জন্মান নাই। কোন প্রতিভার অভ্যুদয়ের আগে বহুদিন ধরিয়া সাহিত্যরাজ্যে যে বিরাট্ আয়োজন চলে, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও হয় তো তাহার অভ্যুদয়ের সমান আয়োজনই চলে—কিন্তু অনুসন্ধিৎসু মনীষীরা সে ধারা সর্বাগ্রে সাহিত্য-রাজ্যেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। এমন কি তাঁহারা পূর্বসূরিগণকে যুগপ্রবর্তক সাহিত্যিকের শিক্ষা-গুরুই মনে করিয়া থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্বসূরিরা যে শ্রেণীরই হউন সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মর্যাদা টিকিয়া যাইবেই—দীন যথা যায় দূরতীর্থদরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে!

তার পর তাঁহার সামসময়িক ও অব্যবহিত পরের সাহিত্যিকদিগেরও যথাযোগ্য মর্যাদা স্বীকার করিতে হয়। মহাসূরির প্রসাদে তাঁহারাও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া যান। জাতীয় সাহিত্যের একই শক্তি যাহা একজনে চরম্ সার্থকতা লাভ করে—অন্যান্য অনেকের মধ্যে তাহার আংশিক অভিব্যক্তি ঘটে। সামসময়িক অন্যান্য সাহিত্যিক-দিগের মধ্যে কি ভাবে তাহা ঘটে তাহাও আলোচনা করিবার ও লক্ষ্য করিবার বিষয়। সামসময়িক সাহিত্যিকরা যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য রাখিতে পারিয়া থাকেন—মহা-সূরির বিশ্বগ্রাসী প্রভাবে যদি অভিভূত না হইয়া থাকেন—তবে তাঁহাদের মর্যাদাও তো অল্প নহে। আর যদি তাঁহাদের শক্তি পরিপূরক (Supplementary) হিসাবে মহাকবির শক্তির সহিত যুক্ত হইয়া সমগ্র জাতীয় জীবনের পূর্ণাভি-ব্যক্তি ঘটাইয়া থাকে, তাহাতেও সামসময়িক সাহিত্যিকদের কিছু কৃতিত্ব ও মর্যাদা অবশ্য আছে। আর সামসময়িক সাহিত্যিকদিগের মধ্যে যদি দেশের জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তি ঘটে, আর মহাসূরি যদি জাতীয় জীবনকে অতিবর্তন করিয়া উঠেন—অর্থাৎ সমগ্র মহাদেশ বা মহামানবের কবি হইয়া উঠেন, সমস্ত জগৎই যদি তাঁহাকে মহাস্রষ্টা বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়,—তবে সীমাবদ্ধ জাতীয় জীবনের পক্ষ হইতে—কেবলমাত্র দেশবাসীর পক্ষ হইতেও তিনি সম্রাট বা বাদশার মর্যাদা পাইলে ঐ সামসময়িক সাহিত্যিকগণ অন্ততঃ ক্ষত্রপ বা সুবাদারের মর্যাদা তো পাইবেনই।

আর সামসময়িক সাহিত্যিকগণ যদি মহাস্রষ্টার প্রভাবের দ্বারাই সম্পূর্ণ অনুপ্রাণিত হন, তবে তাঁহারা এবং তাঁহার পরবর্তী শিষ্যস্থানীয় সাহিত্যিকগণও যে, কোন মর্যাদাই পাইবেন না এমনটাও হইতে পারে না। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহাদের সাধনারও স্থান আছে। মহাস্রষ্টার দুর্জয় প্রভাব ও অলৌকিক শক্তি জাতীয় সাহিত্যে কি ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার জিনিস। মহাস্রষ্টার ভাবসম্পদ রসসম্পদ কি ভাবে তাঁহার সহচর ও শিষ্যগণের দ্বারা দেশময় বিকীর্ণ হইয়াছে তাহাও আলোচনার বিষয়। একটা বিরাট্ শক্তি একটা বিরাট্ ব্যক্তিত্বকে আশ্রয় করিয়া কিরূপে বিম্বে প্রতিবিম্বে বিচ্ছুরিত হইয়াছে—তাহার সন্ধান লইতে গেলেই তাঁহার প্রবর্তিত যুগের সকল সাহিত্যেকের রচনাই আলোচ্য হইয়া পড়ে। একটা কেন্দ্রে বহু শক্তির সংশ্লেষণও যেমন গবেষণার বস্তু, একটী মহাশক্তির বহুচ্ছটার বিশ্লেষণও তেমনি গবেষণার বস্তু, সাধারণ লোক কেবল সূর্যকেই দেখে—কিন্তু জ্ঞান-পিপাসু সূর্যকে অসংখ্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে মিলাইয়া সৌরজগতের কেন্দ্রস্বরূপ দেখে—তাহার কাছে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহেররও মূল্য-মর্যাদা আছে। দূর হইতে যাহারা দেখে তাহারা গৌরীশঙ্করকেই হিমালয় বলিবে—কাছে গিয়া যাহারা দেখে তাহারা ছোট বড় অনেক শিখরই দেখিতে পাইবে।

এক শতাব্দীর মধ্যে মাত্র একজন মহাকবি জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া দেশ কখনও একজনের গৌরব করিয়াই তুষ্ট থাকে না। এক শতাব্দীর মধ্যে আর কোন কবি জন্মে নাই—এ কথা কোন দেশ স্বীকার করিবে? যিনি মহাকবি তাঁহাকে মহাকবির মর্যাদা দিবে, আর যাহারা শুধু কবিমাত্র,—সাহিত্যিকমাত্র তাহাদের কথাও বিস্মৃত হইবে না। এ দেশের লোক বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসকে মহাকবি মনে করে,—তাই বলিয়া গোবিন্দদাস লোচনদাস, জ্ঞানদাসকেও ভুলিয়া যায় নাই। ভারতচন্দ্রকে মহাকবি বলিয়া পূজা করিলেও রামপ্রসাদকে কে ভুলিয়াছে? তার পর কাব্য ছাড়া সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গও আছে—সে সকল অঙ্গে যাঁহারা কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহাদের মর্যাদা মহাস্রষ্টার অত্যুজ্জল আলোকে কখন ম্লান হইবে না। বিদ্যাপতি খুব বড় কবি বলিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাসকে কে ভুলিতে পারে? ৫০০ বৎসর পরেই বা কে তাঁহাকে ভুলিবে?

বিশ্বব্যাপী খ্যাতি শতাব্দীতে ক্বচিৎ কাহারও ভাগ্যে ঘটে। দেশব্যাপী খ্যাতিও অতি অল্প সাহিত্যিক্যের ভাগে জুটে। দেশের অংশ বিশেষে বা জাতির অংশ বিশেষে অনেকের খ্যাতি থাকিয়া যায়, যাহারা দেশের অংশ-বিশেষকে স্বদেশ বলিয়া মনে করে তাহারা নিজেদের অঞ্চলের কবির খ্যাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে চেষ্টা

করে। আবার যাহারা নিজেদের সম্প্রদায়কেই জাতি বলিয়া কল্পনা করে, তাহারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কবির খ্যাতি নষ্ট হইতে দেয় না। সংকীর্ণ প্রকৃতির হইলেও ইহাও এক প্রকারের দেশাত্মবোধ বা জাতি-প্রেম।

এক শতাব্দী পরে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কাহারও নাম থাকিবে না—একথা যাহারা বলে, তাহারা ঠিক করিয়াছে—একশত বৎসর পরে সমস্ত বাঙ্গালী জাতির রুচি ও আদর্শ হইবে আজকালকার ফিরিঙ্গি প্রকৃতির বাঙালীদের মত। আমরা কিন্তু তাহা মনে করি না—বাঙ্গালী বিদ্যা, জ্ঞানে ও রসজ্ঞতায় যতই উন্নতি করুক—একশত বৎসর পরেও বাঙ্গালীর, খুব কম ধরিয়াও শতকরা ৯০ জন লোক রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের উচ্চ আদর্শ ধরিতেই পারিবে না বা রবীন্দ্র-সাহিত্যের রস উপলব্ধি করিতে পারিবে না। এখনকার মত তখনও অধিকাংশ লোকই আরও নিম্নগ্রামের বা বিভিন্নস্তরের সাহিত্যেই আনন্দ পাইবে। চিত্তবিনোদনের জন্য তাহারা সাহিত্য চাহিবেই। অবশ্য সাম-সময়িক সাহিত্যিকদের নিকট হইতে কতকটা পাইবে। কিন্তু সব যুগের লোকের মতই তাহারাও বর্তমান অপেক্ষা অতীত সাহিত্যকেই বেশী মর্যাদা দিবে। বর্তমানের প্রতি উপেক্ষা এবং অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। কাজেই তাহারা বর্তমান শতাব্দী ও গত শতাব্দীর সাহিত্যকেই বেশী বেশী খুঁজিবে। রবীন্দ্র-সাহিত্য যতটা পারিবে বুঝিবে—অধিকাংশ ক্ষেত্রে এখনকার মতই না বুঝিয়াই রবীন্দ্রনাথের গৌরব কীর্তন করিবে। রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে বলিয়া খুব গৌরব না দিক্—আদর করিবে।

সে হিসাবে—আজি জীবিত থাকার অপরাধে যাহারা কতকটা অনাদৃত তাহাদের আদর বাড়িবে বৈ কমিবে না।

তাহা ছাড়া, বাঙ্গালী জাতি যদি আত্মস্বাতন্ত্র্য না হারায়,—তাহার মূল ধাতু যদি বদলাইয়া না যায়, তবে তাহার বৃত্তি, প্রবৃত্তি, রুচি তাহার জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য—এমন কি দুর্বলতাগুলি পর্য্যন্ত কতক কতক থাকিয়াই যাইবে। দেশশুদ্ধ লোকই বিজাতীয় হইয়া উঠিবে না। বর্তমান যুগে বা পূর্ববর্তী যুগে যে সকল লেখক উচ্চশ্রেণীর রসের সাধনা না করিয়া কেবল বাঙ্গালী জাতির রুচিপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যেই সাধনা করিয়াছেন, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের অভিব্যক্তিকেই ভাষায় ঝঙ্কৃত ও রূপায়িত করিয়াছেন,—তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহাদের দুর্বলতার ও দীনতার জন্য সহানুভূতি দেখাইয়াছেন—তাঁহাদের আদর তখনও থাকিবে। লোকে তখনও

তাঁহাদের রচনায় অন্তরের সাড়া পাইবে। রবীন্দ্রসাহিত্যকে তাহারা সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের বস্তু মনে করিলেও বহু ত্রুটী সত্বেও রবীন্দ্রেতর সাহিত্যকে তাহারা ভাল না বাসিয়া পারিবে না—নিজেদের আশা আকাঙ্ক্ষা তাহাদের ভাষাতেই প্রকাশ করিতে চাহিবে।

যুগধর্মের পরিবর্তনে লোকের রুচি-প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে কখন যে কোন্ সাহিত্যিকের রচনায় টান পড়িবে তাহাও বলা কঠিন।

আজ যে সাহিত্য অনাদৃত—বাচ্যার্থসর্বস্ব বলিয়া যাহা মর্য্যাদা পাইতেছে না, তাহা পুরাতন হইলেই ব্যঙ্গার্থে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। উৎসাহী পাঠকগণ তাহাতে নূতন নূতন অর্থ আরোপ করিবে—আপনমনের মাধুরী মিশাইয়া এ সাহিত্যকে নূতন করিয়া গড়িয়া লইবে। আপনাদিগের সাধনার্জ্জিত বা যুগধর্মের গুণে প্রাপ্ত অনেক সম্পদেরই পূর্বাভাস বা পূর্ব বিম্ব তাহারা এ সাহিত্যের মধ্যে দেখিতে পাইবে।

এ যুগের যে সাহিত্য এখন বৈচিত্র্যহীন বলিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না—কালের ব্যবধান তাহাকে রোমান্টিক করিয়া তুলিবে। আজ সাহিত্যের যে বিষয়বস্তু নিষ্প্রভ তাহা অতীতের স্বপ্নে সমুজ্জল হইয়া উঠিবে।

আজ যে মধুতে নেশা হয় না, পুরাতন হইলে সে মধু "মাধ্বী" হইয়া উঠিবে, তখন তাহাতে নেশাও ধরিবে। গুড়-ও 'গৌড়ী' হইয়া উঠিবে। ভবভূতি বলিয়া গিয়াছেন "কালোঽহ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী"—সমানধর্মার অভাব কোন যুগেই হয় না। যুগন্ধর সাহিত্যিকেরও অনেক রচনা টিকিবার উপযুক্ত নয়। কিন্তু তাঁহার অতুল্য রচনা গুলির সঙ্গে সঙ্গে অন্য গুলিও টিকিয়া যায়। দেশের কোন একটা যুগের সৃষ্টির মধ্যে কোন কোন সৃষ্টি যদি বাঁচে তবে তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে যুগের বহু সম্পদই বাঁচিয়া থাকে। দিগ্‌বিজয়ী প্রতিভা যাঁহার সেত চিরংজীব, তাঁহার অগ্রগামী বা অনুগামীরা অন্ততঃ দীর্ঘজীবী হইবে।

বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য

ফোটোগ্রাফী প্রকৃত আর্ট নয়—বিজ্ঞানের কৃতিত্বের নিদর্শন মাত্র! শিল্পীর মনের রঙে রসের তূলিকায় অঙ্কিত না হইলে আর্ট হইয়া উঠে না। বাহিরের কোন দৃশ্যের বা ঘটনার যথাযথ বর্ণনা অথবা অন্তরের মনোবৃত্তি-লীলার বিবৃতি মাত্র—কেবল বাস্তব সত্যের দোহাই দিয়া সাহিত্য হইয়া উঠে না। মনের রসাবেশ তাহাকে অভিনব সৃষ্টিতে রূপান্তরিত না করিলে সাহিত্য হয় না। সাহিত্যিক ত একজন নকলনবিশ Imitator বা Reporter বা Recorder মাত্র নহেন,—তিনি স্রষ্টা। যথাযথ বিবৃতিই সৃষ্টি নয়। সাহিত্যিক মনের রসাবেশ যাহা বাস্তব তাহাকে আপনার রসনীতির সুবিধানুসারে রূপান্তরিত করিয়া লয়—তবে অভিনব সৃষ্টি সম্ভব হয়। অর্থাৎ—বাস্তব সত্য স্রষ্টার রসকল্পনার মধ্য দিরা প্রকাশ লাভ করিলে সাহিত্যের বাহিরে তাহার যেমন রূপটি ছিল—সাহিত্যে তাহার ঠিক সেই রূপটি থাকে না—রূপান্তর লাভ করে। অনেক সময় বাস্তব সত্য—সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান মাত্র—সাহিত্যের সত্য ঐ বাস্তব সত্যের সাহায্যে উন্মেষিত। উপাদান ও সৃষ্টি যেমন এক নহে, বাস্তব সত্য ও সাহিত্যের সত্য তেমনি এক নহে। বাস্তব সত্য বাহিরে অপরতন্ত্র—কিন্তু সাহিত্যে তাহা একটি রসাদর্শের বশীভূত বা অনুগামী মাত্র।

বাস্তব জগতে যাহা অসত্য রস-জগতে তাহা সত্য হইতে পারে। আবার বাস্তব জগতে যাহা সত্য, রসজগতে তাহা অসত্য হইতে পারে। সাহিত্যের সত্য-বিচারের পরিমাপক রস। রসোত্তীর্ণ হইলেই সকল ভাব বা বস্তুই সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠে।

সাহিত্য-জগতে এমন সত্য অনেক আছে, বাস্তব জগতে তাহার অস্তিত্বও নাই। আবার বাস্তব-জগতে এমন অনেক সত্য আছে যাহার সাহিত্যে প্রবেশাধিকারই নাই অর্থাৎ সত্য হইলেই সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না। বিজ্ঞান-জগতে সত্য-মাত্রেরই প্রবেশাধিকার আছে। বিজ্ঞান-জগৎ আর সাহিত্যের জগৎ এক ত নহেই—এক প্রকৃতিরও নয়। বিজ্ঞানের জগতে বাস্তব সত্যের স্ফূর্তি দেখিয়াও আমাদের আনন্দ জন্মে—কিন্তু সে আনন্দ বোধানন্দ। আর সাহিত্যের সত্য আমাদিগকে যে আনন্দ দেয়—তাহা রসানন্দ। সাহিত্যের সত্য সুন্দর বলিয়াই সত্য। বাস্তব সত্য যখন সাহিত্যে মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লাভ করে তখনই তাহা সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠে। বাস্তব সত্য যাহাতে সুন্দর হইয়া রসানন্দ দান না

করে—তাহা সাহিত্য নয়, বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিক বিবৃতি মাত্র।

একটি বাস্তব সত্যকে সাহিত্যের সত্য করিয়া তুলিতে হইলে কত আয়োজনই না করিতে হয়।

বাস্তব সত্য অনেক সময় কঙ্কাল ছাড়া কিছুই নয়—সেই কঙ্কালে রক্ত, মাংস, ত্বক্ ও লাবণ্য যোগ করিতে হয় সাহিত্যিককে, তবে তাহা সাহিত্যের সত্যসুন্দররূপ ধারণ করে। উদাহরণ স্বরূপ—রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদা, গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদ, বিদায় অভিশাপ, পতিতা ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। যে সকল বাস্তব সত্যকে অবলম্বন করিয়া এইগুলি কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেগুলি কোথায় যে রসোচ্ছলতার মধ্যে নিগূহিত আছে তাহা খুঁজিয়াই পাওয়া কঠিন।

নর-নারীর যৌন-জীবনের অনেক তথ্যই সত্য হইলেও সাহিত্যে স্থান পাইতে পারে না অর্থাৎ কিছুতেই তাহাদের কুশ্রীতা ও জঘন্যতাকে আবৃত বা আচ্ছাদিত করা যায় না। আবার অনেক তথ্য সাহিত্যের সত্য হইয়া উঠিয়াছে—কিন্তু সেজন্য লেখকদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইয়াছে। পবিত্র প্রেমের আবেষ্টনীর মধ্যে মার্জ্জিত ও সংযত ভাষায় তথ্যগুলিকে উপস্থাপন করিতে হইয়াছে—অনেক সময় শান্ত-দান্ত প্রকৃতির সঞ্চারী ভাবের সাহায্য লইতে হইয়াছে—অনেক সময় ধর্মভাবের সহিত সংযোগ সাধন করিতে হইয়াছে অর্থাৎ শৃঙ্গার রসকে শৃঙ্গার বেশে সজ্জিত করিতে হইয়াছে।

যাঁহারা যৌন জীবনের বাস্তব তথ্যগুলিকে যথাযথ ভাবে বর্ণনা করিয়া সাহিত্যের সত্য হইল মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। যৌনজীবনের যথাযথ বর্ণনায় যে একটা হর্ষোদ্গম হয়—তাহা স্নায়বিক পুলকমাত্র, তাহা রসানন্দ নয়। ঐ স্নায়বিক পুলককেই রসানন্দ বলিয়া লেখক ও তাঁহার পাঠকগণ ভ্রম করেন। সেই ভ্রমের ফলেই কাম-সাহিত্যের সৃষ্টি। কাম সাহিত্যের লেখকগণ মনে করেন, তাঁহারা সত্য প্রচারই করিতেছেন—অসত্য কথা ত কিছু বলিতেছেন না। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান, তাঁহাদের প্রচারিত সত্য সাহিত্যের সত্য নয়—কারণ, উহা রসোত্তীর্ণ নয়—বাস্তব সত্যকেই তাঁহারা আরও লোভনীয় করিয়া বর্ণনা করিতেছেন মাত্র। লোভনীয় করা আর শোভনীয় করা এক কথা নহে।

বাস্তব সত্যের মধ্যে আমরা জীবন-সংগ্রাম করিয়া কোনরূপে টিকিয়া আছি। বাস্তব সত্য অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পীড়াদায়ক, বিরক্তিকর ও নীরস। বাস্তব সত্যের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের জন্যই—বিক্ষত বিক্ষুব্ধ চিত্তকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেওয়ার জন্যই আমরা সাহিত্যের শরণাপন্ন হই। সেই সাহিত্যের মধ্যেও আমরা

যদি অবিরত বাস্তব সত্যকেই ভ্রূকুটি করিতে দেখিতে পাই—তবে আমরা দুদণ্ড বিশ্রাম করি কোথায়—জুড়াই কোথায়? সাহিত্যের সত্যই আমাদিগকে বাস্তব সত্যের উৎপীড়ন হইতে শান্তি ও সান্ত্বনা দান করে।

আমাদের এই মনোভাবকে বর্তমান তরুণ লেখকগণ Escapist মনোভাব বলেন। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে নানা পীড়ন-তাড়ন সহ্য করিয়া যদি আমরা শান্তি সান্ত্বনা ও বিশ্রামের জন্য স্বগৃহে ফিরি—তবে তাহা কি escapist মনোভাব। দুঃখকষ্টের সঙ্গে যাহারা সংগ্রাম করে এবং দিনান্তে শিবিরে ফিরিয়া বিশ্রাম করে তাহারা কি কাপুরুষ?

আধুনিক সাহিত্য

আধুনিক সাহিত্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহা বিদ্রোহাত্মক।

আধুনিক সাহিত্যে এ বিদ্রোহ ত শুধু নরনারীর যৌন সম্পর্ক লইয়া নহে—আমাদের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, সাহিত্যিক, সাংসারিক, পারিবারিক, নৈতিক, দাম্পত্য ও ধর্মাত্মক জীবনে যাহা কিছু গতানুগতিক, অন্ধ-সংস্কারাচ্ছন্ন, যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু জীর্ণ, জীবনহীন ও নিস্তেজ,—যাহা কিছু হীন স্বার্থের খেলা,—যাহা কিছু ফাঁকি, ভেজাল, চালাকি, ভূয়ো ও ভণ্ডামি তাহার বিরুদ্ধে নব-সাহিত্যের এই বিদ্রোহ। ইহার মূল উৎস খুঁজিতে গেলে রামমোহনে পৌঁছিতে হয়।

প্রত্যক্ষভাবে এই বিদ্রোহের প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ, প্রচারক শরৎচন্দ্র।

অর্দ্ধ-শতাব্দীর বঙ্গ সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে দেখা যায় যে, আমাদের দেশ ঐ জাতীয় মহাবিদ্রোহের প্রায় সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমে মঙ্গলদায়ক ও "পরিণাম-রমণীয়" বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। বর্তমান সাহিত্য প্রাণরসে ভরপুর, উন্মাদনার প্রাচুর্য্যে চঞ্চল। বর্তমান সাহিত্য আর যাহাই হউক,—নিস্তেজ, ক্লীব, গতানুগতিক ও জড়ভাবাপন্ন নহে।

উচ্ছেদ-সাধনই যে বিদ্রোহ-দমন নয়, তাহা সকল দেশের সাহিত্যই স্বীকার করিয়া লইয়াছে।—আমাদের দেশের সাহিত্যও জাতীয় বিদ্রোহের প্রায় সকল অঙ্গ সম্বন্ধে তাহা স্বীকার করিয়াছে। যুগে যুগে আমাদের সাহিত্য বিদ্রোহীদলের সহিত সন্ধি করিয়া, আপোস নিষ্পত্তি ও রফা করিয়া, সামঞ্জস্য বিধান করিয়া,

নবাগত ভাব, ধারা, ভঙ্গি ও আদর্শগুলিকে আপনার জীবন্ত সংসার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যুগধর্মের শাসনে এ বিধি মানিতে আমরা বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, রচনাভঙ্গি ও ভাষাবিষয়ে সবুজপত্রের বিদ্রোহের পরিণাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। শিল্পক্ষেত্রে ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির নামও করা যাইতে পারে।

বর্তমান সাহিত্যের বিদ্রোহ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরিণাম সম্বন্ধেও চিরন্তন বিধির ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া মনে হয় না। বিদ্রোহীর সংখ্যা এত বেশী এবং তাহারা এত শক্তিমান্ যে, তাহাদের সঙ্গে একটা সন্ধি অদূর ভবিষ্যতেই ঘটিয়া যাইবে এইরূপ অনুমান করা যায়।

"ত্যাজ্যো দুষ্টঃ প্রিয়োঽপ্যাসীদঙ্গুলীবোরগক্ষতঃ"।—এ বিধি এক্ষেত্রে চলিবে না। কারণ, তাহাতে জীবন বাঁচিয়া গেলেও অঙ্গহানি থাকিয়া যায়। অমরী বঙ্গবাণীর কোন অঙ্গহানি-ত চলিতে পারে না।

সর্বাপেক্ষা আশার কথা বঙ্গসাহিত্যে নবজীবন-সঞ্চার। তাহার তুলনায় তরুণ সাহিত্যের কিছুকিছু উচ্ছৃঙ্খলতা খুব বেশী নৈরাশ্যের কথা নহে।

ক্রমোপচীয়মান শক্তির ভাণ্ডার যে 'জীবন্ত দেহ', তাহাতে সকল ক্ষতই,—সকল ক্ষতিই, বিনা চিকিৎসাতেও নিরাময় হইয়া যায়।

তরুণ সাহিত্যিকগণের উদ্দেশে এই প্রসঙ্গে প্রবীণ সাহিত্যিকরা ও সুনীতি-সুরুচির পক্ষপাতিগণ মাসে মাসে যে সকল উপদেশ ও অনুশাসন-বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেগুলি তরুণ সাহিত্যিকরাও যে জানেন না তাহা নয়। তাঁহারাও জানেন, তবে সকলে মানেন না, সাহিত্য-সৃষ্টি ও রস-বিচারের মূল আদর্শের বৈষম্যের জন্য।

প্রবীণদের অনুশাসন এইরূপ—"যাহা কিছু বাস্তব সত্য—যাহা কিছু সংসারে নিত্যই ঘটে—যাহা কিছু স্বভাবতই মনে উদিত হয়—তাহারই অবিকল বর্ণনার নাম, রিপোর্ট হইতে পারে, সাহিত্য নয়।"

"Criminology অথবা আর কোন Logyর বিবৃতি, ব্যাখান হইতে পারে, সাহিত্য নহে।"

"সাম্যবাদ কি আর কোন "বাদ"-প্রচারই অথবা সাম্রাজ্যবাদ কি আর কোন "বাদের" সঙ্গে বিবাদ বা বাদানুবাদ, তত্ত্ববিচার হইতে পারে, সাহিত্য নহে।"

"নরনারীর আকর্ষণ মাত্রই প্রেম নহে। কামায়ন কখনো রামায়ণের মর্য্যাদা পাইতে পারে না।"

"কুলী, মুটে, মজুর, পতিত-পতিতাদের জীবন-কাহিনী মাত্রই, প্রোপেগ্যাণ্ডা হইতে পারে, সাহিত্য নহে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ সকল কথা আধুনিক সাহিত্যিকরাও জানেন—তাঁহারাও বুঝেন, তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। বোধ হয় বর্তমান ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের অনুকরণের লোভ তাঁহারা সংবরণ করিতে পারেন না। সেই অনুচিকীর্ষা-বৃত্তির প্রাবল্যের জন্যই, যে সকল সমস্যা আজিও আমাদের জাতীয় জীবনে সমুপস্থিত হয় নাই—কখনো হইবে কিনা সন্দেহ—সেই সকল সমস্যা লইয়া গল্প বা উপন্যাস রচনা করেন। সরস বা কলা-কৌশলময় করিয়া বলিতে পারিলেই সকল বাস্তব সত্য, সকল তথ্য, সকল তত্ত্ব সাহিত্য হইয়া উঠিবে, এই ধারণায় বিষয়-বস্তু বা আখ্যেয়বস্তুনির্ণয়ে তাঁহারা কতকটা অসতর্ক হইয়া পড়েন।

এই সকল ত্রুটী সত্ত্বেও আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সন্ধিসামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে। আমি তাহাদের সাহিত্য সাধনাকে Antithesis স্বরূপ স্বীকার করিয়া লইয়া Thesisএর সঙ্গে Synthesis প্রত্যাশা করি।

আধুনিক সাহিত্যকারদের শক্তি ও প্রয়াসকে বরণ করিয়া লইয়াও দুইচারিটি কথা Suggestion হিসাবে বলিতে চাই।

ইউরোপে আজকাল বড় বড় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও লোকগুরুশ্রেণীর মনীষীগণ আপনাদের মতামত, জীবনের অভিজ্ঞতা, শিক্ষাদীক্ষা, সিদ্ধান্ত, সমস্যা,—এমন কি জীবনের ধ্রুব বাণীটি পর্য্যন্ত কথা-সাহিত্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতেছেন। তাহাতে সরস সৎসাহিত্যের পরিমাণ যেমন বাড়িতেছে,—পাঠক-সংখ্যাও তেমনি বাড়িতেছে, জ্ঞানবিস্তারও হইতেছে।

আমাদের নবীন সাহিত্যিকগণ যদি ঐসকল পণ্ডিতগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চান তবে জ্ঞানে ও বয়সে তাহাদের মত প্রবীণ না হইলে চলিবে কি?

নর-নারীর বৈধ প্রণয়ই হউক আর অবৈধ প্রণয়ই হউক উদাসীনভাবে তাহার প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় কোন দোষ নাই। কিন্তু যখনই, আদ্যোপান্ত মূলসৃষ্টির সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া, সমগ্রের সহিত কলাশৃঙ্খলার সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া, লেখকের মন ঐ বর্ণনাতেই কামাবেশ-সঞ্চারে অতিরিক্ত রসিয়া উঠে, মোহাবিষ্ট লেখনী সহজে বিষয়ান্তরে যাইতে চাহে না,—তখনই সংযমের (অন্ততঃ ভাষায়) বিশেষ প্রয়োজন হইয়া উঠে।—ইহা নিশ্চয়ই লেখকগণ স্বীকার করিবেন।

সাহিত্যিকরা কেহ কেহ এই সংযমের সীমানা কোথায় হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন। সংযমের সীমানা সভ্য-শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে দেখাইয়া দিতে

হয় না। তাঁহারা জীবনের সর্বক্ষেত্রেই সংযম রক্ষা করিয়া সভ্য-সমাজে সসম্মানে চলিতেছেন, সাহিত্য-ক্ষেত্রেই কি সংযমের সীমানা ধরিতে পারিবেন না ? এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাকে আদর্শ ধরিলেই বোধ হয় গোল চুকিয়া যায়।

মূলের সহিত সামঞ্জস্য-রক্ষা না করিয়া মসগুল হইয়া কামকেলি বর্ণনা করিলে সে বর্ণিত অংশ সমগ্র রচনার অঙ্গে অর্বুদের (Tumour) এর মত বিকট হইয়া উঠে। যতই সুপুষ্ট, চিক্কণ ও সুশ্রী হউক, অর্বুদে কখনো অঙ্গ-সৌষ্ঠব বাড়ে না।

একদা নাগরগণের 'বিলাসকলাসু কুতূহল' পরিতৃপ্তির জন্য কামলীলার বর্ণনা সংস্কৃত সাহিত্যে চলিত। পরে বৈষ্ণব ধর্মের নামে, সহজিয়া রস-সাধনার নামে আমাদের দেশে দৈহিক লালসা ও রিরংসা সাহিত্যের বিষয়ীভূত হইয়াছিল। এই সকল সাহিত্যের স্রষ্টারাও একশ্রেণীর রস-শিল্পী ছিলেন। তাঁহাদের রচনা সীমাবদ্ধ পরিসরের মধ্যে পরিচ্ছিন্ন ছিল। মনে রাখিতে হইবে—এখন সাহিত্যিকদের পাঠক আপামর সাধারণ।

স্বভাব-বর্ণনাতেও অবিকল পুঙ্খানুপুঙ্খ নিঃশেষ করিয়া বলিবার প্রয়াসও অসংযমের লক্ষণ। এ বিষয়ে সংযম অবলম্বন করিলে রচনা ব্যঞ্জনাময়ী হইতে পারে, বর্ণনা ফোটোগ্রাফীর অবৈচিত্র্য হইতেও রক্ষা পাইবে। ফটোগ্রাফী ত উচ্চ শ্রেণীর আর্ট নহে।

রান্নাঘরে প্রয়োজনীয় যে সজিনা ফুল, সাহিত্যে তাঁহার স্থান আছে কিনা ইহা লইয়া এক সময় বাদানুবাদ হইয়াছিল।

সজিনা ফুলও স্থলবিশেষে প্রয়োগগুণে সাহিত্যে চলিতে পারে—কিন্তু জোর করিয়া ঐ শ্রেণীর ফুলের তালিকা দিলে অথবা চাঁপা বেলা চামেলী গোলাপ জুঁইকে অপমান করিয়া কিংবা তাহাদিগের হীনতা প্রমাণের জন্য সজিনা ফুলকে অযথা মর্য্যাদা দিলে যে অসংযম বা উদ্ধত অধীরতার ভুল ফুটিয়া উঠে, তাহা সাহিত্যে রস-সৃষ্টির অন্তরায়।

সাহিত্য যে কেবল অভিজাত-সম্প্রদায়ের সেবা করিবে, ইহা কখনো বাঞ্ছনীয় নয়। তাহাকে দীনদুঃখী অধঃপতিত পতিত অনুন্নত জনশ্রেণীর ব্যথার ব্যথীও হইতে হইবে। কিন্তু তাহাদের অধঃপতনের সীমানা দেখানোই ত সাহিত্য নয়। তাহাদের অশ্রু-বর্ষণের অনুপাতানুসারেও সাহিত্যের মর্যাদা নির্দিষ্ট হইবে না। সেখানেও সংযমের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাহাদের জীবনের ন্যকারজনক চিত্র-তাহাদের পল্লীতে বেড়াইয়া আসিলেই দেখা যায়। সাহিত্যিককে আপন মনের মাধুরী মিশাইয়া সেখানেও রসসৃষ্টি করিতে হইবে। সাহিত্যিক, Municipal

Inspector নহেন,—সমস্ত গলি-ঘুঁজি গুহা-কোটর তন্নতন্ন করিয়া তাঁহাকে দেখিতে বা দেখাইতে হইবে না। সংযত লেখনীর ব্যঞ্জনার ইঙ্গিত যাহা দেখাইতে পারে ও ভাবাইতে পারে, অবিকল বর্ণনা তাহা পারে কি? সাহিত্যিকের মনে রাখিতে হইবে, পতিত অধমের জীবনচিত্র দেখানোই তাঁহার উদ্দেশ্য নহে—তাহাদের জীবন লইয়া সাহিত্য-সৃষ্টিই উদ্দেশ্য। সেজন্য এস্থলে সহানুভূতির উচ্ছ্বাসের মধ্যেও সংযম চাই। দুঃস্থ দুর্গতদের জন্য ওকালতি করিতে গিয়া আস্ফালন এবং সম্প্রদায় বিশেষকে কটুবাক্যে বিদূষণের প্রয়োজন থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা সাহিত্য নয়।

উপন্যাসের মধ্যে সুশিক্ষিত পাত্রপাত্রীদের কথোপকথন বিদ্যাবত্তা-প্রকাশ বা বক্তৃতা-বিলাসে পরিণত না হয়, সে বিষয়ে যেমন সতর্কতার প্রয়োজন আছে, তেমনি তাহাদের মুখের ভাষাও যাহাতে বাংলা হরপে ইংরাজী (Anglicised) অথবা অতিরিক্ত বক্রোক্তিতে পূর্ণ না হয়, সে বিষয়ে সংযত হওয়া উচিত। আবার ইতর-শ্রেণীর পাত্র-পাত্রীদের মুখে,—অকৃত্রিমতা সৃষ্টির লোভে, যেমনটি তাহারা বলিয়া থাকে, ঠিক তেমনি অভব্য কথাবার্ত্তা বসানোই উৎকৃষ্ট সাহিত্য নয়। এ বিষয়েও সংযমের প্রয়োজন আছে।

তাহাদের মুখের সকল কথাই সাহিত্যের মর্যাদা পাইতে পারে কি? দুইজন নিম্নশ্রেণীর লোকের কলহের কথা অবিকল যদি গ্রামোফোনে ধরা যায় অথবা পুস্তকে লেখা যায়—তবে কি সাহিত্য হইবে? উপন্যাসের মধ্যে পাত্রপাত্রীর মুখের কথাই থাকে তাহার অধিকাংশ জুড়িয়া। কোন' উপন্যাসের ঘটনা-সংস্থান যদি কোন জেলার পল্লীবিশেষ হয় এবং তাহার পাত্র-পাত্রী যদি তাহাদের নিজের ভাষায় নিজের উচ্চারণে সমস্ত কথা বলিতে থাকে—তবে উপন্যাসখানির আগাগোড়া সাহিত্যের ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইতে হয় না কি? স্বাভাবিকতা সৃষ্টি বিষয়েও সেজন্য সংযমের প্রয়োজন আছে।

চল্‌তি ভাষা সাহিত্যের ভাষা রূপে ইদানীং চলিয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্যিকগণের অনেকেই এই চল্‌তি ভাষার পক্ষপাতী। কিন্তু চল্‌তি ভাষার অর্থ ইতর ভাষা নহে,—যে ভাষা শিক্ষিত লোকের মুখে মুখে চলে তাহাই সাহিত্যের ভাষা বলিয়া গণ্য। গ্রাম্য ইতর লোক বা অশিক্ষিত লোক শোভনতর মার্জিততর ভাষার অভাবে যে ভাষায় কোন' প্রকারে ভাব প্রকাশ করে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিয়া তোলা উচিত নয়। নাট্যাদিতে পাত্র-পাত্রীর মুখের কথা হিসাবে তাহা অনেকক্ষেত্রে কিছু বৈচিত্র্য সম্পাদন করে স্বীকার করি,—কিন্তু আগাগোড়া

সেই ভাষাতেই সমগ্র গ্রন্থ লিখিলে বক্তব্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হইবে না। বাংলা ইডিয়ম ব্যবহার করায় ভাষা বেশ জোরালো হয় সত্য, কিন্তু 'টেনে বুনে' জোর করিয়া ইডিয়ম ব্যবহার অথবা যে সকল ইডিয়ম সুপরিচিত নয়, সহজ সরল সাহিত্যের চিরপরিচিত ভাষার বদলে সেগুলিকে জোর করিয়া ঢুকাইলে ভাষার প্রসাদগুণ নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কোন লেখক অতি সাধারণ কথাগুলিকেও বক্রোক্তিতে প্রকাশ করিতে চাহেন। বক্রোক্তির প্রতি তাঁহাদের অস্বাভাবিক অনুরাগ। ইহাতে বক্তব্য অস্বচ্ছ হয়, বক্রোক্তিতে কলাকৌশল না থাকিলে রচনার সাবলীল প্রবাহে বাধারই সৃষ্টি করে। যে বক্রোক্তি প্রমথনাথ বিশীর লেখনীতে শোভা পায়, তাহা কয়জনের লেখনীর পক্ষে সম্ভব ?

বাক্যে শব্দ-বাহুল্য, শব্দে অক্ষর-বাহুল্য, ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণের অযথা দীর্ঘতা, ভাবপ্রকাশে ভাষার অতি-পল্লবিত বিস্তার এবং কর্ত্তা কর্ম ক্রিয়া-বিশেষণ ও ক্রিয়ার যথাক্রমে চিরন্তন প্রথাগত সংস্থিতি, আজকালকার লেখকেরা পছন্দ করেন না। পছন্দ না করার যথেষ্ট হেতুও আছে। অযথা ভারাক্রান্ত ভাষা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে না। বর্তমান লেখকগণ ঐ গুলি পরিহার করিয়া চলিতে চাহেন—তাই তাঁহাদের বাক্যগুলি অধিকাংশস্থলে বেশ ছোট ছোট। এগুলি গুণের মধ্যে পড়ে। কিন্তু বাক্য-বিন্যাসে, অনুচ্ছেদ-বিন্যাসে ও ছেদ-সংস্থানেও ইহারা প্রাচীন পদ্ধতি মানিয়া চলেন না। কেহ কেহ ষ্টাইলকে চিত্তাকর্ষক করিবার জন্য বালরঞ্জন উপকথার ভাষা ব্যবহার করেন। সাধারণতঃ এই ভাষা দেখা যায় তথাকথিত রম্য রচনায়। ফলে, ইঁহাদের অনেকের ভাষা কৃত্রিমতায় পূর্ণ, বা ন্যাকামিতে ভরা, অনেক সময় যেন ঠাকুরমার মতো রূপকথার গল্প বলিয়া যান, অথচ পরীর গল্পও নয়—সুয়ো-রাণী দুয়ো রাণীর গল্পও নয়—রীতিমত জীবন-মরণের সমস্যার কথা অথবা কোন মহাপুরুষের জীবন চরিত।

প্রভাব সকল সময় উপর হইতে নীচেই সংক্রামিত হয় না—প্রভার মত প্রভাবও নীচে হইতে উপরের দিকেও উঠিতে পারে। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সাহিত্যিকগণ কোন কোন বিষয়ে তরুণ সাহিত্যিকগণের মনোভাবে অল্পবিস্তর আবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "তারুণ্যের বিরুদ্ধে অসংযমের অভিযোগ কেন ? অসংযম ত তারুণ্যের পক্ষে স্বাভাবিক।" এ কথার উত্তরে আমি বলিতে চাই—সংযমই বরং তারুণ্যের পৌরুষদ্যোতক ধর্ম।—জরা আপনা হইতে বিধি-বিধানে

সংযত হইতে বাধ্য—প্রলোভনও তাহাকে কৃপা করিয়া ত্যাগ করিয়া যায়। যৌবনেরই সংগ্রাম করিবার, জয় করিবার শক্তি আছে; সংযম তাহার নিকটই প্রত্যাশা করিব। যেখানে জীবনের প্রাচুর্য্য, সেখানেই সংযমের ক্রিয়াশীলতা—জড়তায় বা জরায় সংযমের প্রসঙ্গই উঠে না।

যৌবনকেই জানিয়া রাখিতে হইবে, শৃঙ্খলের বাঁধনের মধ্যেও শৃঙ্খলা—'বিধি-বিধানের গণ্ডীর মধ্যেই স্বাধীনতা' ছাড়া কোন আর্টের সৃষ্টি হইতে পারে না। Unchartered freedom অথবা অবাধ অবল্গিত মুক্তির মধ্যে বুদ্ধির অপচয়ই ঘটে—শক্তির হরিল্লুট হইয়া যায়—কল্পনা ধূলোট উৎসবে মাতিয়া উঠে। সংযমই সকল শ্রীসৌষ্ঠব ও মাধুর্যের বৃন্তস্বরূপ—শিথিলতা তাহাকে জীর্ণ করিয়া তুলে। বিশ্ব-প্রকৃতিতেই হউক আর মানব-প্রকৃতিতেই হউক—রূপেই হউক আর রসেই হউক,—সকলের মূলে ঐ সংযম। সঙ্গীতাদি অন্যান্য শিল্পকলার পদ্ধতি বা প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করিলেই এ সত্য সহজেই ধরা যাইবে। অন্যান্য শিল্পকলারও যে ধর্ম, সাহিত্যেরও সেই ধর্ম। সাহিত্য কোন দিনই ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই।*

কাথাসাহিত্যের শ্রেণীভেদ

ছোট গল্প কথা-সাহিত্যের লিরিক। যিনি মানবজীবনধারাকে নিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করেন নাই,—জীবনের অপূর্ব বৈচিত্র্যলীলাকে আয়ত্ত করেন নাই,—মানব-মনকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করেন নাই—উৎকৃষ্ট ছোট গল্প তিনিও লিখিতে পারেন। কারণ, যে কোন একটা অনুভূতি, যে কোন একটা দৃশ্য বা ঘটনা অবলম্বনেই ছোট গল্প রচিত হইতে পারে। উপন্যাস-রচনায় সাফল্যলাভ করিতে হইলে ব্যাপকভাবে মানব-জীবনের অনুশীলন চাই। যাহারা বিচিত্র মানব-জীবনকে শুধু ভাসা-ভাসা চোখে দেখিয়াছে,—তাহারা উপন্যাসে যে সকল চরিত্র অঙ্কন করে—সে সকল চরিত্র সম্পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত মানুষ নয়। তাহারা নানা জীবনের নানা অংশ লইয়া এক-একটি চরিত্র সৃষ্টি করে। মানবজীবন সম্বন্ধে যাঁহার গভীর অভিজ্ঞতা আছে,— জীবনের বৈচিত্র্য যিনি গভীর অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই উপন্যাসে রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন।

---

* জঙ্গিপুর দেশবন্ধু-পাঠাগারের বাৎসরিক সম্মেলনের সভাপতির অভিভাষণ।

জীবন্ত মানুষের তুলনায় সে চরিত্র কম প্রাণবান্ নয়। তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে বৈচিত্র্যও থাকে যথেষ্ট। একাধিক চরিত্র একই ভাবের বা একই ঢঙের হইয়া পড়ে না—অর্থাৎ একটি মানুষই বিভিন্ন ছদ্মে বিভিন্ন নামে দেখা দেয় না। জীবন্ত মানুষবিশুদ্ধ মানবই হয়, দানবও হয় না,—দেবতাও হয় না। দোষগুণের ছায়ালোক-সম্পাতেই তাহার সৃষ্টি। তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রও সেজন্য ভাববিগ্রহ না হইয়া, দেব বা দানব না হইয়া খাঁটি মানুষই হয়।

যাঁহারা বিশিষ্ট কোন কোন নরনারীর জীবনকে চিত্রিত না করিয়া General Typeকে চরিত্র-স্বরূপ গ্রহণ করেন—অর্থাৎ এমন চরিত্র অঙ্কন করেন—যে চরিত্র সমগ্র একটি শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি-স্বরূপ, তাঁহাদেরও ব্যাপকভাবে বিচিত্র মানবজীবনকে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। কারণ, বহুকে না জানিলে তাহাদের প্রতিনিধিকে জানা হয় না।

প্রথমোক্ত শ্রেণীর ঔপন্যাসিক, 'ব্যক্তির জীবনের সহিত ব্যক্তির জীবনের,' দ্বিতীয়শ্রেণীর ঔপন্যাসিক 'শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর' সংঘাত-সংঘর্ষ ও সংশ্লেষ-বিশ্লেষ দেখান। উপন্যাস অগ্রসর হয় ঘটনা-পরম্পরায় ও চরিত্রগুলির মুখের স্বভাবসঙ্গত বক্তব্যের অভিব্যক্তিতে! আর একশ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন—তাঁহারা মানব-জীবনের বৈচিত্র্যের দিকে আদৌ অবহিত হন না, মানবজীবনের রূপ-বৈচিত্র্যকে ফুটাইয়া তোলাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়। তাঁহারা আপনার মনকেই অতি গভীর-ভাবে বিকলন বা বিশ্লেষণ করেন এবং আপন মনেরই নানাভাব ও অনুভূতির মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও সংশ্লেষ-বিশ্লেষকে লক্ষ্য করেন। ঐ ভাব ও অনুভূতিগুলিকেই রূপায়িত করেন এক-একটি চরিত্রে—মূর্তিদান করেন এক-একটি কল্পিত জীবনে। রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষের সঙ্গে সেই চরিত্রগুলির অবিকল মিল হয় না।

এক্ষেত্রে উপন্যাস ঘটনাপরম্পরার দ্বারা অগ্রসর হয় না—অগ্রসর হয় ভাবের সহিত ভাবের সংঘর্ষে চিন্তাসূত্র ধরিয়া, পাত্র-পাত্রীর কথোপকথনে—কখনও বক্তৃতায়, কখনও উচ্ছ্বাসে—কখনও যুক্তিধারায়,—কখনও তত্ত্ব-সমস্যার বিবৃতিতে। এইগুলি সবই শিল্পীর নিজস্ব—কেবল ভিন্ন-ভিন্ন পাত্রপাত্রীর চরিত্র ও প্রকৃতির অনুগত করিয়া তাহাদেরই মুখে বসানো মাত্র।

প্রথমশ্রেণীর ঔপন্যাসিক এবং কতকটা দ্বিতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকদের সৃষ্ট চরিত্র-গুলির নিজস্ব জীবনধারা, প্রকৃতির নিয়মানুসরণ করিয়া যে পথে চলে—ঔপন্যাসিকের লেখনীকে সেই পথেই চলিতে হয়। জীবনপথের ঐ যাত্রীগুলির কোথাও থামিবার কথা নহে—চিরকাল ধরিয়াই চলিবার কথা। ঔপন্যাসিক একস্থলে Thus far and

no farther বলিয়া থামাইয়া দিতে বাধ্য হন। তাই গ্রন্থে তাহাদের যাত্রা থামিয়া যায় বটে, কিন্তু পাঠকের মনের পথ ধরিয়া তাহারা সমান তালেই চলিতে থাকে।

তৃতীয় শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের চরিত্রগুলি অগ্রসর হয়—স্রষ্টার চিন্তাসূত্র ধরিয়া, তাহার ভাব-পরম্পরার ক্রমাভিব্যক্তি অনুসরণ করিয়া। ইহার একটা স্বাভাবিক অবসান আছে—একটা সমস্যা বা দ্বিধার সমাধান বা অবসানের মধ্যে আসিয়া তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এই শ্রেণীর উপন্যাসে অনেক সময় মনো হয়—ভাবুক সাহিত্যিক তাঁহার বিদ্যা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা, সমস্যা, তত্ত্ব ও মনোবিকলনের ফলকে অন্যভাবে বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ না করিয়া উপন্যাসের ভঙ্গীতে সরস করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। সেজন্য রসজ্ঞ সুধীগণ এই শ্রেণীর উপন্যাসকে উৎকৃষ্ট সাহিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও উচ্চশ্রেণীর কথাসাহিত্যের আখ্যা দেন না।

ঔপন্যাসিকতার বিভিন্ন প্রকৃতি বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য এইরূপ ভাগ করিয়া দেখা হইল মাত্র। প্রকৃত পক্ষে একই উপন্যাসের মধ্যে কোন চরিত্র বিশিষ্ট-ব্যক্তি-দ্যোতক, কোন চরিত্র শ্রেণী-বা-সম্প্রদায়ব্যঞ্জক, আবার কোন চরিত্র পরিকল্পিত-বিগ্রহ ভাব বা অনুভূতিমাত্র হইতে পারে। অনেক উৎকৃষ্ট উপন্যাসই সঙ্কর বা মিশ্র প্রকৃতির। শক্তিমান্ শিল্পী নানা শ্রেণীর চরিত্র লইয়াই একটি সুশৃঙ্খল ও সুসমঞ্জস সৌষম্য সৃষ্টি করিতে পারেন। সকল উপন্যাসেই মনোবিশ্লেষণের অল্পাধিক প্রয়োজন যে আছে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

কেবলমাত্র মনোবিকলনের ফলই উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে পারে না। মানবজীবনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে নিবিড় অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন উপন্যাসই সাফল্য বা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। মানবের জীবনধারাকে সমগ্রভাবে পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া কেবল ভাস-ভাসা দৃষ্টিতে দেখার ফলে অথবা কতকগুলি খণ্ড-সত্য বা খণ্ড-দৃশ্য একত্র আহরণের ফলে জোড়াতালি দিয়া যে চরিত্র-সৃষ্টি,—তাহার দ্বারা কোন উপন্যাসই জমিতে পারে না। ছোট গল্পকে তরলায়িত করিয়া অথবা প্রচণ্ড চেষ্টায় টানিয়া বাড়াইয়া অথবা একাধিক গল্প বা চিত্রকে কোন প্রকারে গ্রন্থিবদ্ধ করিয়া উৎকৃষ্ট উপন্যাস হয় না।

উপন্যাসের কলাসম্মত উপসংহার সৃষ্টিই সব চেয়ে কঠিন। বাংলার অনেক উপন্যাস যথাযোগ্য উপসংহারের অভাবে পঁতৎপ্রকর্ষ দোষে দুষ্ট। ঐতিহাসিক উপন্যাস আর এক শ্রেণীর উপন্যাস। এই উপন্যাসের সকল চরিত্রই ঐতিহাসিক না হইতে পারে। ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি বিধাতার সৃষ্টি। সেই চরিত্রের যথাযথতা বজায় রাখিতে হয়,—অক্ষুণ্ণ রাখাই উচিত। লেখকের কল্পিত

চরিত্রগুলিকে সৃষ্টি করিতে হয় অতীতযুগ এবং তাহার পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া। লেখকের অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল চরিত্রের সৃষ্টি নয়—সাধারণতঃ এসকল চরিত্র অতীত যুগের কোন সমাজ, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি রূপেই চিত্রিত হয়। ঐতিহাসিক উপন্যাসে সব চেয়ে বড় কথা ঐতিহাসিক পরিবেশ সৃষ্টি। আর দেখিতে হইবে উপন্যাস যেন ইতিহাসের শাসনেই থাকে ঔপন্যাসিক কল্পনা ইতিহাসের অনুসরণ ছাড়াইয়া না যায়। ইতিহাসের রঙ্গ মঞ্চ ভাড়া করিয়া কতকগুলি কল্পিত চরিত্র অভিনয় করিয়া না যায়। বঙ্কিমের রাজসিংহ আদর্শ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাণীর হাটকেও আদর্শ ঐতিহাসিক নাটক বলা চলে।

তালিকা ও মালিকা

চাণক্য মাণিক্য গণ্য বাণিজ্য লাবণ্য পণ্য
বেণু বীণা কঙ্কণ কফোণি
ফণাদ কঙ্কণ মণি স্থাণু পুণ্য বেণী ফণী
অণু বাণ আপণ বিপণি
কণিকা লাবণ্য বাণী গণিকা নিপুণ পাণি
গৌণ কোণ ভাণ শণ শাণ
চিক্কণ নিক্কণ তূণ মৎকুণ বণিকগুণ
শোণিত গণনা শেণে কাণ

ইহাকে নিশ্চয়ই কেহ কবিতা বলিবেন না। কিন্তু যে কোন প্রাচীন খণ্ডকাব্য খুলিলেই দেখা যায়, এই শ্রেণীর তালিকাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লওয়া হইয়াছে। প্রাচীন কবিগণ কেন যে নিঃশেষে বস্তু ও ব্যক্তির তালিকা দিয়া কাব্যের অঙ্গে অর্বুদের সৃষ্টি করিতেন—তাহা বলা কঠিন।

হেতু ছাড়া কোন কর্মই হয় না। বস্তুজগতের জ্ঞানের পরিচয় দিয়া তাঁহারা বোধ হয় আনন্দই পাইতেন। অবশ্য এই প্রথা ইহারা সংস্কৃত-কাব্য হইতেই পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু সংস্কৃতে শ্লেষ-যমকাদির তালিকা আছে—নায়িকার প্রত্যেক অঙ্গ ধরিয়া রূপবর্ণনার জন্য অলঙ্কারের তালিকা আছে, মালোপমার

তালিকা আছে—যেমন রামায়ণে সীতার মুখে 'যদন্তরং সিংহশৃগালয়োর্বনে ইত্যাদি।' কিন্তু নিছক নামের তালিকা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। অর্থাৎ সংস্কৃত কবির তালিকাগুলি প্রায়ই সব **মালিকা**।

প্রাচীন বাংলা-কাব্যে আমরা কোথাও দেখি ব্যঞ্জন বা ভোজ্য দ্রব্যের, কোথাও ফল, ফুল বা পশুপক্ষীর, কোথাও দেখি, কবি স্থানের তালিকা দিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন,—কোথাও বাণিজ্য-দ্রব্যের তালিকা দিয়া বণিক্-বিদ্যার, কোথাও ফল-ফসলের তালিকা দিয়া কৃষিবিদ্যার—কোথাও পূজোপচারের তালিকা দিয়া পৌরোহিত্য-বিদ্যার জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। আবার নানা প্রকার পশুর মাংসের তালিকা দিয়া ব্যাধ-কশাইয়ের বৃত্তির সংবাদও দিয়াছেন। এগুলি কাব্যের রসদৃষ্টিতে কোন সহায়তা করে নাই।—যাঁহারা প্রাচীন বাংলা সাহিত্য লইয়া তথাকথিত Thesis লিখিতেছেন, কেবল তাঁহাদেরই এগুলি কাজে লাগিতেছে।

এখানে একটি তালিকা উৎকলন করিয়া দেখাই। পাঠকের মনোযোগকে ক্লান্ত করা উদ্দেশ্য নয়, দীর্ঘতা দেখিয়া পাঠক একটা ধারণা করিয়া লউন।

চারিভিতে তরুলতা পশু-পাখীগণ।
সমাকুল শতদলে খঞ্জনী খঞ্জন॥
চকোর চকোরী নাচে চাহিয়া চপলা।
চিত্তচোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রাজহংস সহিতে নাচিছে শারী শুক।
চক্রবাক বকী বক বিহরে উলুক॥
কাক, কঙ্ক, কোকিল করিছে কলরব।
সবে শব্দ না শুনি সাক্ষাৎ চিত্র সব॥
ঘোরনাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
গদ্‌গদ্ গরুড় গোবিন্দ গুণগানে॥
হাঁটি যায় গরুড় গমন গুড়িগুড়ি।
গায় গোদা ভারুই গগন-মার্গে উড়ি॥
টেটারি টোটক টিয়া চটক চটকী।
ধানসাধি ধানফুলি ধাতক ধাতকী॥
ডাহুক ডাহুকী নাচে ডিমে দিয়ে তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উঁচু করি পা॥

মীনমুখে মাছরাঙা মানায় মহত।
প্রিয়ামুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত ॥
বাবুই বসন্ত-বউ রাঙা রায়মণি।
হরিগুণ গানেতে ময়না মহামুনি ॥
চঞ্চল চেতন চিত্র চায় চর্ম্মচিল।
কূর্ম্মকোলে কাঁককঙ্ক করে কিল্‌বিল ॥
জলপিপি ফিঙ্গা ফামি চাঁস বাঁশপাতা।
প্রবল কুবল পক্ষ চক্ষু যার রাতা ॥
তাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
রামসর শালিক শালিকী চিত্রখগ ॥
ইত্যাদি ইত্যাদি (ধর্ম্মমঙ্গল)

তালিকা দেওয়াই যখন তাঁহাদের প্রথার মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিল—তখন কেহ কেহ তালিকাকে মালিকায় পরিণত করিবার চেষ্টাও যে করেন নাই—তাহা নহে। উদাহরণস্বরূপ—(১) নায়িকার রূপবর্ণনায় প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সহিত কবিপ্রসিদ্ধি অনুযায়ী নানা দ্রব্যের উপমার তালিকা অনেকক্ষেত্রে মালিকার মাধুর্য্য লাভ করিয়াছে।

(২) কোন কোন বৈষ্ণব-কবির পদে অনুপ্রাসের তালিকা দেখা যায়। গোবিন্দ দাস এই প্রকার অনুপ্রাসের মালিকা গাঁথিয়াছেন। জগদানন্দ আবার একাক্ষরের অনুপ্রাসে একএকটি সমগ্র পদই লিখিয়াছেন। সেগুলিকে প্রহেলিকার মধ্যে গণ্য করা যাইতে পারে।

(৩) নানাবিধ বাক্যালঙ্কারের দৃষ্টান্তের তালিকা যে মালিকার গৌরব লাভ করিবে সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ভারতচন্দ্রকৃত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভা ও স্বভাবের বর্ণনার নাম করা যাইতে পারে।

(৪) স্বনগর-দর্শনে নারীগণের পতিনিন্দা একটা কবিপ্রসিদ্ধির মধ্যে গণ্য হইত,—এ পদ্ধতি সংস্কৃত হইতেই পাওয়া। ইহাও তালিকা ছাড়া কিছুই নয়। তবে কোন কোন কবি সেকালের রুচিসম্মত রসিকতা কিছু কিছু উহাতে যোগ দিয়া তালিকাকে কতকটা মালিকায় পরিণত করিয়াছেন।

(৫) 'অঙ্গদ-রায়বার'-জাতীয় রচনাও তালিকা। কিন্তু উহাতে একটু কৌতুকরস থাকায় মালিকায় পরিণত হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গের চেষ্টা সম্বন্ধেও এই কথা।

রাজসূয়-সভাবর্ণনা ও স্বর্ণ-লঙ্কার বর্ণনায় তালিকা দেওয়া হইয়াছে,—কিন্তু তাহার সার্থকতা আছে। অশ্বমেধের অশ্বের দেশ-পর্য্যটন সম্বন্ধেও ঐ কথা।

(৭) কতকগুলি গুণ-পরিচায়ক নামবাচক বিশেষ্য-বিশেষণের তালিকা দিয়া স্তব-রচনার পদ্ধতি ছিল। এই গুলিকেও মালিকার মধ্যে গণ্য করা যায়। প্রথমতঃ—এইগুলিতে ব্যবহৃত পরিচায়ক শব্দগুলির কিছু-কিছু সার্থকতা আছে, দ্বিতীয়তঃ—ভক্তিরস এই স্তবের প্রেরণা। পাঠকালে পাঠকের মনে ভক্তিরস সঞ্চারিত হয়। তৃতীয়তঃ—শব্দ-প্রয়োগের স্বাধীনতা থাকায় এই গুলির ছন্দো-বন্ধে একটু বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছিল—যেমন—

জয়—শিবেশ শঙ্কর বৃষধ্বজেশ্বর
মৃগাঙ্ক-শেখর দিগম্বর।
জয়—শ্মশান-নাটক বিষাণ-বাদক
হুতাশ-ভালক মহেশ্বর ॥
জয়—পুরারিনাশন বৃষেশবাহন
ভুজঙ্গভূষণ জটাধর।
জয়—ত্রিলোককারক, ত্রিলোকপালক
খলান্ধকারক হতস্মর।
(ভারতচন্দ্র)

(৮) আর একপ্রকার তালিকা প্রাচীন বাংলার প্রায় সকল কাব্যেই দেখা যায়—তাহার নাম 'বারমাস্যা।' বিরহী বা বিরহিণীর জীবনে মাসে মাসে প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন হয়,—তাহারই বর্ণনা। এই তালিকাটি কেবল মালিকা নয়—অনেক সময় কাব্যের কাছাকাছি হইয়া পড়িয়াছে।

(৯) শুক-সারীর দ্বন্দ্বচ্ছলে দুইজনের মুখ দিয়া রাধা-শ্যামের গুণবর্ণনার যে তালিকা—তাহা যে চমৎকার মালিকায় পরিণত হইয়াছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এইরূপ তালিকা দেওয়ার প্রথা কাব্য-সাহিত্য হইতে একেবারে তিরোহিত হয় নাই। দাশুরায়ের পাঁচালীকে মোটামুটি তালিকা-সাহিত্য বলিলে দোষ হয় না। দাশুরায় তালিকাকে অনেক ক্ষেত্রেই মালিকায় পরিণত করিয়াছেন—অবশ্য তখনকার গ্রাম্য রুচির বিচারে।

দাশুরায়কে বাদ দিলে ঈশ্বরগুপ্ত হইতে নবযুগ ধরা যাইতে পারে। গুপ্তকবি কেবল শ্লেষ-যমক অনুপ্রাসেরই তালিকা দেন নাই,—বস্তু-তালিকার দিকেও

তাঁহার ঝোঁক ছিল অত্যন্ত বেশী। তাঁহার ঋতুবর্ণনামূলক কবিতাগুলি গাছ-পালা ফল-ফসলের সপরিচয় তালিকা ছাড়া আর কিছুই নয়।

রঙ্গলাল তালিকায় কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হয় মনে করিতেন—

মরকত পদ্মরাগ বিদ্রুম বৈদুর্য্য।
রত্নরাজ হীরা যথা গ্রহপতি সূর্য্য॥
মণিময় মুক্তময় প্রকারে প্রকার।
গোস্তন নক্ষত্র মালা, আদি নানাহার॥
অঙ্গুরীয় কর্ণিকার কেয়ুর কটক।
কিঙ্কিণী কঙ্কণ কাঞ্চী মঞ্জীর হংসক॥
চূড়ামণি, চন্দ্রসূর্য কিরীট তরল।
ললাটিকা সীমন্তিকা রত্ন ঝলমল॥
বসিয়াছে সাজাইয়া তন্তুবায়গণ।
কৌষেয় রাঙ্কব ক্ষৌম কার্পাসবসন॥
দুকুল নিবীত চেলি চেলামি কাঁচুলি।
জড়িত জরির কাজে জলিছে বিজুলী॥
ইত্যাদি (কাঞ্চীকাবেরী)

দীনবন্ধুর সুরধুনী কাব্য প্রসিদ্ধ স্থান ও ব্যক্তিগণের পরিচয়ের তালিকা। সুরধুনী কাব্যছন্দে লেখা উত্তর ভারতের,—বিশেষতঃ বাংলাদেশের ভূগোল,—অতএব ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীণ তালিকা থাকিবারই কথা।

হেমচন্দ্র তালিকা দিয়াছেন—তবে এ শ্রেণীর নয়। পদ্মের মৃণাল দেখিয়া কবির মনে যত দেশের উত্থান-পতনের কথা মনে হইয়াছে, ক্রমান্বয়ে তাহাদের কথা বলিয়া গিয়াছেন।

রজনীকান্ত তাঁহার হাসির গানে তালিকা দিয়াছেন—

'রাজা অশোকের কটা ছিল হাতী ইত্যাদি'—অথবা 'কুমড়ার মত চালে ধরে র'ত ইত্যাদি' গান তালিকা হইলেও কৌতুকরসের গুণে মালিকার রূপ ধরিয়াছে।

এযুগে তালিকার কবিদের মধ্যে সতেন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহই নাই। অধিকাংশস্থলে তিনি তালিকাকেই মালিকায় পরিণত করিয়াছেন,—কোথাও কোথাও তালিকাই থাকিয়া গিয়াছে। অনেকে সত্যেন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক কবিতাগুলিকে ইতিহাসের ফিরিস্তিই বলিয়া থাকেন। কবি তাঁহার 'তাজমহল'

কবিতায় তাজমহল-নির্ম্মাণের উপাদানের রীতিমত তালিকাই দিয়াছেন। কোন স্থানের উপর কবিতা লিখিতে হইলে সত্যেন্দ্রনাথ সেই স্থানে যে যে ঘটনা ঘটিয়াছে এবং যাহা যাহা ইতিহাস বিখ্যাত বা ঐতিহ্-প্রসিদ্ধ আনুষঙ্গিক ব্যাপার স্থানটির সহিত বিজড়িত, তাহাদের তালিকা দিতেন। কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে লিখিতে হইলে তাঁহার গুণকর্ম্মের তালিকা না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। উদাহরণ-স্বরূপ—'নুরজাহান' কবিতার মধ্যাংশ।

দ্বিজেন্দ্রলাল দেশপ্রেমমূলক গানগুলিতে গৌরবের তালিকা দিলেও সংযমের গুণে যেগুলি বাঁচিয়া গিয়াছে বোধ হয়, গান বলিয়াই। সত্যেন্দ্রনাথ 'আমরা' কবিতায় প্রশস্ত পরিসর পাইয়া নিঃশেষে গৌরবের তালিকায় তাহা ভরিয়া তুলিয়ছেন। সত্যেন্দ্রনাথের স্তবজাতীয় কবিতাগুলি নামের তালিকা হইলেও ছন্দে পদবিন্যাস ও শ্রদ্ধার গুণে মালিকাত্ব লাভ করিয়াছে—উদাহরণস্বরূপ 'বুদ্ধ প্রশস্তি' কবিতাটির নাম করা যইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের বহু তালিকাই কাব্যের কাছা-কাছি হইয়া পড়িয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ—'দিল্লীনামার' নাম করা যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের যে সকল তালিকা মালিকার গৌরব লাভ করিয়াছে—তাহা কেবল বর্ণে ও লালিত্যে নয়,—সৌরভেও চমৎকার হইয়া উঠিয়াছে।

কুমুদরঞ্জনের 'গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড' তালিকার মত মনে হইলেও সত্যই উহা কবিতা হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য বহু কবিতায় কুমুদরঞ্জন—দৃষ্টান্তালঙ্কার, প্রতিবস্তূপমা ও উৎপ্রেক্ষার তালিকা দিয়াছেন। কিন্তু এইগুলিত শুধু তালিকা-মাত্র নহে—কাব্যের পৃথক রসবস্তুকে ফুটাইবার জন্যই ঐগুলির আবির্ভাব। যেখানে সংখ্যা অতিরিক্ত হয় নাই, যেখানে যেখানে Climaxএ উঠিয়া Anticlimax নামিয়া যায় নাই—যেখানে যেখানে অলঙ্করণে একটু বৈচিত্র্য ও অপূর্ব্বতা আছে,—সেখানে সেখানে তালিকা রসের পরিপোষণ করিয়া প্রকৃত কবিতারই অঙ্গীভূত হইয়া উঠিয়াছে।

কুমুদরঞ্জনের রচিত একটি প্রতিবস্তূপমার তালিকার এখানে উদাহরণ দিই। কবিতা হইয়া উঠে নাই বটে, তবে মালিকার গৌরব ইহাকে দিতেই হইবে।

> পাষাণ চেয়ে পাষাণ-প্রাচীর তাহার কঠিন গাত্রে,
> কেমন ক'রে ফুল ফোটালে একটি বাদল রাত্রে ?
> একটি নিশির শব-সাধনে এমন মহাসিদ্ধি !
> রূপ সাগরের প্রবালদ্বীপের এম্‌নি কি হয় বৃদ্ধি ?

রুদ্র নভে কর্‌লে কে এই রামধনুকের সৃষ্টি ?
তীব্রশোকের উগ্রবুকে এ কার সুধা-দৃষ্টি ?
আন্‌লে কে এই ভাবের জোয়ার এমন নীরস গদ্যে ?
নুরজাহানের জন্ম এযে ঊষর মরুর মধ্যে।

রজনীগন্ধার অধিকাংশ কবিতাই উৎপ্রেক্ষা, প্রতিবস্তূপমা, মালোপমা ইত্যাদি অলঙ্কারের মালিকা। তবে তৈজসের ইতিহাস, পুরাণো চিঠির ফাইল, ফুরসৎ, কৈশোর, দুঃখের রাজ্যে ইত্যাদি অন্তরের দরদের গুণে সত্যই কবিতা হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার সহযোগী আর একজন মালাকর-কবির একটি উৎপ্রেক্ষার মালিকা এখানে উৎকলন করি—

শ্রীহারের ফুল, নীহারের ভুল, ডহরের ফুল তুই
বাগবাগিচায় ঠাঁই নাই তোর, মাঘ-ফাগুনের যুঁই।
বাণীর চরণে ফুটুক কুন্দ ভক্তের প্রাঙ্গণে
রমার চরণে ফুটে থাক তুই ক্ষেতের একটি কোণে।
ক্ষেত্রমাতার নবজাতকের শুভ মঙ্গলাচারে,
খই হয়ে তুই ছড়ানো আছিস্ প্রান্তরে কান্তারে।
নববসন্ত প্রসূত বুঝি রে ব্যোমের সূতিকা-ঘরে,
দুধে হাসি তার ক্ষুদে ফুল হ'য়ে ফুটিলি কি থরে থরে।
অথবা শুনিয়া হৈমবতীর হিমময় বিদ্রূপ,
মুচকি হাসিল শঙ্কর, তোরা পুষ্পিত তারি রূপ ?
হরের বৃষভ নিজ শৃঙ্গের বপ্র-তুষার-ভার,
গ্রীবা আস্ফালি দিয়াছে ছড়ায়ে তোরা বুঝি কণা তার ?
দ্রোণ তোর নাম দ্রোণপুত্রের দুধের তৃষ্ণা বুঝি
ক্ষুদের মণ্ডে উঠেছিস্ ফুটি কাঙাল-গুরুর পুঁজি ?
তপন-রথের অয়ন-যাত্রা-পথ-তল খানি ভরা
তুই কি ফেনিল স্বেদের বিন্দু অশ্বকেশর-ঝরা ?
তৃপ্ত ভুবন শস্যসিন্ধু নিঃশেষে পান করি
সৈকতে তার শঙ্খশুক্তি তোরা বুঝি ছড়াছড়ি ?
নিঃস্ব আজিকে প্রান্তরভূমি, তুই সম্বল তার
কাঙালবধূর আয়তি-চিহ্ন যেমন শঙ্খসার।

(দ্রোণপুষ্প)

যতীন্দ্রনাথ কখনও কবিতায় তালিকা দেন না—কেবল 'হাটে' নামক কবিতাটিতে কাব্যরসের পরিপুষ্টির জন্য একটি তালিকা দিয়াছেন—সে তালিকাটিকে পৃথক করিয়া দেখিলেও মালিকা বলিয়াই মনে হইবে—

থোলোর আঙুর বোঁটা হ'তে আজও পায়নিক পূরা ছুটি,
মরেছে আপেল, ফুটে আছে তবু দু'গালে গোলাপ দুটি।
রসালের গালে গড়াল অশ্রু,আজও দাগ দেখা যায়,
কঠিন বেদনা বুকে টোল খে'ল কি জানি কি বেদনায়।
শিকায় টাঙানো তরমুজ নারে বহিতে আপন ভার।
ডালায় থাকানো কিসমিস ভাবে শুষ্ক জীবন তার।
বাসনায় বাঁধা ফেটে পড়ে ফুটি কি জানি কি স্মৃতিভারে,
বাক্সয় ঢাকা অঙরের মমি ঘুমায় রে সারে সারে।

(মরুমায়া)

কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার এত সুখ্যাতি, কিন্তু তাহা প্রকৃতপক্ষে তালিকা ছাড়া কিছুই নয়। নজরুল নিজেও বোধ হয় তাহা বুঝিয়াছেন, তাই ধন্য ধন্য পড়িয়া গেলেও, তিনি ঐ শ্রেণীর কবিতার আর পুনরাবৃত্তি করেন নাই।

তালিকা খুব জোর মালিকা হইয়া উঠিতে পারে, কবিতা হয় না—রবীন্দ্রনাথ তাহা ভাল করিয়াই বুঝেন। তাই তাঁহার অসংখ্য কবিতার মধ্যে কোথাও তালিকা নাই। তাঁহার 'মেঘদূত' ও 'সেকাল' ইত্যাদি কবিত-দুইটি অপর কাহারও হাতে পড়িলে খুব জোর ভালো মালিকা হইয়া উঠিত, এত চমৎকার কবিতা হইতে পারিত না।

কবির সজ্ঞান প্রয়াস ও বাসনা

চিত্তের যে রসাবেষ্টনীর মধ্যে রহিয়া কবি কবিতা রচনা করেন, সেই রসাবেষ্টনী-টিকে লইয়াই কবিতাটি সম্পূর্ণ। কবি আপন রচনাটি যখনই পাঠ করেন—তখনই তাঁহার চিত্তের চারিপাশে সেই মৌলিক রসাবেষ্টনীর আবির্ভাব হয়, সেজন্য নিজের রচনা কবির এত ভাল লাগে। কবিতাটি সুরচিত না হইলেও কবি তাহার মারফতে আপনার রসাবেষ্টনীকে ফিরিয়া পান এবং তাহার সাহায্যেই কবিতার সকল ত্রুটীর ক্ষতিপূরণ করিয়া লন। কবিতার অঙ্গহানিগুলি সঞ্চারিত রসাবেষ্টনীর মধ্যে হারাইয়া যায়। কবিতাপাঠকালে স্বতই তাঁহার মনের কুহর হইতে অভ্যস্ত পথে মাধুরী-ধারা ঝরিতে থাকে।

কিন্তু সুযোগ্য পাঠকের মনে কবিতাটিকেই তাহার রসাবেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে হইবে। পাঠকের মনেও যদি উহা ঐ ভাবের আবেষ্টনীর সৃষ্টি করিতে পারে, তবেই কবিতারচনা সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কবিতায় এমন ইঙ্গিত আভাস দিতে হইবে, এমন শব্দপ্রয়োগ ও অলঙ্কারবিন্যাস করিতে হইবে—এমন শৃঙ্খলা-সৌষম্যের সৃষ্টি করিতে হইবে, যেন তাহা পাঠ করিয়া পাঠকের মনে কবির নিজস্ব রসাবেষ্টনীও সঞ্চারিত করিতে পারেন। অর্থাৎ কবির রসাবেশের ও রস-পরিবেশের পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ না হইলে পাঠক-চিত্তে রসলোক জাগিয়া উঠিবে না। কবির অপ্রবুদ্ধ প্রয়াসে অনায়াসে যে ইহা হইতে পারে না—তাহা নয়, তবে তাহা অনিশ্চিত। সেজন্য সজ্ঞান প্রয়াসের প্রয়োজন। লোক-চরিত্রজ্ঞ ও পাঠকচিত্তজ্ঞ কবি নিশ্চয়ই জানেন পাঠক চিত্তে কিসে রসসঞ্চার হইবে। অপরের রচনায় কোন কোন বিশিষ্ট সৌষ্ঠব ও কি প্রকারের কৌশল-প্রয়োগ তাঁহার নিজের মনে রসসঞ্চার করে, কবির তাহা জানা আছে। অতএব নিজের রসাবেশের স্বতঃস্ফূর্ত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া কবিতাকে পাঠকচিত্তে রসসঞ্চারের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য সজ্ঞান প্রবুদ্ধ প্রয়াস করিয়া থাকেন।

তাহাতেই সমস্যার সমাধান হইয়া গেল না। পাঠকচিত্তের 'বাসনার' সঙ্গেও কবিতার সম্বন্ধ আছে। যে আলম্বন-বিভাব, অনুভাব, ভাব বা তত্ত্বকে অবলম্বন করিয়া কবিতাটি রচিত, যে উপকরণে কবিতাটি গঠিত, সেগুলির সংস্কার পাঠক-চিত্তে যদি না থাকে—তবে সজ্ঞান চেষ্টায় কবিতাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর করিয়াও লাভ নাই। অনুভূতির রাজ্যে এই সকলের অবস্থিতির নামই 'বাসনা'। কবিতায়

রসের ইঙ্গিত দেওয়া চলে - 'বাসনা' দেওয়া চলে না।

মহাকাব্য বা নাটকে কবি পাঠকচিত্তে ধীরে ধীরে বাসনার সৃষ্টি করিয়া ক্রমে রস-সঞ্চার করিতে পারেন। কিন্তু গীতিকাব্যে তাহা সম্ভব নয়। উদাহরণ স্বরূপ—যে পাঠকের মেঘদূত পড়া নাই বা মেঘদূত সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত' কবিতা, প্রথম শ্রেণীর কবিতা হইলেও, সে পাঠকের চিত্তে রসসঞ্চার কবিতে পারিবে না। বাংলার পল্লী-জীবন সম্বন্ধে যাহার কোন ধারণা নাই, সে রবীন্দ্রনাথের 'বধূ' কবিতার রস সম্যক্ উপভোগ করিতে পারিবে না। এইরূপে বহু কবিতা সুরচিত হইলেও পাঠক-চিত্তে তদনুযায়ী বাসনার অভাবে আদর পায় নাই। পাঠক-সাধারণের চিত্তে যে বাসনার অভাব নাই—সেই বাসনাকে অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কবিতা লিখেন, তাঁহাদের কবিতার রস বোধ করিবার পাঠক যথেষ্টই জুটে। আর যাঁহারা সে খোঁজ রাখেন না—তাঁহাদিগকে অতি অল্পসংখ্যক পাঠক ও নিরবধি কালের দিকেই চাহিয়া থাকিতে হইবে।

বর্তমান যুগের নাগরিক পাঠকরা যেভাবে প্রতিপালিত হইয়াছেন এবং যেরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন তাহাতে ভারতীয় তথা বঙ্গীয় সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁহাদের পরিচয়ই ঘটে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা দেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে—ইহার একটা কারণ সংস্কৃত শিক্ষাবিমুখতা এবং হিন্দু সংসারের ক্রমবিলুপ্তি। আমাদের সমাজে ও সংসারে পাশ্চাত্য জীবনের প্রভাব এখন ওতপ্রোত। আর পল্লীজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান যুগের নাগরিক যুবকদের যোগাযোগ নাই। ফলে, ভারতীয় তথা বাংলার সংস্কৃতি অবলম্বনে রচিত কবিতা পাঠকমনে যথাযোগ্য বাসনা না থাকায় একেবারেই মর্ম স্পর্শ করিতেছে না।

রসসঙ্কর

আলঙ্কারিকগণ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম এই নয়টী ভাবকে বলিয়াছেন মানব-হৃদয়ের স্থায়িভাব। তাঁহারা বলেন এই নয়টি ভাবই নয়টি রসে পরিণতি লাভ করিতে পারে।—বাকী অসংখ্য ভাবকে তাঁহারা বলেন—সঞ্চারী ভাব। তাহারা স্বতন্ত্র ভাবে রসে পরিণত হয় না—ঐ নয়টি স্থায়িভাবকেই রসে পরিণত হইতে সহায়তা করে—অর্থাৎ তাঁহারা বলিতে চাহেন কাব্যে ঐ নয়টি ভাবই মূলভাব - বাকী সমস্ত ভাব তাহাদের আনুষঙ্গিক পরিপোষক মাত্র। প্রত্যেক স্থায়ি ভাবের কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সঞ্চারী ভাব আছে—সেইগুলিই স্থায়িভাবকে রসে আস্বাদ্যমানতা দান করিতে পারে। কোন কবিতায় সেগুলি ছাড়া অন্যান্য অসগোত্র ভাব আসিয়া পড়িলে রসাভাস ঘটায়।

আলঙ্কারিকগণ আদিম মানব মনকে বিশ্লেষণ করিয়া যে মৌলিক ভাবগুলির দ্বারা হৃদয়ের গঠন নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাতে এ যুগের পরিণত মন সায় দেয় না। বর্ত্তমান যুগের রসজ্ঞগণের মতে স্থায়িভাবের সংখ্যা অনেক, নয়টি মাত্র নহে।—অলঙ্কারিকগণ যে গুলিকে সঞ্চারী ভাব বলিয়াছেন তাহাদের অনেক গুলিই আজকালকার রসজ্ঞদের মতে স্থায়িভাব। আজকালকার পরিণত মনে অনেক সঞ্চারী ভাবই স্থায়িভাবের রূপ লাভ করিয়াছে। ফলে—রসও আজকাল-কার রসজ্ঞগণের মতে নয়টি মাত্র নহে,—বহু; অর্থাৎ বহু সঞ্চারী ভাবই স্বতন্ত্র রস মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারে। কেবল আজকালকার রসজ্ঞ নহেন, প্রাচীন কালের অনেক আলঙ্কারিকেরও এই মত ছিল।

আলঙ্কারিকগণ কোন কোন রসের স্থায়িভাবের সহিত কোন কোন রসের স্থায়িভাবের সঞ্চারী রূপে মিলন হইতে পারে তাহার একটা তালিকা দিয়াছেন। যেমন—আদ্য ও বীররসে হাস, বীররসে ক্রোধ (রৌদ্ররসের স্থায়িভাব), শান্তরসে জুগুপ্সা (বীভৎস রসের স্থায়িভাব) সঞ্চারী রূপে মিলিত হয়। আবার কোন্ কোন্ রস কোন রসের বিরোধী তাহারও তালিকা দিয়াছেন—যেমন, আদ্যের বিরোধী করুণ, করুণের বিরোধী হাস্য, রৌদ্রের বিরোধী আদ্য ইত্যাদি। কিন্তু কবিগণ আলঙ্কারিকদের অনুশাসন না মানিয়া বিরোধী রসেরও অপূর্ব্ব সমন্বয় ঘটাইতে পারিয়াছেন যেমন,—মেঘদূতে আদ্যের সহিত করুণের অপূর্ব্ব সমন্বয়

হইয়াছে। অতুলবাবু কাব্য-জিজ্ঞাসায় মহাভারত হইতে দ্রৌপদীর যে উক্তি উৎকলন করিয়াছেন, তাহাতে রৌদ্রের সহিত বীর-করুণ যেমন মিশিয়াছে, আদ্ভরসও তেমনি মিলিয়াছে। আর যে Serio-comic রচনা আজকাল এক প্রকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতেছে তাহা হাস্যরসের সহিত করুণরসের মিলনেই সম্ভব হইয়াছে।

একটি শ্লোক সম্বন্ধে যে কথা চলিত আজকালকার একটি সমগ্র লিরিক সম্বন্ধে সে কথা খাটে না। একটি শ্লোকে একটি ভাবকে প্রাধান্য দেওয়া চলিত, এবং কোন ভাবের তাহাতে প্রাধান্য তাহা ধরা সহজ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের 'বহু শ্লোকে গঠিত' লিরিকে একাধিক ভাবের সামান প্রধ্যান্য থাকিতে পারে। অনেক সময় কোন ভাবটি প্রধান তাহা ধরা যায় না—ধরা গেলেও অপ্রধান ভাবটিরও স্বতন্ত্র সত্তা বেশ প্রকট থাকে। প্রধানকে পরিপুষ্টিদানই তাহার এক-মাত্র কাজ নয়। অনেক সময় তাহাকে বিশেষ পরিপুষ্টিদান করেও না। তাহার স্বতন্ত্র রসবত্তার মর্য্যাদায় সে কাব্যে স্থান পায়। অনেক সময় দুইটিতে মিলিয়া একটি তৃতীয় ভাবের দ্যোতনা করে।

বর্ত্তমান যুগের কবি পরস্পরবিরোধী ভাব অবলম্বনে রসাভাস না ঘটাইয়াও উৎকৃষ্ট সরস কবিতা রচনা করিতে পারেন, একই কবিতায় বিভিন্ন রসের কৌশলময় সমাবেশকে আমি রসসঙ্কর বলিব। কোন্ রসটি প্রধান তাহা নির্ণয় করিবার প্রয়াস না করিয়া কেবল বিভিন্ন রসের সমাবেশে কবির কৌশলে কিরূপে অপূর্ব্ব কবিতার সৃষ্টি হয় তাহাই আমার বক্তব্য।

মহাকবি যখন শকুন্তলার পতিগৃহ-যাত্রাকালে শকুন্তলার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—"হলা পিয়ম্বদে, ণং অজ্জউত্তদংসণুস্সুআএ বি অস্সমপদং পরিচ্চসন্তীএ দুক্খেণ মে চলন পুরোমুহা নিবড়ন্তি,"—তখন তিনি অপূর্ব্ব কাব্যের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন। একদিকে পতিসঙ্গলাভের প্রত্যাশিত আনন্দ, আর একদিকে চিরদিনের স্নেহের অঙ্ক পরিত্যাগের বেদনা। এই দুই ভাবের দ্বন্দ্ব কাব্যকে চমৎকার করিয়াছে। এখানে শকুন্তলার মনের অন্তর্গূঢ় আনন্দটুকু কারুণ্যকে পরিপোষণ করিতেছে না, কারুণ্যের তীব্রতার হ্রাসই করিতেছে, কারুণ্যকে সহনীয় ও উপভোগ্য করিতেছে।

তপস্বিনী উমাকে যখন মহাদেব ছলনা করিতে আসিয়া প্রাণ ভরিয়া উমার উপাস্য দেবতার অর্থাৎ নিজেরই নিন্দা করিলেন তখন উমার রোষে অধরদেশ কম্পিত, ভ্রূলতা আকুঞ্চিত, লোচনযুগল রক্তবর্ণ। সহসা মহাদেব আত্মপ্রকাশ

করিলেন। তখন—

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টি
নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতীকরা কুলিতেব সিন্ধুঃ
শৈলাধিরাজ-তনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ।

রোষভাবের অনুভাবগুলি মিলাইতে না মিলাইতেই বেপথু, স্বেদ ইত্যাদি সত্ত্বভাবের সমুদ্গম। এখানে রোষভাব রসভাবকে পরিপুষ্ট করিতেছে কিনা করিতেছে তাহা বুঝি না—তবে দুইভাবের অবিরলিত পারম্পর্য্যে যে অপূর্ব্ব কাব্যের সৃষ্টি হইল তাহাই বুঝি।

ভাবসঙ্করে অপূর্ব্ব রসসৃষ্টির সাক্ষাৎ পাই প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদের বহু রচনাতেই।—প্রেমের বিবিধ লীলাবর্ণনায়, অভিমানিনীর কঠোর তিরস্কার ও অভিশাপে, —খণ্ডিতা নারীর ব্যঙ্গোক্তিতে,—নায়িকার 'বাহিরে বাম অন্তরে দক্ষিণ' লজ্জাভিনয়ে,—উপভুক্তার চিত্তে সম্ভোগ মধু ও স্মরগরলের মিশ্রণে—দৈহিক নিপীড়নের সঙ্গে অন্তর্গূঢ় আনন্দের অভিব্যক্তির মধ্যে ভাবসঙ্কর অপূর্ব্ব রস সৃষ্টি করিয়াছে।

বৈষ্ণব কবির—
দুহুঁ ক্রোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।

অথবা

আমার অন্তর যেমন করিছে তেমনি হউক সে।

অথবা

ভুজঙ্গে আনিয়া কলসে পুরিয়া যতনে তাহাকে পুষে।
কোন এক দিন সেই বাদিয়ারে দংশয়ে আপন রোষে॥
ভুজঙ্গ সমান যেন তুয়া মন তোহার চলন বাঁকা।
তোমার অন্তর সেইসে সোসর এ দুই তুলনা একা॥
যেন মুখে আছে অমিয়া কলসী হৃদয়ে বিষের রাশি।
অন্তরে কুটিল মুখে মধুপুর আমরা এমন বাসি॥

অথবা

আরে মোর আরে মোর সোণার বঁধুর।
অধরে কাজর দিল কপোলে সিঁদূর॥

বদন-কমলে কিবা তাম্বূল শোভিত।
পায়ের নখের ঘায় হিয়া বিদারিত॥
সাধিলে মনের সাধ কি আর বিচার।
দূরে রহু দূরে রহু প্রণাম আমার॥

অথবা

আহা আহা বঁধু তোমার শুকায়েছে মুখ।
কে সাজাল হেন সাজে হেরে বাসি দুখ।
কপালে কঙ্কণ দাগ আহা মরি মরি।
কে করিল হেন কাজ কেমন গোঙারী।
দারুণ নখের ঘা হিয়াতে বিরাজে।
রক্তোৎপল ভাসে যেন নীল সরঃ মাঝে।
কোন পাষাণী যার দেখি হেন রীতি।
কে কোথা শিখালে তারে এ হেন পীরিতি॥
ছল ছল আঁখি দেখি মনে ব্যথা পাই।
কাছে বসো আঁচলেতে মু'খানি মুছাই।

'ধীরা মধ্যা খণ্ডিতা' নায়িকা বক্রোক্তিময় মিষ্ট ভাষায় অপরাধী নায়ককে ভর্ৎসনা করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু এই মিষ্ট ভর্ৎসনা তীব্র বাক্য-বাণের অপেক্ষা কম নিদারুণ নহে। বৈষ্ণব কবিগণ নায়ক-নায়িকার মুখে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি বসাইয়া রস-সঙ্করের বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই কবিতাগুলিতে গভীর প্রেমজাত অভিমানের সহিত মধুর-রসের পরিপন্থী কপট ভক্তিরসের অদ্ভুত মিশ্রণও ঘটিয়াছে। পদকল্পতরু ১০ম পল্লব হইতে ধীরা, মধ্যা, খণ্ডিতা শ্রীরাধা সহিত, রজনীতে চন্দ্রাবলীর সহিত বিলাস অন্তে প্রাতে সমাগত শ্রীকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তির তিনটী বিচিত্র পদ ব্যাখ্যা সহ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। শ্রীরাধার উক্তি :—

"আকুল চিকুর চূড়োপরি চন্দ্রক ভালহিঁ সিন্দূর দহনা।
চন্দন-চান্দ মাহা মৃগমদ লাগল তাহে বেকত তিনি নয়না॥
মাধব! অব তুহুঁ শঙ্কর দেবা।
জাগর-পুণ-ফলে প্রাতরে ভেটলুঁ দূরহি দূরে বহু সেবা॥ ধ্রু॥
চন্দন-রেণু-ধূসর ভেল সব তনু সোই ভসম সম ভেল।
তোহারি বিলোকনে মঝু মনে মনসিজ মনরথ সঞে জরি গেল॥

তবহুঁ বসন ধর কাহে দিগম্বর শঙ্কর নিয়ম উপেখি।
গোবিন্দ দাস কহই পর-অম্বর গণইতে লেখি না দেখি॥

পদকল্পতরুর ব্যাখ্যা

শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণে শঙ্করত্ব প্রতিপাদিত করিবার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—তোমার কেশ-পাশ আলুলিত; চূড়ার উপর ময়ূর-পুচ্ছ (সর্প-ফণাকৃতি); ললাটে (সংলগ্ন) সিন্দূর অগ্নি-স্বরূপ। (ললাটের) শ্বেত চন্দনের চন্দ্রাকৃতি ফোঁটার মধ্যে (নায়িকার ললাটের) কস্তুরী-বিন্দু সংলগ্ন হইয়াছে,—তাহাতে তৃতীয় নয়ন ব্যক্ত হইল। হে মাধব, এখন তুমি (কন্দর্প-ধ্বংসকারী) শঙ্কর-দেব। তোমার উদ্দেশে সংযমপূর্ব্বক রাত্রি-জাগরণের ফলে প্রাতে তোমার সাক্ষাৎ পাইলাম; (সামান্যা নারী আমার পক্ষে তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করার অধিকার নাই তাই) দূরে দূরে থাকিয়াই আমার প্রণাম রহুক। চন্দনের রেণুতে (তোমার) সর্ব্ব অঙ্গ ধূসর; উহা ভস্মবৎ দৃষ্ট হইয়াছে; তোমার দৃষ্টিতে আমার হৃদয়ে কন্দর্প সমস্ত কাম-বাসনার সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ত্রস্ততা বশতঃ ভুল ক্রমে অপর নায়িকার বস্ত্র পরিধান করিয়া সমাগত হওয়ায় শ্রীরাধা উহা লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে অপ্রতিভ করার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—এরূপ অবস্থায়ও দিগম্বর শঙ্কর তুমি, নিয়ম উপেক্ষা করিয়া কেন বসন পরিধান করিয়াছ বুঝিতে পারি না। গোবিন্দ-দাস কহিতেছেন—পরের বস্ত্র (নিজস্ব নহে বলিয়া) গণনায় ধরাও যায়—না-ও ধরা যায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যুক্তি:—

"সহজই গোরি রোখে তিন লোচন কেশরি জিনি মাঝ খীণ।
হৃদয় পাষাণ বচনে অনুমানিয়ে শৈল-সুতাকার চীন।
সুন্দরি! অব তুহুঁ চণ্ডি-বিভঙ্গ।
যব হাম শঙ্কর তুয়া নিজ কিঙ্কর মোহে দেয়বি আধ অঙ্গ॥ ধ্রু॥
কালিয় কুটিল ভাঙ্গু-যুগ-ভঙ্গিম সম্বরু তাকর দম্ভ।
পশুপতি দোখে রোখ নাহি সমুঝিয়ে হাম নহ শুম্ভ নিশুম্ভ॥
দহন মনোভবে তোহি জিয়ায়বি ইসত হস বর দানে।
তুয়া পরসাদে বাদ সব খণ্ডয়ে গোবিন্দদাস পরমাণে॥

(শ্রীকৃষ্ণ নিজের উপর আরোপিত শঙ্করত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া শ্রীরাধাকে অপ্রতিভ করার জন্য বলিতেছেন)—তুমি স্বভাবতই গৌরী (এক অর্থে—গৌরাঙ্গী; অপর অর্থে আদ্যাশক্তি বলিয়া পার্ব্বতী); ক্রোধে তোমার তিন

চক্ষু হইয়াছে অর্থাৎ সাধারণ লোকে দুইটি চক্ষু দ্বারা যাহা দেখিতে পায় না, এরূপ অনেক বস্তুও এখন তুমি রাগের বশে দেখিতে পাইতেছ; ইহা দ্বারা তোমার অতিরিক্ত আর একটি চক্ষুর অস্তিত্ব প্রমাণিত হইতেছে; (গৌরী) ক্ষীণ-মধ্য কেশরীকে পরাজিত (অর্থাৎ পদানত) ও নিজ বাহন করিয়াছিলেন,—তোমার ক্ষীণ মধ্য-দেশ কেশরীকে অর্থাৎ কেশরীর ক্ষীণ কটিকে (কৃশতায়) পরাজিত করিয়াছে; তোমার হৃদয় যে পাষাণ, তাহা তোমার (পাষাণবৎ কঠিন) বাক্যেই অনুমান হইতেছে; এ সমস্তই পাষাণ-নন্দিনীর চিহ্ন বটে।

হে সুন্দরি! এমন তুমি চণ্ডীর (এক অর্থে—গৌরীর; অন্য অর্থে—কোপন-স্বভাবা নায়িকার) ভাব-ভঙ্গী ধারণ করিয়াছ। যখন আমি শঙ্কর তোমার নিজ দাস, তখন (হর গৌরীর ন্যায়) আমাকে তোমার অর্ধ অঙ্গ দিতে হইবে। তোমার ভ্রূ-যুগলের ভঙ্গী কালো ও কুটিল (বঙ্কিম); তুমি আমার দর্প চূর্ণ কর; তাহা হইলেই ত কুটিল কালিয়ার দর্প চূর্ণ হইবে। পশুপতির (এক অর্থে—মহাদেবের; অন্য অর্থে—গো-রক্ষক গরীব বেচারার) দোষে (তোমার) ক্রোধ (সঙ্গত) মনে হয় না; আমি শুম্ভ নিশুম্ভ নহি; (তাহা হইলে বরং তোমার ক্রোধের যোগ্য পাত্র হইতে পারিতাম)। (শঙ্কর-রূপী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-মাত্র শ্রীরাধার হৃদয়-স্থিত মদন ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে—এই কথার প্রত্যুত্তরে বলিতেছে) দগ্ধ কন্দর্পকে (অমৃতবৎ মৃতসঞ্জীবন-শক্তি-বিশিষ্ট) তোমার ঈষৎ হাস্যরূপ বর-প্রদানে পুনর্জীবিত করিবে; তোমার প্রসন্নতায় সকল বিপদ বিদূরিত হয়—(এ সম্বন্ধে) গোবিন্দদাসই প্রমাণ।

পুনশ্চ শ্রীরাধার উক্তি :—

রজনি গোঙায়লি রতি সুখ সাধে।
বিহানে তেজলি তাহে কোন অপরাধে॥
সোই চণ্ডি তুহুঁ শঙ্করদেব।
তনু-আধ দেয়ব তাহে যাই সেব॥ ধ্রু॥
কি কহব যে সব কয়লি তুহুঁ কাজ।
লাজ পায়বি অব রঙ্গিণী-সমাজ॥
ভাগল সহচরি না বোলই কোই।
পলটি চলল মুখে আঁচর গোই॥
বসন হেরি অঙ্গে ভাঙ্গল দ্বন্দ্ব।
পুন কি কহব তোহে কৈতব ছন্দ॥

গোবিন্দদাস চললি আগুসারি।
আয়ল মন্দিরে কোই লখই না পারি॥

পদে শব্দার্থ প্রাঞ্জল; অতএব অন্বয়-মুখে ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; শ্রীরাধা বলিতেছে—আমি কেন চণ্ডী (অত্যন্ত-কোপনা ও পার্ব্বতী) হইতে যাইব? সমস্ত রজনী যাহার সহিত রতি-সুখ সম্ভোগ করিয়া, বিনা অপরাধে প্রাতে তাহাকে ত্যাগ করিয়া আসিলে, চণ্ডী হওয়া তাহার পক্ষেই ত সাজে; তাই ধ্রুব-কলিতে বলিলেন "সোই চণ্ডী তুহুঁ শঙ্কর দেব" ইত্যাদি। (পদকল্পতরু)

দাশু রায় রসসঙ্করের সিদ্ধ কবি ছিলেন। যেমন—শ্রীরাধিকার মুখে কৃষ্ণের কালো রূপের নিন্দা—

বিষকুম্ভ পয়োমুখ স্বভাব ধরে শঠে।
(তোমার) অন্তরের গুণ সব আমার জানা বটে॥
গুণের কথা গুণমণি গুণে বলতে পারি।
রূপ যে তোমার কালোরূপ পরের মন্দ কারী॥
দেখ—সংসারেতে যত কালো কালারই সমান।
কাল অঙ্গ কাল ভুজঙ্গ দংশিলে যায় প্রাণ॥ ইত্যাদি—

রামপ্রসাদ যখন বলেন—

মা মা ব'লে আর ডাক্‌ব না।
দিয়েছ দিতেছ কত যন্ত্রণা—
অথবা—এবার কালী তোমায় খাব
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে অম্বলে সম্বরা দেব।

অথবা শিবভক্ত ভারতচন্দ্র যখন দক্ষের মুখ দিয়া তাঁহার গুণ বর্ণনা করাইয়াছেন—অথবা শিবের ভিক্ষাযাত্রার চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন—তখন দুইটি বিরোধী রসকেই মিলাইয়াছেন।

কবিরাজ গোস্বামী যখন বলিয়াছেন—

এই প্রেমা আস্বাদন   তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ
মুখ জলে, না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে   তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন।—

তখন বিভিন্ন রসের মিলনের কথা বলিয়াছেন। বৈষ্ণব কবিগণের অনেকেই এই মিশ্র রসকে কাব্যে রূপদান করিয়াছেন।

বাঙ্গালার আগমনী-বিজয়ার গানে ও উমাসাহিত্যে মাতৃহৃদয়ের স্বস্তি অস্বস্তির বিরোধী ভাবের দ্বন্দ্ব অপরূপ রূপ লাভ করিয়াছে।

একই কবিতায় একটি রসের অন্তরালে ব্যঞ্জনার ছায়ায় আর একটি রস অবস্থান করিতে পারে,—এক রসের কবিতার অন্তরে ফল্গুধারার মত আর একটি রস প্রবাহিত হইতে পারে,—একটি রস ক্রমে আর একটি রসে পরিণত হইতে পারে,—একটি রসের অভিব্যক্তির পর আর একটি রসের অভিব্যক্তি আরব্ধ হইতে পারে,—দুইটি রস-ধারা পাশাপাশি প্রবাহিত হইতে পারে,—দুইটি রসের সূত্র পরস্পর অনুস্যূত হইয়া রহিতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক রস মিলিয়া একটি তৃতীয় রসের দ্যোতনা করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ, বর্ষশেষ, পুরাতন ভৃত্য, শাহ্‌জাহান, হৃদয়-যমুনা, পুরস্কার ইত্যাদি কবিতায় আমরা দেখিতে পাই, এক রস আর এক রসে ধীরে ধীরে কেমন পরিণতি লাভ করিয়াছে।

'নিশীথে ও প্রাতে' নামক কবিতাটির প্রথম অংশ আরব্ধ হইয়াছে এইভাবে—

কালি মধু যামিনীতে জ্যোৎস্না নিশীথে কুঞ্জ কাননে সুখে,
ফেনিলোচ্ছল যৌবন সুরা ধরেছি তোমার মুখে।

দ্বিতীয় অংশ আরব্ধ হইয়াছে—

আজি নির্ম্মল বায় শান্ত উষায় নির্জ্জন নদীতীরে
স্নান অবসানে শুভ্র বসনে চলিয়াছ ধীরে ধীরে।

এখানে একটি কবিতাতেই একটি রসের অভিব্যক্তির পরই তাহার বিরোধী রসের অভিব্যক্তি। ইহাতে রসাভাস ত হয়ই নাই রসসৃষ্টির বৈচিত্র্যই সম্পাদিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের 'সুখ দুঃখ' নামক কবিতাটির এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি পড়িলেই সকলের সে কবিতাটি মনে পড়িবে—

বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে
হাজার লোকের হর্ষধ্বনি সবার উপরে।

* * *

চেয়ে আছে নিমেষ হারা নয়ন অরুণ,
হাজার লোকের মেলাটিরে করেছে করুণ।

মরণ কবিতায়—

একদিকে—শুনি শ্মশান-বাসীর কলকল
ওগো—মরণ হে মোর মরণ,
সুখে—গৌরীর আঁখি ছলছল
তাঁর—কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর—বাম আঁখি ফুরে থরথর
তাঁর—হিয়া দুরু দুরু দুলিছে,
তাঁর—পুলকিত তনু জরজর
তাঁর—মন আপনারে ভুলিছে।
অন্যদিকে—তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
ক্ষ্যাপা—বরেরে করিতে বরণ—
তাঁর—পিতা মনে মানে পরমাদ
ওগো—মরণ, হে মোর মরণ।

কবির মনের এই দুইটি বিরোধী ভাবধারা স্বতন্ত্রভাবে রসরূপ লাভ করিয়া তৃতীয় একটি রসের দ্যোতনা করিতেছে। রাজা নাটকের অনেকগুলি গানে কবি পরস্পরবিরোধী ভাব ও রসের সমন্বয় সাধন করিয়াছেন।

একটি রসের অন্তরালে আর একটি রসের ধারা রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতার মধ্যেই দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'হতভাগ্যের গানের' নাম করা যাইতে পারে। কয়েকটি পংক্তি তুলিলেই কবিতাটি মনে পড়িবে—

যৌবরাজ্যে বসিয়ে দে মা লক্ষীছাড়ার সিংহাসনে,
ভাঙা কুলোয় করুক পাখা তোমার যত ভৃত্যগণে।
দগ্ধভালে প্রলয় শিখা দিক মা এঁকে তোমার টীকা,
পরাও সজ্জা লজ্জাহরা জীর্ণ কন্থা, ছিন্ন বাস,
হাস্য-মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।

কবি বলিয়াছেন,—তাঁহার জীবনবীণায় সরু তার ও মোটা তারে জড়াইয়া গিয়াছে—সেই দুটি তার অনেক সময় দুইটি স্বতন্ত্র রসেরই দ্যোতক—তাহাতে যে ঝঙ্কার উঠিয়াছে তাহা রসসঙ্করের অপূর্ব্ব সৃষ্টি। কবির অধ্যাত্ম-সঙ্গীতগুলিতে সংসার ও বৈরাগ্য দুইই আপন আপন নিজস্ব রসের যোগান দিয়াছে।

কবি নিতান্ত লীলাচ্ছলে এমন সকল কবিতা রচনা করিয়াছেন, যাহাদের মধ্যেও দুই প্রকারের রস, সরু তার ও মোটা তারের মত তাঁহার মজলিসী

বীণাতেও জড়াইয়া গিয়াছে—তাহাতেও রসাভাস ঘটে নাই। উদাহরণস্বরূপ,—ধর্ম্মপ্রচার, নবদম্পতীর প্রেমালাপ ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যতত্ত্বের মতে ভক্তিরসের সংযোগে মধুর রসের কবিতায় রসাভাস হয়। কিন্তু কবির কৌশল এমনি যে—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস ইত্যাদি কবিগণ রসাভাস না ঘটাইয়া ভক্তিরসের সহিত মধুর রসের মিশ্রণে উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের কবি তাঁহাদের অনুকরণে মিশ্ররসের যে কবিতা লিখিয়াছেন তাহার একটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলিয়া দিলাম—অবশ্য কবিতাটি খণ্ডিতা অভিমানিনী রাধার জবানী—

বাহুর ডোরে কেমন ক'রে বাঁধবো তোমায় প্রিয় ব'লে ?
প্রণাম লহ, আজকে হ'তে তুমি আমার দেবতা হ'লে।
ক্ষমা কর এ অনাথার তোমার' পরে অত্যধিকার
সোহাগিনীর সজ্জা আমার লজ্জানলে যায় যে জ্বলে'।
তোমার লাগি রাত্রি জাগি পালি উপবাসের ব্রত ;
দেখতে পেলাম প্রভাতে শ্যাম, এলে ব্রতের ফলের মত।
দাসী আমি দাসীর ভাবে ধন্য হবো চরণ লাভে,
পায়ের ধূলা দাও দাসীরে, টেন না আর সোহাগ-কোলে।
ক্ষমা করো পূজারিণীর পা ঠেকেছে তোমার গায়ে,
গাঁথা মালার ডোর ছিঁড়ে ফুল অঞ্জলি দিই তোমার পায়ে।
ক্ষমা করো মূঢ়ার প্রমাদ ভক্তিহীনার সেবাপরাধ,
এখন শুধু জীবনে সাধ, পাই যেন ঠাঁই ও পায় ম'লে॥

বৈষ্ণবকবিগণ তাঁহাদের পদাবলীতে ভণিতা দেওয়ার সময় রাধার দুঃখে সহানুভূতিচ্ছলে কৃষ্ণকে চোর, শঠ, প্রবঞ্চক, নিষ্ঠুর, অবোধ ইত্যাদি বলিয়া বহু নিন্দাই করিয়াছেন ;—কিন্তু কে না জানে সেই আপাতরূঢ়তার অন্তরালে গভীর ভক্তি বিরাজ করিতেছে ? বর্ত্তমান যুগের কবির কাব্যে এই জাগতিক 'সৃষ্টি'ই (Creation) যেন সেই রাধা। কবি এই সৃষ্টির সম্বন্ধে অবিচার-ক্ষুব্ধ হইয়া বৈষ্ণব-কবিদের মত কেবল স্রষ্টার প্রতি রূঢ় বচনই প্রয়োগ করেন নাই, সৃষ্টির পক্ষ হইতে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে অনেক কথাই শুনাইয়াছেন—ঐ রসের অন্তরালেও বৈষ্ণব কবিদের মত গভীর ভক্তিরস বা সখ্যরস নিহিত রহিয়াছে।

আমি বিশেষ করিয়া মরীচিকার কবি যতীন্দ্রনাথের কথা এখানে বলিতেছি—যতীন্দ্রনাথ মূলতঃ রসসঙ্করের কবি। তাঁহার 'বন্ধুকে' উদ্দেশ করিয়া রচিত

কবিতাগুলিতে একটি রসের অন্তরালে অন্য একটি রস প্রবাহিত। তাঁহার Serio-Comic ভঙ্গীতে লেখা বহু কবিতারই হাস্যফেনিলতার অন্তরালে গভীর কারুণ্য-ধারা প্রবাহিত হইতেছে। মানুষ শুধু স্ফূর্ত্তিতেই হাসে না—গভীর দুঃখেও হাসে —গভীর বেদনাতে সে নিয়তিকে উপহাস করে—নিজের কর্ম্মফল, নিজের বুদ্ধি এবং সৃষ্টির অঙ্গহানি লইয়াও বড় দুঃখেই সে রসিকতা করে। তাহার আত্ম-গ্লানিও অনেক সময় ব্যঙ্গ-কৌতুকে পরিণত হয়।

যতীন্দ্রনাথের কবিতার ব্যঙ্গকৌতুক, উপহাস ও রসিকতার অন্তরালে গভীর বেদনার ফল্গুধারাই তাঁহাকে রসসঙ্করের কবি করিয়া তুলিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গের গোবিন্দদাস রসঙ্করের কবি। অবশ্য স্বীকার করি—কোন কোন কবিতায় তাঁহার রসসঙ্কর আস্বাদ্যমানতা না বাড়াইয়া রসাভাস ঘটাইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ, উলঙ্গ রমণী, আমার ভালবাসা ইত্যাদি কবিতার নাম করা যাইতে পারে। কিন্তু—

প্রেমদা পদ্মার কূলে কোমল শেফালি ফুলে
রচিয়া বাসর-শয্যা ডাকিছে আমায়,
সারদা চিলাই তীরে আমকাঠ দিয়া শিরে
আঁচল বিছায়ে ডাকে চিতা বিছানায়।
নাহি নিশি নাহি দিন দুজনেই নিদ্রাহীন
দুই দিকে দুই সিন্ধু গর্জ্জিছে সমানে,
পাষাণহৃদয় স্বামী পানামা-যোজক আমি
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে নামি দুজনার টানে।
যদি কভু ভুলে চুকে কারো নাম আনি মুখে,
অমনি আরেক জন অভিমানে ভোর,
না নড়িতে চুল কণা সাপিনীরা ধরে ফণা
ভয়ে ভয়ে সদা আছি হয়ে গরুচোর।
কিবা ঘুম কিবা জাগা দুজনে পিছনে লাগা,
পারি না তিষ্ঠিতে বড় পড়েছি ফাঁপরে,
একটু নাহিক স্বস্তি জ্বালায়ে ফেলিল অস্থি
হায় হায় লোকে কেন দুই বিয়া করে।

এই কবিতায় কবি রসসঙ্কর সাধনে সাফল্যলাভ করিয়াছেন।

কবি মোহিতলাল পাশাপাশি কেমন দুইটি রসকে এক সঙ্গে ফুটাইয়াছেন,

তাহার একটি উদাহরণ—

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কল ভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে
দীপ মিটি-মিটি, শেষ হয় রাত
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠ জড়ায় ছোট হাতখানি বুকে আসে।
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কলভাষে।
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়—দ্বিধাহারা,
রাধা ও ম্যাডনা একাধারা।
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী
একি অপরূপ রূপের লাবণি!
সুন্দর, তব একি ভোগবতী মরমপরশী রসধারা,
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায় দ্বিধাহারা।

কবিতা পাঠের ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূতে' "কাব্যের তাৎপর্য" নিবন্ধে বলেছেন—"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। * * অনেকে বলেন আঁটিটাই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফলকাম হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভ ফুল হইতে কেহবা তাহার রঙ বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে,

কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

কাব্যবিচারের মূল কথা এই অনুচ্ছেদেই উপনিবদ্ধ আছে। এত সহজ সরলভাবে কাব্যধর্মের সার কথা আর কেউ বলেন নি। কবিগুরু বলতে চেয়েছেন—রসই কবিতার পক্ষে মুখ্য, তা ছাড়া অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়, তবে তা গৌণ। রসপিপাসু চিত্তে অন্য কিছুর প্রত্যাশা না করেই কবিতা পাঠ করতে হবে, তথ্য তত্ত্ব, সংশিক্ষা ইত্যাদি যদি পাওয়া যায় তবে তা উপরি পাওনা, সে পাওনাকে উপেক্ষা করলেও চলে। সমালোচক, অধ্যাপক ও সাহিত্য-পঞ্জীকারদের কাজ গৌণ বস্তুর সন্ধান। রসবিচার ও সমালোচনা এক নয়। রস উপভোগ ও তত্ত্বজ্ঞানলাভও এক নয়। রসানন্দ ও বোধানন্দ এক বস্তু নয়।

গাভীর দুগ্ধের দিকে যার প্রখর দৃষ্টি, তার কাছে গাভীর পীন আপীনটাই বড়। বৎসলতার প্রতিমূর্তি গাভীর বৎসের অঙ্গলেহন-বিগলিত মাতৃমমতা তার মর্ম স্পর্শ করে না বা তা চোখে পড়ে না। হংসের ডিম্বেই যার প্রয়োজন হংসের গ্রীবাভঙ্গাভিরাম রূপটি তার উপভোগে আসে না।

হৈমবত প্রদেশে যারা স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন, ঐশ্বর্যপ্রদর্শন অথবা বিলাসকেলি-কুতূহল চরিতার্থ করবার জন্য ভ্রমণে যায়, হিমালয়ের রাজশ্রী ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য তাদের মুগ্ধ করে না। এমন কি, তীর্থদর্শনের জন্য যারা যায়, দেবতাত্মা সর্বদেবময় হিমালয়ের উদাত্ত মহিমা তাদের চোখে পড়ে না।

কাব্যেও যারা গৌণ অবান্তর বস্তুর সন্ধান করে, কাব্যের মুখ্য দান হ'তে তারা বঞ্চিত হয়।

কাব্য মুক্তাফলের মত। আয়ুর্বেদীর চোখে এর ভস্মটারই মূল্য বেশী। মুক্তাকে অলঙ্কার ক'রে যারা পরে, তাদের কাছে মুক্তার দুর্লভতাই গৌরবের বস্তু। কথিত আছে, মোগল-রাজপুরনারীদের মুক্তাচূর্ণ ছিল তাম্বূলের উপাদান। মুক্তার প্রকৃত গৌরব ও মূল্যবত্তা তার অঙ্গের ছায়াতারল্য বা লাবণ্যে। শব্দ-কল্পদ্রুমে এ লাবণ্যের পরিচয় দেওয়া আছে—

তাহার একটি উদাহরণ—

পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কল ভাষে,
প্রিয়া বাঁধিয়াছে বাহুপাশে
দীপ মিটি-মিটি, শেষ হয় রাত
শিশু আর পাখী আনিছে প্রভাত,
বড় হাত মোর কণ্ঠ জড়ায় ছোট হাতখানি বুকে আসে।
পাশে শুয়ে শিশু করিছে আকুল কলভাষে।
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়—দ্বিধাহারা,
রাধা ও ম্যাডনা একাধারা।
অধরে মদিরা, নয়নে নবনী
একি অপরূপ রূপের লাবণি!
সুন্দর, তব একি ভোগবতী মরমপরশী রসধারা,
বধূ ও জননী পিপাসা মিটায় দ্বিধাহারা।

কবিতা পাঠের ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূতে' "কাব্যের তাৎপর্য" নিবন্ধে বলেছেন—"কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়, তখন স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কেহ বা সৌন্দর্য, কেহ বা নীতি, কেহ বা তত্ত্ব সৃজন করিতে থাকেন। * * অনেকে বলেন আঁটিটাই ফলের প্রধান অংশ এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়। কিন্তু তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁটি ফেলিয়া দেন। তেমনি কোন কাব্যের মধ্যে যদিবা কোন বিশেষ শিক্ষা থাকে তথাপি কাব্যরসজ্ঞ ব্যক্তি তাহার রসপূর্ণ কাব্যাংশটুকু লইয়া শিক্ষাংশটুকু ফেলিয়া দিলে কেহ তাঁহাকে দোষ দিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা আগ্রহসহকারে কেবল শিক্ষাংশটুকুই বাহির করিতে চাহেন, আশীর্বাদ করি তাঁহারাও সফলকাম হউন এবং সুখে থাকুন। আনন্দ কাহাকেও বলপূর্বক দেওয়া যায় না। কুসুম্ভ ফুল হইতে কেহবা তাহার রঙ বাহির করে, কেহবা তৈলের জন্য তাহার বীজ বাহির করে,

কেহবা মুগ্ধনেত্রে তাহার শোভা দেখে। কাব্য হইতে কেহবা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহবা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহবা নীতি, কেহবা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন—আবার কেহবা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না।—যিনি যাহা পাইলেন তাহাই লইয়া সন্তুষ্টচিত্তে ঘরে ফিরিতে পারেন—কাহারও সহিত বিরোধের আবশ্যক দেখি না—বিরোধে ফলও নাই।"

কাব্যবিচারের মূল কথা এই অনুচ্ছেদেই উপনিবদ্ধ আছে। এত সহজ সরলভাবে কাব্যধর্মের সার কথা আর কেউ বলেন নি। কবিগুরু বলতে চেয়েছেন—রসই কবিতার পক্ষে মুখ্য, তা ছাড়া অন্য কিছু যদি পাওয়া যায়, তবে তা গৌণ। রসপিপাসু চিত্তে অন্য কিছুর প্রত্যাশা না করেই কবিতা পাঠ করতে হবে, তথ্য তত্ত্ব, সংশিক্ষা ইত্যাদি যদি পাওয়া যায় তবে তা উপরি পাওনা, সে পাওনাকে উপেক্ষা করলেও চলে। সমালোচক, অধ্যাপক ও সাহিত্য-পঞ্জীকারদের কাজ গৌণ বস্তুর সন্ধান। রসবিচার ও সমালোচনা এক নয়। রস উপভোগ ও তত্ত্বজ্ঞানলাভও এক নয়। রসানন্দ ও বোধানন্দ এক বস্তু নয়।

গাভীর দুগ্ধের দিকে যার প্রখর দৃষ্টি, তার কাছে গাভীর পীন আপীনটাই বড়। বৎসলতার প্রতিমূর্তি গাভীর বৎসের অঙ্গলেহন-বিগলিত মাতৃমমতা তার মর্ম স্পর্শ করে না বা তা চোখে পড়ে না। হংসের ডিম্বেই যার প্রয়োজন হংসের গ্রীবাভঙ্গাভিরাম রূপটি তার উপভোগে আসে না।

হৈমবত প্রদেশে যারা স্বাস্থ্যোন্নতিসাধন, ঐশ্বর্যপ্রদর্শন অথবা বিলাসকেলি-কুতূহল চরিতার্থ করবার জন্য ভ্রমণে যায়, হিমালয়ের রাজশ্রী ও প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য তাদের মুগ্ধ করে না। এমন কি, তীর্থদর্শনের জন্য যারা যায়, দেবতাত্মা সর্বদেব-ময় হিমালয়ের উদাত্ত মহিমা তাদের চোখে পড়ে না।

কাব্যেও যারা গৌণ অবান্তর বস্তুর সন্ধান করে, কাব্যের মুখ্য দান হ'তে তারা বঞ্চিত হয়।

কাব্য মুক্তাফলের মত। আয়ুর্বেদীর চোখে এর ভস্মটারই মূল্য বেশী। মুক্তাকে অলঙ্কার ক'রে যারা পরে, তাদের কাছে মুক্তার দুর্লভতাই গৌরবের বস্তু। কথিত আছে, মোগল-রাজপুরনারীদের মুক্তাচূর্ণ ছিল তাম্বূলের উপাদান। মুক্তার প্রকৃত গৌরব ও মূল্যবত্তা তার অঙ্গের ছায়াতারল্য বা লাবণ্যে। শব্দ-কল্পদ্রুমে এ লাবণ্যের পরিচয় দেওয়া আছে—

মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥

এই যে লাবণ্য, তাই উৎকৃষ্ট কবিতার সর্বাঙ্গে টলটল করতে থাকে। এই লাবণ্য যাকে মুগ্ধ করে সেই হ'ল কাব্যের আসল জহুরী।

কবিতা মুক্তার সঙ্গে অন্য কারণেও উপমেয়। সমুদ্রগর্ভের শুক্তির মধ্যে বালুকণা প্রবেশ ক'রে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এই আঙ্গিক অস্বস্তিকে নিরাময় করবার জন্য শুক্তিদেহ হ'তে একটা রসের ক্ষরণ হয়। তাই ঘনীভূত হয়ে মুক্তার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সৎকবিতাই এই মুক্তার মত অপ্রকৃতিস্থ কবি-চিত্তের একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি। সিসৃক্ষার আকুলতা ছাড়া এই অস্বস্তি আর কিছু নয়। এ, ই, হাউসম্যানের উক্তি এই কথার সমর্থন করে—

If I were obliged, not to define poetry, but to name the class of things to which it belongs, I should call it a secretion; whether a natural secretion like turpentine in the fir or a morbid secretion like the pearl in the oyster.

Christopher Morley রচিত কয়টি চরণ এখানে তোলা যেতে পারে।

The pearl is a disease of the oyster,
A poem is a disease of the spirit,
Caused by the irritation of a granule of Truth
Fallen into that soft gray bivalve we call the mind.

আদিকবিতার জন্মকথায় এই সত্যেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাধের শর কেবল ক্রৌঞ্চের বুকে নয়, আদিকবির বুকেও আঘাত ক'রে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। সেই অস্বস্তিই রামায়ণী ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল।

কবিমনে শুধু কবিতাসৃষ্টির একটা গূঢ় সূত্র এতে পাওয়া যায় না, সকল সৃষ্টির মূলে এইরূপ একটা অস্বস্তি থাকে। পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতেই এই অস্বস্তির নিরসন,—তারই নাম সৃষ্টির আনন্দ।

কবির সৃজনীশক্তি যে পাঠকের চিত্তেও সৃজনীশক্তির উদ্রেক করে, তাও এইভাবে। এই ভাবেই কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাধর্ম্য নিরূপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি কথামালঞ্চের মালাকার। বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর মালঞ্চে অনেক ফুলই ফুটত। মালিনী রাজশুদ্ধান্তে সে ফুল যুগিয়ে মূল্য আদায় করত, তাতে

তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'ত। এতে অসাধারণতা কিছু নেই। 'সুন্দর' এসে সেই ফুলে এমন মালাই গাঁথলেন প্রাণের আকৃতি দিয়ে, যাতে 'বিদ্যাদেবী'ও বাঁধা পড়লেন। কবিই এই 'সুন্দর'। কোন কথাই নতুন নয়, সবই পুরাতন; ফুলের মতই রাশি রাশি কথা মুখে মুখে ফুটছে, সেই কথা বেচে অনেকেই অন্ন সংস্থান করে। পুরাতন কথাগুলিকে কবি একটি আবেগময় ভাবসূত্রে এমন করেই গাঁথেন, যাতে পণ্ডিতদের 'বিদ্যা'ও মোহিত হয়ে কবির বশীভূত হয়ে পড়ে।

কবিকল্পনার কাজ আর রসায়নের কাজ একই। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ দুই অর্থেই কবিকর্ম রসায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। ধাতু, ক্ষার, দ্রাবক ইত্যাদির মত সব ভাবই পুরাতন। রাসায়নিক মিলনে ঐসব ধাতুক্ষারাদি এমন অভিনব রূপ ধারণ করে যে, তাতে উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাহ্যত; বিলুপ্ত হয়ে যায়। কবিচিত্তের রসাগারে তেমনি বিভিন্ন ভাবের রাসায়নিক মিলন ঘটে, তাতে পুরাতন ভাবগুলিই নবকলেবর লাভ করে। কবিগুরু তাই বলেছেন—

"যাহা ছিল চিরপুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।"

রসজ্ঞ পাঠক চিরপুরাতন হারাধনকে অভিনবরূপে ফিরে পাওয়ার গভীর আনন্দ লাভ করে। অতএব, ভাব, তথ্য, তত্ত্ব, ঘটনা, দৃশ্য বা কাহিনী নতুন নয় ব'লে সৎকবিতাকে উপেক্ষা করা চলে না,—সৃষ্টিটা নতুন, অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ল কিনা তাই দেখতে হবে। আমাদের মনে কত দৃশ্যের, কত ঘটনার, কত ভাববস্তুর রূপরূপান্তরের ছায়াপাত হচ্ছে দিনের পর দিন। এই রূপচ্ছায়াগুলি (Imageries) গৃহিণীপনার অভাবে আমাদের মনোভাণ্ডারে বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকে।

কবিকল্পনার গৃহিণীপনার গুণে কবির মনোভাণ্ডারের রূপ হয় স্বতন্ত্র। ঐ মনোভাণ্ডার চিত্রশালায় পরিণত হয়। কবিতা এই চিত্রশালার সৃষ্টি। যাদের মনে ঐ সকল রূপচ্ছায়া বিশৃঙ্খল হয়ে রইলেও সংরক্ষিত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, তারাই কবির সৃষ্টিতে মোহিত হয়, কবিকল্পনার গৃহিণীপনার মহিমা তারাই বোঝে, অন্যের পক্ষে এর কোন মূল্য নেই।

আমাদের চিত্তে ভাবের সঙ্গে অনুভূতির অবিরত সংঘর্ষ ঘটছে, মাঝে মাঝে মিলনও ঘটছে। আমরা মিলনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি না। কবিচিত্তে এই মিলন যখন রাজযোটকতা লাভ করে, তখনই কবির প্রতিভা তাতে প্রাণবীজ বপন করে। সেই বীজ জীবদেহের স্বাভাবিক উন্মেষধর্ম

মুক্তাফলেষুচ্ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে ॥

এই যে লাবণ্য, তাই উৎকৃষ্ট কবিতার সর্বাঙ্গে টলটল করতে থাকে। এই লাবণ্য যাকে মুগ্ধ করে সেই হ'ল কাব্যের আসল জহুরী।

কবিতা মুক্তার সঙ্গে অন্য কারণেও উপমেয়। সমুদ্রগর্ভের শুক্তির মধ্যে বালুকণা প্রবেশ ক'রে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করে। এই আঙ্গিক অস্বস্তিকে নিরাময় করবার জন্য শুক্তিদেহ হ'তে একটা রসের ক্ষরণ হয়। তাই ঘনীভূত হয়ে মুক্তার সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সংকবিতাই এই মুক্তার মত অপ্রকৃতিস্থ কবি-চিত্তের একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি। সিসৃক্ষার আকুলতা ছাড়া এই অস্বস্তি আর কিছু নয়। এ, ই, হাউসম্যানের উক্তি এই কথার সমর্থন করে—

If I were obliged, not to define poetry, but to name the class of things to which it belongs, I should call it a secretion; whether a natural secretion like turpentine in the fir or a morbid secretion like the pearl in the oyster,

Christopher Morley রচিত কয়টি চরণ এখানে তোলা যেতে পারে।

The pearl is a disease of the oyster,
A poem is a disease of the spirit,
Caused by the irritation of a granule of Truth
Fallen into that soft gray bivalve we call the mind.

আদিকবিতার জন্মকথায় এই সত্যেরই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্যাধের শর কেবল ক্রৌঞ্চের বুকে নয়, আদিকবির বুকেও আঘাত ক'রে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি করেছিল। সেই অস্বস্তিই রামায়ণী ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল।

কবিমনে শুধু কবিতাসৃষ্টির একটা গূঢ় সূত্র এতে পাওয়া যায় না, সকল সৃষ্টির মূলে এইরূপ একটা অস্বস্তি থাকে। পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টিতেই এই অস্বস্তির নিরসন,—তারই নাম সৃষ্টির আনন্দ।

কবির সৃজনীশক্তি যে পাঠকের চিত্তেও সৃজনীশক্তির উদ্রেক করে, তাও এইভাবে। এই ভাবেই কবিচিত্তের সঙ্গে পাঠকচিত্তের সাধর্ম্য নিরূপিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

কবি কথামালঞ্চের মালাকার। বিদ্যাসুন্দরের মালিনীর মালঞ্চে অনেক ফুলই ফুটত। মালিনী রাজশুদ্ধান্তে সে ফুল যুগিয়ে মূল্য আদায় করত, তাতে

তার অন্নবস্ত্রের সংস্থান হ'ত। এতে অসাধারণতা কিছু নেই। 'সুন্দর' এসে সেই ফুলে এমন মালাই গাঁথলেন প্রাণের আকৃতি দিয়ে, যাতে 'বিদ্যাদেবী'ও বাঁধা পড়লেন। কবিই এই 'সুন্দর'। কোন কথাই নতুন নয়, সবই পুরাতন; ফুলের মতই রাশি রাশি কথা মুখে মুখে ফুটছে, সেই কথা বেচে অনেকেই অন্ন সংস্থান করে। পুরাতন কথাগুলিকে কবি একটি আবেগময় ভাবসূত্রে এমন করেই গাঁথেন, যাতে পণ্ডিতদের 'বিদ্যা'ও মোহিত হয়ে কবির বশীভূত হয়ে পড়ে।

কবিকল্পনার কাজ আর রসায়নের কাজ একই। বাচ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ দুই অর্থেই কবিকর্ম রসায়ন ছাড়া আর কিছু নয়। ধাতু, ক্ষার, দ্রাবক ইত্যাদির মত সব ভাবই পুরাতন। রাসায়নিক মিলনে ঐসব ধাতুক্ষারাদি এমন অভিনব রূপ ধারণ করে যে, তাতে উপাদানগুলির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বাহ্যত; বিলুপ্ত হয়ে যায়। কবিচিত্তের রসাগারে তেমনি বিভিন্ন ভাবের রাসায়নিক মিলন ঘটে, তাতে পুরাতন ভাবগুলিই নবকলেবর লাভ করে। কবিগুরু তাই বলেছেন—

"যাহা ছিল চিরপুরাতন তারে পাই যেন হারাধন।"

রসজ্ঞ পাঠক চিরপুরাতন হারাধনকে অভিনবরূপে ফিরে পাওয়ার গভীর আনন্দ লাভ করে। অতএব, ভাব, তথ্য, তত্ত্ব, ঘটনা, দৃশ্য বা কাহিনী নতুন নয় ব'লে সৎকবিতাকে উপেক্ষা করা চলে না,—সৃষ্টিটা নতুন, অপূর্ব ও সর্বাঙ্গসুন্দর হ'ল কিনা তাই দেখতে হবে। আমাদের মনে কত দৃশ্যের, কত ঘটনার, কত ভাববস্তুর রূপরূপান্তরের ছায়াপাত হচ্ছে দিনের পর দিন। এই রূপচ্ছায়াগুলি (Imageries) গৃহিণীপনার অভাবে আমাদের মনোভাণ্ডারে বিশৃঙ্খলভাবে বিকীর্ণ হয়ে পড়ে থাকে।

কবিকল্পনার গৃহিণীপনার গুণে কবির মনোভাণ্ডারের রূপ হয় স্বতন্ত্র। ঐ মনোভাণ্ডার চিত্রশালায় পরিণত হয়। কবিতা এই চিত্রশালার সৃষ্টি। যাদের মনে ঐ সকল রূপচ্ছায়া বিশৃঙ্খল হয়ে রইলেও সংরক্ষিত থাকে, বিলুপ্ত হয় না, তারাই কবির সৃষ্টিতে মোহিত হয়, কবিকল্পনার গৃহিণীপনার মহিমা তারাই বোঝে, অন্যের পক্ষে এর কোন মূল্য নেই।

আমাদের চিত্তে ভাবের সঙ্গে অনুভূতির অবিরত সংঘর্ষ ঘটছে, মাঝে মাঝে মিলনও ঘটছে। আমরা মিলনকে সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে পারি না। কবিচিত্তে এই মিলন যখন রাজযোটকতা লাভ করে, তখনই কবির প্রতিভা তাতে প্রাণবীজ বপন করে। সেই বীজ জীবদেহের স্বাভাবিক উন্মেষধর্ম

অনুসরণ ক'রে সজীব, সুষম, সুসমঞ্জস ও চিরন্তন সৃষ্টি হয়ে ওঠে। যারা ঐরূপ মিলনের মাধুর্য উপভোগ করে, (কিন্তু তাকে প্রাণবীজের অভাবে চিরন্তন করে তুলতে পারে না) তারাই কবির সৃষ্টির মহিমা সহজে উপলব্ধি করে। তারাই কবির আদর্শ পাঠক। অন্যের পক্ষে কবির রচনাপাঠ 'শুকের পঠন' মাত্র।

কাব্যলক্ষ্মী যখন আসেন, তখন তিনি তাঁর নিজস্ব ছন্দ-সুর-ভাষার বাহনে আরোহণ করেই আসেন। কবিতা তার আকৃতিপ্রকৃতি, পরিমিতি, পরম্পরা, পরিণতি সবই সঙ্গে ক'রে কবির লেখনীমুখে আবির্ভূত হয় অর্থাৎ কবির মনের মধ্যেই তার অধিকাংশ রচিত হয়, কবির লেখনী শুধু রঙের উপর রসান চড়ায়। 'কবি রচনা করেন' না বলে 'কবির মনে রচিত হয়' বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হয়। এ, ই, হাউসম্যান কবিতারচনার প্রথম স্তরের প্রসঙ্গে বলেছেন—

I think the production of poetry, in its first stage, is less an active than a passive and involuntary process.

প্রথম স্তরটি যেন কাব্য-প্রতিমার একমেটে দোমেটে দুইই। তারপর রঙ, তারপর রঙের উপর রসান। এই তত্ত্ব ব্যক্ত করার জন্য রবীন্দ্রনাথকে জীবন-দেবতা, অন্তর্যামী ইত্যাদির কল্পনা করতে হয়েছে। কোন উৎকৃষ্ট কবিতা পড়লেই রসজ্ঞ পাঠকের কাছে এই তত্ত্বটি সহজে উপলব্ধ হবে।

যে-সকল কবিতা কবির মনের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করবার আগেই বাণী-রূপ পায়, কবির সেই সকল কবিতাই অপকৃষ্ট রচনা, অকালপ্রসূত সন্তানের মত দুর্বল, অকালপক্ব ফলের মত অস্বাদু!

কবিতার রসনিষ্পত্তি হয় কবি ও রসজ্ঞ পাঠক উভয়ের ভাবধারার মিলনে। অতএব রসোপত্তি ব্যাপারে পাঠকের দায়িত্ব অল্প নয়।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত চারি চরণই চরম কথা—

"একাকী গায়কের নহে তো গান মিলিতে হবে দুইজনে।
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।"

অনেকের ধারণা আছে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষা থাকলেই বুঝি কবিতার রস-বোধে অধিকার জন্মে। এ-ধারণা ভ্রান্ত। রসবোধের জন্য স্বতন্ত্র সাধনা ও অনু-শীলন করতে হয়, আদর্শ রসজ্ঞের উপদেশমত। সকল কবিতা সকল পাঠকের জন্য নয়। এক এক শ্রেণীর কবিতা এক এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য। সকল শ্রেণীর

কবিতার রস উপলব্ধি করতে পারে এমন পাঠক দুর্লভ।

সংস্কারমুক্ত মনে কবিতা পাঠ করতে হবে, কিন্তু বাসনামুক্ত মনে পাঠ করলে চলবে না। কোন কবিতার ভাব-বস্তু ও অন্যান্য উপাদান উপকরণ সম্বন্ধে যার ধারণা নেই, তার পক্ষে সে কবিতার রস গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এই ধারণাকেই বলে 'বাসনা'।

কবিতাপাঠকালে পাঠক যদি তাতে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নেন, তা হ'লে পরমান্নে কর্পূর-সংযোগের মত ফল হবে।

চেতোদর্পণ মার্জিত না হলে অর্থাৎ পাঠকের মন সংস্কারের মালিন্য হতে মুক্ত না হলে তাতে কবিতার ভাবরূপ সম্যক প্রতিফলিত হয় না।

আর, পাঠকের যদি কবিতার টেকনিক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান না থাকে, তা হলে তার কাছে গদ্য-পদ্য দুইই সমান।

ভবভূতি সমানধর্মার প্রত্যাশায় দৃশ্য কাব্য রচনা করেছিলেন। সকল কবিই তাঁর মত মুখে না বললেও তাই করেন। কবির সঙ্গে সাধর্ম্য না থাকলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাব্যপাঠ ব্যর্থ হয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর রস আস্বাদ করতে হলে কীর্তনের সুর সংযোগে তা শুনতে হয়, নাটকের রস উপভোগ করতে হ'লে রঙ্গমঞ্চে তার অভিনয় দেখতে হয়। কবিতার রস উপভোগ করতে হলে সুকণ্ঠে তার আবৃত্তি শুনতে হয় কিংবা সযত্নে আবৃত্তি ক'রে পড়তে হয়। একবার চোখ বুলিয়ে কেবল মোটামুটি ভাবটাই জানা যায়। উৎকৃষ্ট কবিতা শ্রুতিধ্বনির সঙ্গে যুগনদ্ধভাবে পরিকল্পিত। অতএব ধ্বনি বাদ গেলে, শ্রুতির সঙ্গে সহযোগিতা বর্জন করলে পুরো রস উপভোগ সম্ভব নয়।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেছেন—অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতিঃ কর্ণেষু বর্ষতি মধুধারাম্।

অর্থবোধ না হলেও উৎকৃষ্ট কবিতা কেবল যথাযথ আবৃত্তির গুণে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এই উপভোগকে বলে অপ্রবুদ্ধ উপভোগ। গীতিকবিতার পক্ষে এই অপ্রবুদ্ধ উপভোগের মূল্য কম নয়।

কবিতার সুরেরও একটা বাণী আছে—সে বাণী রসজ্ঞের শ্রুতি ধরতে ও বুঝতে পারে। কবিতার নিজস্ব ভাষা যদি না-ই বোঝা যায়, সুরের ভাষা বুঝলেও রসাস্বাদন ঘটে। রচনাকালে কবি এই সুরের ভাষা বা বাণীর দিকেও লক্ষ্য রাখেন। সুরধ্বনির ভাষা কবিতায় অস্ফুট হয়ে থাকে, আবৃত্তির গুণে তা

সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে।

কবিতায় বাগ্‌বিন্যাসের সৌষম্য, চাতুর্য এবং সূক্ষ্ম কারুকলা মনে মনে পড়লে হারিয়ে যায়। আবৃত্তিতে সে সব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, ভাব ধারার উদাত্ত ও অনুদাত্ত লীলা এবং হৃদয়াবেগের তরঙ্গিত গতি আবৃত্তিতেই বাঙ্ময় রূপ লাভ করে।

চোখে আঙুল

কেহ যদি চোখ বুজিয়া থাকে, কিছুই দেখিতে না চায়, অথবা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, তবে বিবিধ চেষ্টার দ্বারা, অথবা জোর করিয়া তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয়। ইহাকেই বলা হয় 'চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো।' সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁহার শ্যামা মাকে বলিয়াছিলেন—"চোখে আঙুল না দিলে পরে দেখ্‌বি না মা বিচার ক'রে।" রামপ্রসাদ তাই উদাসীনা শ্যামা মার খোসামুদি না করিয়া তাঁহার অবিচার সম্বন্ধে এখন সব কঠোর সত্য কথা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন যাহা আর কেহ শুনাইতে সাহস করে নাই। ইহার নামই চোখে আঙুল দেওয়া। শ্যামা বাংলা মার সন্তানেরাও সহজে কিছু দেখিতে বা শুনিতে চায় না। তাহাদের দৃষ্টি ও শ্রুতি আকর্ষণের জন্য চোখে আঙুল দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই, যাঁহারা স্বজাতির চোখে আঙুল দিয়া দেখাইতে পারিয়াছেন তাঁহারাই তাড়াতাড়ি জাতির অবধান আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। অবসাদে নির্বিকার জাতির অবধান আকর্ষণ করাটাই সবচেয়ে কঠিন কাজ। যাঁহারা চোখে আঙুল দিতে পারেন না, তাঁহাদের রচনা যতই উৎকৃষ্ট হউক তাঁহারা দেশের লোককে শুনাইতে বা পড়াইতে পারেন না। একটা কিছু অভিনব বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়া সাহিত্যের কোন অঙ্গে অতিরিক্ত এম্‌ফ্যাসিস দিয়া, অত্যুচ্চগ্রামে কণ্ঠস্বরকে তুলিয়া অবধান আকর্ষণই চোখে আঙুল দেওয়া। অর্ধচেতন গতানুগতিক জাতির পক্ষে ইহার প্রয়োজন আছে। এই চোখে আঙুল দেওয়ার সতর্ক চেষ্টা ও কৌশলকেই আজকালকার সমালোচকরা লেখকের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গণ্য করেন।

রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ শিল্পিজনোচিত আদর্শ সংযম ও স্থরুচি পাঠকের চোখে আঙুল দেওয়ার বিরোধী ছিল। তাই জনগণের অবধান আকর্ষণ করিতে তাঁহার বহু বিলম্ব ঘটিয়াছিল। কত বিলম্ব ঘটিয়াছিল তাহা আমাদের মত বৃদ্ধেরাই জানে। তিন বছরে কাজী নজরুল চোখে আঙুল দিয়া জনগণকে যতটা আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন, রবীন্দ্রনাথ বিশ বছরেও তাহা পারেন নাই। রবীন্দ্রসাহিত্যের পক্ষেও চোখে আঙুল দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। ইয়োরোপ হইতে হীরকাঙ্গুরী-মণ্ডিত শ্বেত বর্ণের একটা আঙুল আসিয়া দেশের লোকের চোখে আঘাত দিয়া চমকিত করিয়াছিল।

সকলেই জানেন এমন অনেক লোক আছে যাহাদের কিছু শুনাইতে হইলে তাহাদের গায়ে একটু ধাক্কা দিয়া সচেতন করিয়া লইতে হয়। এইরূপ ধাক্কার প্রয়োজন আছে আমাদের জাতির লোকের জন্য। কিন্তু ধাক্কা দিয়া শ্রোতাকে উৎকর্ণ করিয়া তোলা ভব্যতাবিরুদ্ধ বলিয়া রবীন্দ্রনাথ মনে করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও প্রভাতকুমার অট্টহাস্যের দ্বারা দেশের পাঠকদের কতকটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিলেন কিন্তু হাসির যোগান আর কতদিন চলিবে? যোগান ফুরাইয়া গেলেই পাঠকরা উদাসীন হইয়া পড়িল।

রাজশেখরবাবু রঙ্গ ও শ্লেষবিদ্রূপের শরবর্ষণে পাঠক সমাজের অলস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন—এখনও পাঠকসমাজ কতকটা উন্মনা হইলেও তাঁহাকে ভুলিয়া যায় নাই।

সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের বিচিত্র কসরতের দ্বারা পাঠকদের চোখে আঙুল দিয়াছিলেন—কিছু সেই সঙ্গে কানে সুড়সুড়ি দেওয়ায় জন্য—আকর্ষণটা ক্রমে শিথিল হইয়া গেল। তাহাদের চোখের পাতা আবার বুজিয়া আসিল।

জাতিটাকে ভালো করিয়া চিনিতেন শরৎচন্দ্র। তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াই স্বজাতিকে খুব কতকগুলি অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইলেন এবং কতকগুলি চমকপ্রদ চিত্র দেখাইলেন। জাতি উত্তেজিত হইয়া চোখ মেলিয়া তাকাইল—'চোখে আঙুলের কাজ' স্থরু হইল। তারপর তিনি ঘনঘন অপ্রত্যাশিতের চমক দিতে ও চিরপ্রচলিত ধারণাগুলোকে ধাক্কা দিতে লাগিলেন, যত ব্রাত্য অপাংক্তেয়কে টানিয়া আনিয়া তাঁহার সাহিত্যিক ভোজে নিষ্ঠাবান গৃহস্থদের পংক্তিতে বসাইয়া দিলেন, এবং সশব্দে হাটে হাঁড়ি ভাঙিতে লাগিলেন। ফলে, সাপুড়িয়া পথের ধারে ডুবকি বাজাইয়া সাপ খেলাইতে স্থরু করিলে যেমন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে কাজ ফেলিয়া সাপুড়িয়াকে ঘিরিয়া

দাঁড়ায়। তেমনি করিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

তাঁহার কলাকসরৎ ফুরাইয়া গেল। কিন্তু তিনি জনগণের মনে কৌতূহলকে সচেতন করিয়া রাখিয়া গেলেন এবং তাহাদের প্রাণে প্রভূত প্রত্যাশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়া গেলেন নূতন কিছু শুনিবার এবং নূতন কিছু দেখিবার।

পরবর্তী কথাসাহিত্যিকদের তাহাতে সুবিধাই হইল। তারাশঙ্করপ্রমুখ সাহিত্যিকগণ কৌতূহলী রসপিপাসু পাঠকসমাজ পাইয়া গেলেন। তাঁহাদের আর পাঠকসমাজের চোখে আঙুল দিতে হয় নাই। তারাশঙ্কর পরে রচনার কোন কোন অঙ্গে এম্‌ফ্যাসিস দিয়া চিত্তাকর্ষক বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা আর্টেরই অনিবার্য প্রয়োজনে, পাঠকদের অলস দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আদৌ চোখে আঙুল দিতে জানিতেন না— তাঁহাকে উঠিতে হইয়াছিল তৃতীয়ার চন্দ্রের মতো বনগ্রামের আম কাঁটাল দেবদারুর তরুবীথিকার ফাঁক দিয়া ধীরে ধীরে।

এখন লেখকদের আবার চোখে আঙুল দিতে হইতেছে। যাঁহারা রচনার কোন কোন অঙ্গে অতিরিক্ত রঙ চড়াইতে পারিতেছেন, তাঁহাদেরই রচনার বর্ণচ্ছটা পাঠকদের চক্ষুকে আঘাত করিয়া চোখে আঙুলের কাজ করিতেছে।

চোখে আঙুল দিয়া অবধান আকর্ষণ করিতে হইয়াছে বলিয়া ইঁহাদের অবিরত চোখে আঙুলই চালাইতে হইতেছে তাহা বলিতেছি না। একবার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইয়া তারপর অনেকে তাঁহাদের সকল রচনারই অবহিত পাঠক পাইয়া গিয়াছেন।

ইঁহাদের অনেকেই শক্তিমান লেখক, কিন্তু গোড়ায় তাঁহাদিগকে পাঠকদের চোখে আঙুল দিতে হইয়াছে। ইহাতে দোষ কিছু দেখি না।

যেমন জাতি,— যেমন তাঁহার পাঠকশ্রেণী লেখককেও তদুপযোগী ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে—তদুপযোগী কলাকৌশলও আশ্রয় করিতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় যে বিদ্বৎসমাজ ও রসিকসমাজের চোখে অভিনব রসদৃষ্টির সঞ্চার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উপর নির্ভর করিয়া এখনকার লেখকদের থাকিলে চলে না। ইঁহাদের এখন নূতন মানবসমাজ, নূতন পথবিপথ, নানা অপরিচিত অনাবিষ্কৃত অঞ্চল, কত গূঢ় গহন যৌন রহস্যজাল, মানবজীবনের নানা জুগুপ্সাকর, বীভৎস ও গুহ্যতম স্তর, কত অদ্ভুত অদ্ভুত পাপচিত্র লইয়া ইঁহাদের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতে হইতেছে। যে ভূখণ্ডে

রবির আলোক কখনও প্রবেশ করে নাই,—কখনও শরৎচন্দ্রের কৌমুদী সম্পাত হয় নাই, ইহারা সে সব ভূখণ্ডেরও আবিষ্কার করিয়া বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। পাঠকদের আর অনবহিত থাকিবার অবসর দেওয়া হইতেছে না। এখন বিবিধ বৈচিত্র্যের মধ্যে আবার প্রতিযোগিতা চলিতেছে। বৈচিত্র্যসৃষ্টিতে সাময়িক ভাবে যিনি সকলকে অতিক্রম করিতেছেন, তিনিই সাময়িক ভাবে জনগণের কাছে চ্যাম্পিয়নের মর্যাদা লাভ করিতেছেন।

দু'একজন কবির কথাও বলিয়া এ প্রসঙ্গের উপসংহার করি। কাজী নজরুলের কথা আগে বলিয়াছি। জাতির ঝিমন্ত চোখে তাঁহার মতো কেহ আঙুল দিতে পারেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কাব্যাদর্শের বিপরীত পথে নির্ভীক পৌরুষের সহিত অভিযাত্রাও একরূপ চোখে আঙুল দেওয়া—তাহার ফল অবশ্যই ফলিবে। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই তাঁহার অধ্যাত্মবাদ, নন্দন তত্ত্ব ও আনন্দবাদের বিপরীত তত্ত্ববাদের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কবিবর মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথ—তাঁহাদের এই দুঃসাহসই চোখে আঙুল দিয়া শিক্ষিত পাঠকসমাজকে চমকিত করিয়াছিল। তাই অন্যান্য রবীন্দ্রশিষ্যদের উপেক্ষা করিলেও আজ শিক্ষিত পাঠকরাও ইঁহাদের উপেক্ষা করিতে পারিতেছেন না। সুকান্তের অকালমৃত্যু জাতির চোখকে পীড়িত ও সজল করিয়াছিল। তাঁহাকে এ জাতি ভুলিবে না। তাঁহার খ্যাতিলাভে বিলম্ব হয় নাই।

উপসংহারে বক্তব্য—যে সব সাহিত্যিক জাতির চোখে আঙুল দিতে পারেন নাই বা ইচ্ছা করিয়া দেন নাই, তাঁহাদের রচনাতেও সাহিত্যিক মূল্য থাকিতে পারে, একথা ভুলিলে চলিবে না। জনসাধারণ তাহা লক্ষ্য করিতে না পারে, যে রসিক সমাজ ও বিদ্বৎসমাজ কবিগুরুর জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় নির্মল রসদৃষ্টি লাভ করিয়াছেন তাঁহারাও কি তাহা লক্ষ্য করিবেন না? চোখে আঙুলেরই মূল্য আছে, আর চোখে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকার কি কোন মূল্য নাই?

সামঞ্জস্য-বোধ

উৎকৃষ্ট সাহিত্য-সৃষ্টির মূলে থাকে কবিচিত্তের সামঞ্জস্যবোধ। আলম্বন-বস্তু বা ভাব, বিভাব, অনুভাব, সঞ্চারী ভাব, অর্থগৌরব, অলঙ্কার, ছন্দ, পদবিন্যাস ইত্যাদির শোভন সুসঙ্গত ও সংযত সামঞ্জস্যেই রসের সৃষ্টি। ইহাদের কোন-না-কোনটির অতিরিক্ত প্রতিপত্তি বা প্রাবল্য ঘটিলেই, সমস্ত থাকা সত্ত্বেও, উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টি হয় না।

যে সকল কবিভণিতি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের পদবীতে স্থান পায় নাই,—অনুসন্ধান করিলেই দেখা যাইবে, তাহাদের উক্ত উপকরণ ও অঙ্গগুলির মধ্যে সৌষম্য বা সামঞ্জস্য নাই,—কোনটি বা অতিরিক্ত নিস্তেজ, কোনটি বা অতিরিক্ত প্রবল।

ছন্দ, অলঙ্কার, ভাষা ইত্যাদিও সুসমঞ্জস ও ভাবোপযোগী না হইলে সাহিত্যশ্রী নষ্ট হইয়া যায়।

কোন কবির গৌরব-কীর্তনের জন্য যখন অর্থগৌরব বা পদলালিত্যের বিশেষ করিয়া নাম করিতে হয়—তখন বুঝিতে হইবে অর্থগৌরব বা পদলালিত্য ঐ কবির কাব্যে অতিরিক্ত প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, অন্যান্য অঙ্গের সহিত উহাদের সামঞ্জস্য নাই। অতএব ইহা প্রশংসার কথা নয়।

কালিদাসকে উপমার জন্য বাহাদুরি দিয়া যে মাঘ-ভক্ত পাঠক মাঘে তিন-গুণের শোভন সমাবেশ দেখিয়াছিলেন, তিনি মাঘকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। সংকাব্যে ঐ তিনটি ছাড়া আরও অনেক অপরিহার্য অঙ্গ আছে—সে গুলির সম্বন্ধে ঐ পাঠক নীরব। ঐ তিনটি গুণের সহিত সে গুলিরও সামঞ্জস্য থাকিলে মাঘ অবশ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারিতেন।

যিনি ঐকথা বলিয়াছেন—তিনি যদি কাব্যের অন্যান্য অঙ্গের সন্ধান রাখিতেন—তবে কালিদাসকে উপমার কবি বলিয়াই বিদায় দিতেন না। কাব্যের সমস্ত অঙ্গের শোভন সুসামঞ্জস্য যদি কোন সংস্কৃত কবির মধ্যে ঘটিয়া থাকে—তবে তাহা কালিদাসে,—ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্টেও নয়।

কালিদাসের মেঘদূতই কাব্যের সর্ব অঙ্গের শোভন সামঞ্জস্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। সামঞ্জস্যের প্রধান ধর্ম্ম সংযম। সংযম ছাড়া সামঞ্জস্য বা হারমনির সৃষ্টি হইতে পারে না। মেঘদূত করুণ-বিপ্রলম্ভ রসের সংযত ভাবের কাব্য।

কারুণ্য আছে,—তাহাতে অসংযম নাই, চিত্তকে পীড়িত করিয়া তুলে না। অনুরাগই স্থায়িভাব, কিন্তু রাগসম্ভোগে অসংযম নাই। সঙ্গীত আছে,—কিন্তু সে সঙ্গীত কারুণ্যেরই বার্তাবাহী মেঘেরই উপযুক্ত মন্দাক্রান্তা ছন্দে, সুরের দ্বারা অর্থকে দুর্বল করিয়া তুলিবার প্রয়াস নাই।

চিত্র আছে, আবেগের সুর চিত্রসর্বস্ব হইতে দেয় নাই। গদ্যাত্মক অংশ কিছু-কিছু আছে, কিন্তু নির্বাচিত ছন্দের গুণে সরস মধুর হইয়াছে।

পদলালিত্য আছে, যক্ষের অনুরাগঘন জীবনের জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তাও আছে,—তাই বলিয়া এত অধিক নাই যে মেঘের গাম্ভীর্য তাহাতে নষ্ট হইয়া যায় বা মেঘ হংসে পরিণত হয়। তাহা ছাড়া, কোমলে কঠোরে গঠিত মন্দাক্রান্তা ছন্দই পদলালিত্যের প্রাধান্য ঘটাইতে দেয় নাই, অর্থ-গৌরবের সহিত পদলালিত্যের সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছে।

যেমন স্বপ্নলোক অলকা, যেমন স্বপ্নরসিক নায়ক যক্ষ,—যেমন কল্পলক্ষ্মী তাহার নায়িকা, যেমন তাহার স্বাধিকার-প্রমাদ, যেমন তাহার অভিশাপ,—ঠিক তেমনি বার্তাবহ আষাঢ়ের নবীন মেঘ। সবই স্বপ্ন রাজ্যের। স্বপ্নদূত মেঘ এই বাস্তব রাজ্যের উপর স্বপ্নবৃষ্টি করিতে করিতে চলিয়াছে। কোথাও অসামঞ্জস্য নাই।

কাব্যের যতগুলি উপচার আছে, সবগুলিই একটি কোন বিশেষ কাব্যে থাকিবেই, এমন কিছু কথা নাই। যেগুলিকে কাব্যে স্থান দেওয়া হইতেছে, সেইগুলির মধ্যে শোভন সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলেই অনুপস্থিতের অভাব অনুভূত হইবে না। কাব্যে আমরা যে অঙ্গ বা যে প্রত্যঙ্গের প্রত্যাশা করি, তাহাকে না পাওয়ার ক্ষোভ অনায়াসেই মিটিয়া যায় বাকীগুলির শোভন সামঞ্জস্যে।

মহাকবি মাইকেল ক্রোধ, উৎসাহ, কারুণ্য ইত্যাদি বিবিধ ভাবের সমন্বয়ের উপযোগী ছন্দ খুঁজিয়া বাহির করিলেন। মহাশিল্পিসুলভ সামঞ্জস্য-বোধই তাঁহাকে ঐ ছন্দ আবিষ্কারে প্রেরণা দিয়াছিল। ঐ ছন্দে মিল থাকিল না—মিত্রাক্ষরী কাব্য-পাঠে অভ্যস্ত কর্ণের পক্ষে একটা যেন অভাব অনুভূত হইল। মাইকেল এমনি একটা সামঞ্জস্য সাধন করিলেন যে, মিলের জন্য আর ক্ষোভ থাকিল না। তিনি মিত্রাক্ষর হরণ করিলেন, কিন্তু দিলেন ছন্দঃস্পন্দ বা Rhythm,—দিলেন ঘনঘন যুক্তাক্ষরী অনুপ্রাস,—দিলেন একটা পৌরুষ সবলতা, আর ছত্র হইতে ছত্রান্তরে ভাবধারার অবাধ প্রবাহ।

তাঁহার অনুকারকগণের ঐ সামঞ্জস্য-বোধ ছিল না। তাঁহারা মিত্রাক্ষর বর্জন করিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন,—মনে করিলেন দায়িত্ব কমিয়া গেল,—বদলে কিন্তু কিছুই দিলেন না। ফলে, অকাব্য কুকাব্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথের সামঞ্জস্য-বোধ অপূর্ব। কোন্ রস বা কোন্ ভাবের পক্ষে কোন ছন্দ, কি প্রকারের ভাষা ও কি শ্রেণীর অলঙ্কারের প্রয়োজন আছে, তাঁহার মত আর কেহই বুঝেন নাই। উদাহরণ-স্বরূপ,—তাঁহার কড়িওকোমলের যৌবন-স্বপ্নের সম্ভোগাত্মিকা কবিতাগুলির কথা ধরা যাক। ঐ কবিতাগুলির মূল ভাব অন্য কবির রচনায় রিরংসার উদ্দীপক। রিরংসার উদ্দীপনা করিলে হর্ষণ স্নায়বিক রাজ্যেই থাকিয়া যায়—অনির্বচনীয় রসে পৌছাইতে পারে না। তাই ভাব যাহাতে স্নায়বিক মণ্ডলে চাঞ্চল্য না ঘটাইয়া একেবারে রস-লোকে উঠিতে পারে, সেজন্য ছন্দ ও ভাষার সঙ্গে কবি ভাবের রসানুকূল সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন। কবিতাগুলি যদি,—

'এস তুমি বাদল বায়ে ঝুলন ঝুলাবে—'

এইরূপ ছন্দে ও ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে স্নায়বিক রাজ্যেই উহার পরিসমাপ্তি হইত, রসলোকে উঠিতে পারিত না। সে জন্য কবি ঐগুলিকে সনেটের রুক্ষকঠোর পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়াছেন, গাঢ়বন্ধ গৌড়ীয় রীতিতে মার্জিত বিদগ্ধ-জন-পরিষেবিত ভাষাতেই ঐগুলিকে রচনা করিয়াছেন। শৃঙ্গার-বেশে না সাজাইলে শৃঙ্গাররস রসলোকে পূজা পায় না, কবি তাহা জানিতেন। 'বিজয়িনী' বা 'চিত্রাঙ্গদার' মত কবিতার স্থায়ী ভাব আদিরসাভিমুখী অথচ কোন পাঠকের ঐ দুইটি কবিতা পড়িয়া কোনদিন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য-গত উল্লাস জন্মিয়াছে এমন-ত শুনি নাই। কেন? ভাষা ও ছন্দের সহিত এবং সঞ্চারী ভাবের সহিত স্থায়িভাবের রসানুকুল সামঞ্জস্য আছে বলিয়া।

আবার অধ্যাত্মভাবের কবিতাগুলির কথা ভাবিয়া দেখা যাক। কবি দেখিলেন—আধ্যাত্মভাব সহজে পাঠকের চিত্তস্পর্শ করে না—উহাকে যদি সনেট বা ঐরূপ কোন রুক্ষকঠোর ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হইত, তাহা হইলে পাঠক-চিত্তে কিছুতেই রসসঞ্চার করিতে পারিত না—নৈবেদ্যে আগেই একটা Experiment হইয়া গিয়াছিল। তাই কবি অধ্যাত্মভাবকে সঙ্গীতে ঢালিয়া দিলেন—ভাব যাহা পারিবে না—সুর তাহা নিশ্চয়ই পারিবে।—তাই গীতালি, গীতিমাল্য, গীতাঞ্জলি ইত্যাদির সৃষ্টি।

একটি তত্ত্ব বা তথ্যকে কঙ্কাল-স্বরূপ অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করিতে

হইলে যে কত আয়োজন করিতে হয়—তাহা রবীন্দ্রনাথ জানিতেন। যাঁহারা সত্য-প্রচারের নামে কেবল তথ্য-তত্ত্বের বিবৃতি ও ঘোষণা করিয়া কাব্যরচনা করিতেছি মনে করেন,—তাঁহারা কাব্যের মূল নিদানের সন্ধান রাখেন না। কাব্য দেহের অন্যান্য উপকরণ,—পুষ্টি, কান্তি, গঠনসৌষ্ঠব কত কি যে সমাহরণ করিয়া এবং কি ভাবে তাহাদের সামঞ্জস্য-সাধন করিয়া বিষয়-বস্তুর কঙ্কালকে ডুবাইতে ও ভুলাইতে হয়—তাহা রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন—চিত্রাঙ্গদা, বিদায়-অভিশাপ, পতিতা, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি কবিতায়।

এই সকল ক্ষেত্রে একটি উপাখ্যান বা পৌরাণিক কাহিনী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। কিন্তু সকল তত্ত্ব-তথ্যের উপযোগী উপাখ্যান-ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। জগৎ ও জীবনের অসংখ্য তত্ত্ব-তথ্য বা ভাব তাঁহার কাছে "রূপের মাঝারে অঙ্গ" চাহিয়াছে। কবি সেগুলিকে অনুভূতির মাধুর্য দিয়া কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। কোথাও বা Symbolএ বাস্তব রূপ দিয়াছেন। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই একটা আবেগের সুরের সাহায্য লইতে হইয়াছে—প্রচলিত কোন ছন্দে এই আবেগের সুর অবাধ বা স্বাধীনভাবে খেলিতে পায় না বলিয়া অসম-মাত্রিক ছন্দের সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। কতটা সামঞ্জস্য-বোধ থাকিলে তবে গতিতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে আহৃত সত্যগুলিকে কাব্যে পরিণত করা চলে একবার ভাবিয়া দেখার প্রয়োজন। আমি বলাকা ও পূরবীর কোন কোন কবিতার কথা বলিতেছি।

কারুণ্যে অসংযম ঘটিলে তাহা যে আমাদের হৃদয়কে ব্যথিতই করে,—রসলোকে উঠিতে পারে না, রবীন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতেন। তাই তিনি কারুণ্যের আলম্বন-নির্ব্বাচনের সময় এমন কোন আখ্যান বস্তু গ্রহণ করেন নাই, যাহাতে আমাদের অন্তর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে। যে দুঃখ রসবিলাসে পরিণত হইতে পারে, সেই দুঃখ লইয়াই তিনি কাব্য রচনা করিতেন এবং তাহার মধ্যেও এমন সব সঞ্চারী ভাবের যোগ থাকে, যাহাতে লৌকিক বেদনা উপশান্ত হয়। প্রয়োজন হইলে বিরোধী ভাবের আশ্রয় লইয়াও কারুণ্যকে রসে উত্তীর্ণ করিয়াছেন—যেমন 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটির নাম করা যাইতে পারে। রঙ্গরসের দীর্ঘদণ্ডে কারুণ্যটুকু রজনীগন্ধার মতো ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে কাব্যে অন্তরঙ্গ সঙ্গীত দিতে পারেন নাই—সেখানে বহিরঙ্গের সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়াছেন। যেখানে প্রসাদগুণের সৃষ্টি করিতে পারেন নাই,—সেখানে রচনাকে অলঙ্কার-প্রয়োগে সমৃদ্ধ

করিয়াছেন। গদ্যে যেখানে যুক্তি দুর্বল, সেখানে উপমান বা Analogyর সাহায্য লইয়াছেন। যেখানে উপমান বা যুক্তি দুইই অচল, সেখানে আবেগাত্মিকা পরম্পরার (Emotional Sequence) আশ্রয় লইয়াছেন। যেখানে রসাত্মক করার বিশেষ কিছুই নাই—সেখানে মিলের চাতুরী ও রসিকতার দ্বারাই কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার 'শিলঙের চিঠির' কথা স্মর্তব্য।

যেখানে কবি কাব্যের অনেক অঙ্গকে বাদ দিয়াছেন—সেখানে বাকীগুলির শোভন সামঞ্জস্যেই সৎকাব্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাই তাঁহার হাতে 'মেঘদূত' বা 'সেকাল' নামক কবিতা তালিকা হইয়া উঠে নাই।

একটা অপূর্ব্ব শোভন সামঞ্জস্য ও সংযমের গুণে তাঁহার অধিকাংশ রচনাই সৎসাহিত্য-গোষ্ঠীতে স্থান পাইয়াছে।

সাহিত্যে কৌলীন্য

সংস্কৃত সাহিত্যের যে কোন পুস্তক খুলিলেই দেখা যায়—তাহাতে যাহাদের কথা আছে, তাহারা হয় দেবদেবী, নয় ধনে মানে সম্ভ্রান্ত নরনারী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজা রাণী রাজপুরুষ ইত্যাদি। ইহার কারণ আছে। পূর্ব্বে সাহিত্য রসজীবন ও জ্ঞান-জীবনের বিলাস বলিয়াই গণ্য হইত; 'বিলাস-কলাসু কুতূহলম্' চরিতার্থ করিবার জন্যই সাহিত্য-সৃষ্টি হইত। জনসাধারণের মধ্যে কোন কৃষ্টি বা বৈদগ্ধ্যের প্রতান-বিতান বা শিক্ষাপ্রচার ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্কই ছিল না। তাহাদের জীবনও সে জন্য সাহিত্য-রচনার আলম্বন বা উপজীব্য হইয়া উঠে নাই।

সাধারণ পুর-জনপদও তখন সাহিত্যের পটভূমি ছিল না। রাজসভা, রাজ-অন্তঃপুর, তপোবন, স্বর্গলোক, কল্পলোক ইত্যাদি ছিল পটভূমি। এইরূপ পটভূমি নির্বাচন না করিলে সাহিত্যের গৌরব, শ্রী ও আভিজাত্য নষ্ট হইবে, এইরূপ ধারণাই ছিল প্রাচীন সাহিত্যিকদের। এইরূপ পটভূমিতে জনসাধারণের কোন ঠাঁই ছিল না।

উচ্চ সাহিত্যকে চতুঃষষ্টিকলার মধ্যে ধরা হইত না,—ইহাকে অপরা বিদ্যার মধ্যেও ধরা হইত না। ইহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব ও পরাবিদ্যার শ্রেণীতেই অনেকটা গণ্য

করা হইত। সেজন্য চতুঃষষ্টিকলার মত অথবা অপরা বিদ্যার মত ইহা সর্বজনের অধিগম্য হয় নাই। যাহাদের অধিগম্য বা অধিকারভুক্ত নয়, তাহাদের জীবন-কথা সাহিত্যে স্থান পাইবার কথাও নয়। কলাবিদ্যাগুলিকে সাহিত্যের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের বস্তু মনে করা হইত। সে-জন্য যাহারা কলাবিদ্যা-গুলির চর্চ্চা করিত তাহাদিগকে সামাজিক জীবনে হীন বলিয়া গণ্য করা হইত।

জীবনের যে বিস্ময়োদ্বোধক বৈচিত্র্য ও যে বিবিধ ভাব সমাবেশের দ্বারা সাহিত্য রচিত হয়, আগেকার সাহিত্যিকদের বিশ্বাস ছিল—সে সব জনসাধারণের জীবনে আদৌ মানায় না,—নিম্নশ্রেণীর নরনারীর পক্ষে তাহা শোভন-সমঞ্জস হয় না, বরং তাহাতে রসাভাস ঘটিবারই সম্ভাবনা।

ইহা ছাড়া,—সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তখনকার দিনে রাজরাজন্য বা ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ–সেজন্য সাহিত্যেও জনসমাজের অভিভাবক শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রাই হইয়াছিল প্রধান উপজীব্য।

জনসাধারণের জ্ঞানজীবন না থাকিতে পারে,—কিন্তু রসজীবন কি ছিল না? রসজীবনের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য তাহারা কি করিত? তাহারাও নিশ্চয়ই নিজেদের ভাষায় নিজেদের জীবনযাত্রা অবলম্বনে একপ্রকার সাহিত্য রচনা করিত এবং তাহা উপভোগ করিত। কিন্তু তাহা রক্ষা পায় নাই—বিদ্বৎসমাজ নিশ্চয়ই তাহাকে রক্ষণীয় বলিয়া মনে করেন নাই।—জনসাধারণ পুরুষপরম্পরায় যত দিন পারিয়াছে বাঁচাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এদেশের জাতীয়-জীবনে যে মুহুর্মুহুঃ দশাবিপর্যয় ঘটিয়াছে ও যে দৈবদুর্বিপাকের ঝঞ্ঝা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে সে সবই বিলুপ্ত হইয়াছে। সে সাহিত্য যে বিলোপ পাইয়াছে—তাহার প্রমাণ হয়, বর্ত্তমান যুগের প্রচণ্ড চেষ্টায় তাহার কিছু কিছু অংশের আবিষ্কারের দ্বারা।

বাংলাদেশে ঐহিক স্থবিধার জন্য বর্ণাশ্রমের অভিভাবকগণকে ও অভিজাত-সম্প্রদায়কে কোন কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের প্রচার করিতে হইয়াছে। তাহার ফলে জনসাধারণের জন্যও সাহিত্য রচনা করিতে হইয়াছে। তাহাদের জন্য সাহিত্য রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহিত্যে তাহাদের জীবন-যাত্রা বিশিষ্ট স্থান পায় নাই। দেবদেবী, রাজা, রাজপুত্র, শ্রেষ্ঠী ও সদাগরগণের জীবন-যাত্রাই সে সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য হইয়াছে। তবে জনসাধারণের জীবনকে কবিরা একেবারে বর্জন করিতে পারেন নাই, কোথাও কোথাও তাহাদের জীবন-কথা মূল আখ্যায়িকার পরিপোষণের জন্য আসিয়া পড়িয়াছে।

আভিজাত্যদৃপ্ত বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে এদেশে প্রধানতঃ বৌদ্ধ, সহজিয়া, বৈষ্ণব

ও ইসলাম ধর্মের প্রতিপত্তি ঘটিয়াছে—এইগুলি সমস্তই গণতন্ত্রীয় ধর্ম। এই-গুলির প্রচার-কল্পে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণকে উপেক্ষা করা হয় নাই। বৌদ্ধ পালি-সাহিত্যে সাধারণ গৃহস্থ ও শ্রমণ-শ্রমণীদের জীবন-কথা পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র মৃচ্ছকটিকে অসম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের জীবনের কিছু-কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তসেনার কথা ধরি না —কারণ সে গণিকা হইলেও রাজরাণী অপেক্ষা প্রভাব-প্রতিপত্তিতে ন্যূন নয়,—সে বিদুষী ও ধনবতী,—সংস্কৃতে কথা বলে। পালি-সাহিত্যেই সর্বপ্রথম ভগবান তথাগতের কৃপায় পতিত-পতিতা নট-নটীদেরও স্থান হইয়াছে।

পালি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠী ও উচ্চশ্রেণীর শ্রমণ ভিক্ষুদের কথা বাদ দেওয়া যাইতে পারে—কিন্তু ক্ষপণকগণ জনসাধারণেরই প্রতিনিধি। বাঙ্গালা দেশে বৌদ্ধ সাহিত্যে যোগী, হাড়ি, ডোম্নী ইত্যাদির জীবন-কথার উল্লেখ আছে বটে—কিন্তু সে সাহিত্য সৎসাহিত্যের গোষ্ঠীতে স্থান পাইতে পারে নাই।

সহজিয়াগণ এদেশে যে সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাকে, যে 'বন্যায় শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়', সেই বন্যাই ডুবাইয়া দিয়াছে। এক রজকিনী রামীর জীবন-তরীটি নীলশাড়ীর বিতান তুলিয়া তাহাতে ভাসিতেছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্য প্রধানতঃ রাধাশ্যামের প্রেমলীলা-অবলম্বনে রচিত,—কিন্তু ঐ সাহিত্যের ব্রজভূমিটি অনেকস্থলেই আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীভূমি,—গোকুল-গোষ্ঠ আমাদের রাঢ়দেশেরই গোঠ-বাথান—যমুনা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের অজয়-ভাগীরথী। বৈষ্ণব-সাহিত্য বাঙ্গালার পল্লীজীবনকেই প্রকারান্তরে রস-বলয়িত করিয়াছে। বৈষ্ণব-সাহিত্যের যে অংশ শ্রীচৈতন্যের জীবন লইয়া রচিত তাহার মধ্যেও বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবন-কথা উপেক্ষিত হয় নাই।

মুসলমানধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে যদি কিছু সাহিত্য রচিত হইয়া থাকে—তবে তাহা বিলুপ্ত। সুফীধর্মের সহিত হিন্দুধর্মের মিলনে এদেশে যে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে, তাহারাও একশ্রেণীর সাহিত্য রচনা করিয়াছে; কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক সাহিত্য, আখ্যায়িকা- মূলক নয়। কাজেই তাহাতে জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গের কোন স্থানই হয় নাই। বাঙ্গালাদেশে মুসলমানগণের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে—তাহা অনুবাদ- সাহিত্য। তাহা হয়ত জনসাধারণের উপভোগ্য হইয়াছিল—কিন্তু তাহাদের জীবন-কথা তাহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। মুসলমান ও হিন্দুজনসাধারণ মিলিয়া পূর্ব্ববঙ্গে যে গীতিকা-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই প্রধান উপজীব্য হইয়াছে জন-

সাধারণেরই জীবন-যাত্রা।

পাঁচালী, ছড়া, আগমনী-বিজয়ার গান ইত্যাদি লোকসাহিত্য সাধারণতঃ দেব-দেবী লইয়া রচিত হইলেও দেবদেবীর লীলাজীবনের অন্তরালে বাঙ্গালার পল্লীবাসীদের জীবন-কথাই বিবৃত হইয়াছে। এইগুলিকে কিন্তু সংসাহিত্যের গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া হয় নাই।

ইংরাজ আমলে ভারতের ইতিহাসের উদ্ধার হওয়ার পর ইতিহাসের চরিত্রগুলি বাঙ্গালা-সাহিত্যের পাত্রপাত্রী হইয়া পড়িল। যে ইতিহাস অবলম্বনে এদেশে সাহিত্য-রচনার সূত্রপাত হইল, তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালার বাহিরের ইতিহাস। কাজেই বাঙ্গালী জনসাধারণের জীবন-চিত্র ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিতে পাওয়া গেল না। ঐ চরিত্রগুলি সাহিত্যে আর একটা অভিনব আভিজাত্যেরই সৃষ্টি করিল। কাব্যে দেবদেবী ও মহাভারত-রামায়ণের চরিত্রেরই প্রাধান্য থাকিয়া গেল।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিলেন উপন্যাস,—কিন্তু তাঁহার উপন্যাসে জনসাধারণের বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাস ও দেশের ধনিক-সম্প্রদায় হইতে চরিত্র নির্বাচন করিলেন। তবে তিনি একেবারে জনসাধারণকে বাদ দিতে পারিলেন না—অন্ততঃ তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য-জীবনের চিত্রও কিছু কিছু পাওয়া গেল।

এ বিষয়ে আগাইয়াছিলেন দীনবন্ধু। তাঁহার নাটকে আমরা সকলশ্রেণীর বাঙ্গালীজীবনেরই সাক্ষাৎ পাইলাম। সাহিত্যের আভিজাত্য-ব্রতভঙ্গের প্রকৃতপক্ষে দীনবন্ধু হইতে সূত্রপাত। এই হিসাবে দীনবন্ধু সত্যসত্যই 'দীনবন্ধু।' রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথাই অনুসরণ করিয়াছেন। কাব্যে তিনি পল্লীনিসর্গকে প্রাধান্য দিয়াছেন। গল্প-সাহিত্যে তিনি গণতন্ত্রীয় পথে অনেকটা আগাইয়া গিয়াছেন।

এখন দেশে যথেষ্ট শিক্ষাবিস্তার হইয়াছে—রসজীবনের সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর একটা জ্ঞান-জীবন-ও গড়িয়া উঠিয়াছে। এখন কোন রাজরাজন্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ও উপভোক্তা নহেন, জনসাধারণই অভিভাবক ও গুণগ্রাহী। তাহারা এখন শুধু সাহিত্যের রস উপভোগ করিতে চায় না, সাহিত্যের আসরে তাহাদেরই জীবন-কথা শুনিতে চায়। তাহাদের মধ্য হইতেই শক্তিমান্ সাহিত্যিকের জন্ম হইতেছে, তাহারা অনবরত দেব-দেবী, রাজ-রাজন্য, বীর-বীরাঙ্গনা ও ধনীর দুলালদের লীলাবৈচিত্র্যের উপাখ্যান শুনিয়া শুনিয়া বিরক্ত। তাহারাও মানুষ, তাহাদের জীবন-কথাও অতিবিচিত্র—তাহাদের জীবনযাত্রায়

বৈচিত্র্যের সহিত বৈশিষ্ট্য ও অপূর্বতা আছে। তাহারা চায়, তাহাদের জীবন-কথা অন্য দেশেও যেমন সাহিত্যের সর্বপ্রধান উপজীব্য হইয়াছে,—এদেশের সাহিত্যেও তাহাই হউক।

এদেশে শরৎচন্দ্র তাহাদের জীবন-কথাকেই সাহিত্যের সর্বপ্রধান উপাদান করিয়া তুলিয়া তাহাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াছেন। তাই বাঙ্গালী শরৎচন্দ্রকে এত ভালবাসিয়াছে এবং আপনাদের অন্তরঙ্গ জন বলিয়া মনে করিয়া লইতে পারিয়াছে।

শরৎচন্দ্র দেখিলেন, সাহিত্যের অন্যান্য শাখা জনসাধারণকে বাদ দিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারে—কিন্তু উপন্যাস তাহা পারে না। অভিজাত-সম্প্রদায়ের কথাই নানা ভাবে সাহিত্যের নানা শাখায় এত দিন উপজীব্য হইয়া আসিয়াছে—তাহাতে আর না আছে অভিনবতা, না আছে বৈচিত্র্য,—না আছে অপূর্বতা। জনসাধারণের জীবন ছাড়া উপন্যাসের গত্যন্তর নাই,—উপন্যাসের পাঠক ও অভিভাবক তো তাহারাই। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্র এ দীক্ষা প্রধানতঃ নিজের অন্তর হইতেই পাইয়াছেন। কতকটা হয়ত ইউরোপীয় সাহিত্য হইতেও পাইয়া থাকিবেন। আমাদের দেশে জনসাধারণের গণতন্ত্রীয় জাগরণের অনেক আগেই ইউরোপে সে জাগরণ হইয়াছে এবং সাহিত্য সেইভাবে রূপান্তর লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যের আর কোন গুণ না থাক্, উহাতে বাঙ্গালার জনসাধারণের জীবনের একটা বিশিষ্ট স্থান হইয়াছে। কেবল পল্লীনিসর্গ নয়—পল্লীবাসীর জীবন-যাত্রাকে রবীন্দ্র-শিষ্যগণ কাব্যের একটি প্রধান উপজীব্য করিয়া তুলিয়াছেন।

শরৎচন্দ্রের পর কথা-সাহিত্যে দেশের দীনতম, ঘৃণ্যতম, বন্যতম, জঘন্যতম জীবনটিও স্থান পাইতেছে, তাহাদের সুখ দুঃখের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য নব নব রস-সৃষ্টির সহায়তা করিতেছে। বর্তমান কথা-সাহিত্যিকগণের কেহ কেহ, দেশের যে শ্রেণীর লোক সাহিত্যের পাঠকই নয়, যাহারা আজিও নিজেদের জীবনকে সাহিত্যে প্রতিফলিত দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে শিখে নাই, তাহাদের জীবন-কথাকেও বিশিষ্ট স্থান দিতেছেন। কাব্যসাহিত্যে ঠিক সমান্তরাল পদ্ধতিই অনুসৃত হইতেছে। নাট্যসাহিত্য এতদূর আগায় নাই—শরৎচন্দ্র উপন্যাসে যত দূর আগাইয়াছেন, নাট্যসাহিত্য ততদূর পর্যন্ত আসিয়াই থামিয়াছে। বোধ হয়, তাহার পক্ষে আর আগানো সঙ্গত-ও নয়।

সৃষ্টির বেদনা

সকল সৃষ্টির মূলে আছে বেদনা। বীণার বক্ষের বেদনাই সঙ্গীতে মূর্চ্ছিত, বেদনার রূপান্তরই আনন্দ—তপস্যার রূপান্তর যেমন অপবর্গ।

"ফুল হলো লতিকার ব্যথাময়ী সাধনা,
ফলের জনম দেয় কোরকের বেদনা।
ফলের বেদনা গতি বীজে লভি পরিণতি
লতার জীবনে পুনঃ উঠিতেছে বিলসি'।"

বেদনা এই ভাবেই সৃষ্টিধারা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে—

"বেদনা সৃজন-সুখ দুহুঁ দোঁহা মাগিছে।
এ মিলন চিরদিন সঙ্গীতে জাগিছে।
বেদনা রবে না যবে সৃজন কোথায় র'বে?
বেদনা যে সৃজনের সুরময়ী জননী।"

এ সংসারে আমাদের যত কিছু উপভোগ্য আছে, তাহার বৃন্তে কাহারও-না-কাহারও বেদনা কণ্টকিত হইয়া আছে। আমরা যত বিবিধবর্ণের পঙ্কজের মাধুরীই উপভোগ করি না কেন, সকল পঙ্কজের মৃণাল ঐ বেদনারই পঙ্কে।

তাই কবি বলিতেছেন—

কত প্রাণপণ দগ্ধ হৃদয় বিনিদ্র বিভাবরী,
জান কি বন্ধু উঠেছিল গীত কত ব্যথা ভেদ করি?
রাঙা ফুল হ'য়ে উঠেছে ফুটিয়া হৃদয়-শোণিত-পাত।
অশ্রু ঝলিছে শিশিরের মত পোহায়ে দুঃখ রাত।

এ জগতে বেদনার মূল্য বা শুল্ক না দিলে কোন আনন্দই পাওয়া যায় না। বহু বেদনা সহিয়া তবে কবি সৃষ্টির আনন্দটুকু লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে কবির চিত্তের দশা যে কত বেদনাঘন কে তাহার সন্ধান রাখে? সকলেই তাঁহার বহু বেদনার ধন রস-নন্দনটিকে অঙ্কে ধরিয়া আদর করে,—চুম্বন করে—ভালবাসিয়া আনন্দ পায়—কিন্তু তাহার সৃষ্টির ইতিহাসটুকুর সন্ধান রাখিতে চায় না। যাহারা কৌতূহলী তাহারা যদি কবির চিত্ত-বাতায়ন দিয়া একটু উঁকি দেয়, তাহা হইলে তাহারা দেখিবে—সেখানে একটা মহা-আলোড়ন চলিতেছে, প্রকাশ লাভ করিবার জন্য প্রাণের অনুভূতি আকুলি-বিকলি করিতেছে—ভাবকে রূপের মাঝে

বন্দী করিবার জন্য কঠিন প্রয়াস চলিতেছে—ভাবে ভাবে দ্বন্দ্ব বাধিয়া গিয়াছে—যতক্ষণ ভাব বা অনুভূতি রসে পরিণত না হইতেছে, ততক্ষণ কেবল ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে,—আশা-নৈরাশ্যের সংগ্রামে কবির চিত্ত রক্তাক্ত, কবি নিজে একটা দারুণ অশান্তি অনুভব করিতেছেন।

কবিতা পাঠের ভূমিকা নিবন্ধে শুক্তি ও মুক্তার ঔপম্য প্রসঙ্গে এই অশান্তির ব্যাখ্যা দিয়াছি। (পৃঃ ১৮৬)

এই অস্বস্তির সহিত কিসের উপমা দিব? অবৃষ্টিসংরম্ভ অম্বুবাহের অন্তর্দাহের সঙ্গে? অণ্ডচ্ছদ বিদীর্ণ হইবার আগে অণ্ডের অন্তর্গূঢ় বেদনার সঙ্গে? মুক্তাফলের সৃষ্টিকালে শুক্তির পুটপাক-প্রতিকাশ ব্যথার সঙ্গে? না, সদ্যঃপ্রবুদ্ধ সৌরভের আলোড়নে ব্যথিত কেতকীর গর্ভকেশরের ব্যাকুলতার সঙ্গে? কবির কাব্য হইতেই উপমার উৎকলন করি—

"যেদিন হিমাদ্রি-শৃঙ্গে নামি আসে আসন্ন আষাঢ়
মহানদ ব্রহ্মপুত্র অকস্মাৎ দুর্দাম দুর্বার
দুঃসহ অন্তর বেগে তীর-তরু করিয়া উন্মূল
মাতিয়া খুঁজিয়া ফিরে আপনার কূল উপকূল,
তট অরণ্যের তলে তরঙ্গের ডম্বরু বাজায়ে
ক্ষিপ্ত ধূর্জটির প্রায়। সেইমত বনানীর ছায়ে
স্বচ্ছশীর্ণ ক্ষিপ্রগতি স্রোতস্বতী তমসার তীরে
অপূর্ব উদ্বেগ ভরে সঙ্গিহীন ভ্রমিছেন ফিরে
মহর্ষি বাল্মীকি কবি।

বেদনায় অন্তর করিয়া বিদারিত
মুহূর্তে নিল যে জন্ম পরিপূর্ণ বাণীর সঙ্গীত
তারে লয়ে কি করিবে, ভাবে মুনি কি তার উদ্দেশ!
তরুণ গরুড় সম কি মহৎ ক্ষুধার আবেশ,
পীড়ন করিছে তারে, কি তাহার দুরন্ত প্রার্থনা,
অমর বিহঙ্গশিশু কোন্ বিশ্বে করিবে রচনা
আপন বিরাট নীড়?

মেঘাড়ম্বরের পর বৃষ্টিধারার মত যখন সৃষ্টিধারার সূত্রপাত হয়, তখন কবি আনন্দলাভ করিতে থাকেন—কিন্তু এ আনন্দও অবিমিশ্র নহে। সৃষ্টির সঙ্গেও একটা উদ্বেগের বেদনা আছে। কবির কল্পনাকে উপাদান আহরণ করিতে এবং

শব্দনির্বাচনে ও ভাষার পরিপাট্য সাধনে কবি-চিত্তকে যথেষ্ট ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়। উপাদান উপকরণের সন্ধানে, নির্বাচনে, অর্জনে, বর্জনে কবির সৃজনী শক্তি স্বেদসিক্ত। সৃষ্টি যখন পরিপূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে, কবি যখন তাঁহার রচনাকে নিজে আবৃত্তি করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তখনই তাঁহার সকল ব্যথিত প্রয়াস সার্থক হইয়া উঠে—কবি তখনই পান পরিপূর্ণ আনন্দ অর্থাৎ কবি যখন উপভোক্তা হইয়া আপনার সৃষ্টিকে উপভোগ করেন, তখনই তিনি পান পরিপূর্ণ আনন্দ। সৃষ্টির আনন্দ নয়, সৃষ্টির বেদনাই উপভোগের আনন্দে পরিণত হয়।

ইহা হইতে বুঝা যায়—কবির সৃষ্টি হইতে রসজ্ঞ পাঠক যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা কতকটা অবিমিশ্র, কবির ভাগ্যে সে আনন্দ লাভ ঘটিয়া উঠে না।

কবি তাই গাহিয়াছেন—

শান্তি কোথা মোর তরে হায় বিশ্বভুবন মাঝে ?
অশান্তি যে আঘাত করে তাইত বীণা বাজে।
নিত্য র'বে প্রাণপোড়ানো গানের আগুন জ্বালা,
এই কি তোমার খুসী, আমায় তাই পরালে মালা
সুরের আগুন ঢালা ?

তাই কবি বলিয়াছেন—

"অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
তার নিত্য জাগরণ, অগ্নিসম দেবতার দান
ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"

অবশ্য কবি বেদনার পুরস্কারস্বরূপ লাভ করেন—উপভোক্তার প্রাপ্য পরিপূর্ণ আনন্দ, সৃষ্টির জন্য আত্মপ্রসাদ,—প্রকাশের পর চিত্তের লঘুতা ও নিশ্চিন্ততার স্বস্তি ;—সৃষ্টির প্রতি জাতকমমতাজনিত তৃপ্তিরস,—বিস্ময়জনিত পুলক,—পাঠকের চিত্তের সহিত আত্মচিত্তের মৈত্রীলাভের আনন্দ,—নিজের সৃষ্টিকে উপভোগ্য করিয়া তোলার আনন্দ, বিশ্বজনকে আনন্দ-পরিবেষণের আনন্দ, সর্বশেষে রসজ্ঞ পাঠকের শ্রদ্ধালাভের ও যশোলাভের আনন্দ। কাজেই, কবি যে দারুণ ক্লেশ স্বীকার করেন—তাহার তুলনায় অনেক বেশি আনন্দই লাভ করেন।

কিন্তু পূর্বেই বলা হইয়াছে আনন্দ বিনা শুল্কে পাওয়া যায় না। তবে রসজ্ঞ পাঠক কাব্যপাঠে যে আনন্দ লাভ করে, তাহার মূল্য সে কি দিল ? কাব্যের

রসোপভোগ কতকটা কবির কাব্যকে মনে মনে পুনর্গঠন করা। এই পুনর্গঠন-ব্যাপারে কিছু ক্লেশ আছে। আর পুনর্গঠন করিয়া লইবার অভ্যাস ও শক্তি আয়ত্ত করিতে পাঠককে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। কবির তুলনায় অবশ্য পাঠকের এ ক্লেশ যৎসামান্য।

প্রকৃতপক্ষে, কবি কেবল আনন্দ দানই করেন না, পাঠক যাহাতে অপেক্ষাকৃত অবিমিশ্র আনন্দ লাভ করিতে পারে, তাহার জন্য পাঠকের হইয়া কবি নিজে বেদনার মূল্য দিয়া রাখেন। এইজন্যই কবি আত্মত্যাগী মহাপুরুষ, এইজন্যই কবি আনন্দ-পরিবেষণের জন্য কেবল কৃতজ্ঞতা মাত্র লাভ করেন না, পাঠক-হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিও লাভ করেন। সাধক ও জ্ঞানগুরুদের যাহা প্রাপ্য কবি তাহাও কতকটা লাভ করেন।

কেহ কেহ বলিতে পারে—যত আনন্দই পুরস্কার-স্বরূপ লভ্য হউক, কবি সাধ করিয়া তো এ বেদনা বরণ করেন না, এ বেদনাস্বীকার তাঁহার বিধিলিপি,—এ বেদনা-স্বীকারকে তিনি এড়াইতে পারেন না। তিনি ত ভাব বা অনুভূতির উদ্বেলতাকে পুষিয়া রাখিতে পারেন না, তিনি তাহাকে প্রকাশ দান করিতে বাধ্য। যাহা তাঁহাকে বাধ্য করে, কাহারও কাহারও মতে তাহা একটা দৈবী শক্তি। এই শক্তি বেদনার প্রবাহেই আত্ম প্রকাশ চাহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা একটা ব্যাধি। বেদনা ঐ ব্যাধিরই বেদনা—আনন্দ ঐ ব্যাধিরই সাময়িক উপশমমাত্র।

বিধির প্রেরণায় হউক, আর ব্যাধির তাড়নায় হউক, কবি সাধ করিয়াই এ বেদনা বরণ করেন। কারণ, এই বেদনাতেই তাঁহার মনুষ্যত্বের গৌরব। এই বেদনা তাঁহার তপস্যা, কেবল আনন্দ লাভ ও আনন্দদানের আগ্রহই এই বেদনা-স্বীকারের প্রেরণা নয়। এই বেদনার পথেই কবি বিশ্ব-কাব্যস্রষ্টারও সমীপবর্ত্তী হইতে চাহেন। কবির মনের কথা নিম্নলিখিত পংক্তিগুলিতে প্রকাশ করা যাইতে পারে—

কুট্‌মলে নিবদ্ধ ব্যথা গুল্মলতা-বনবিটপীর
ফলের জনম দেয় গন্ধরসে কুসুমে ফুটায়।
শিলাপঞ্জরের ব্যথা অন্তর্গূঢ়, সহিষ্ণু গিরির
কলকল গীতিময় প্রীতিময় নির্ঝরে ছুটায়।
বারিদের বজ্রব্যথা মুহুর্মুহুঃ তাড়িত-তাড়না,
বসুন্ধরা-সঞ্জীবন ধারাসারে ঢালে শান্তিজল।

জীবজরায়ুর ব্যথা শঙ্কাতুর প্রসব-বেদনা
আনন্দ নন্দনে অঙ্ক শশিসম করে সমুজ্জল।
তোমার অসীম ব্যথা বিশ্বকর্মা বিশ্বশিল্পিরাজ,
জ্বলিছে অনন্ত জ্বালা বহ্নিকুণ্ড, তোমার অন্তরে,
অনাদি অনন্তকাল ব্যাপি' তাই তব সৃষ্টি-কাজ,
চলিতেছে নব নব অহরহঃ এই বিশ্ব 'পরে।

হে কারুণ্য-বিগলিত দীনবন্ধু, নিত্য নব ব্যথা
বক্ষে তব হইতেছে নিত্য নব সৃষ্টিতে প্রকট,
অপূর্ণে করিতে পূর্ণ অভিব্যক্ত তব ব্যাকুলতা,
যুগে-যুগে মুছে-মুছে আঁকিতেছ বিশ্ব-দৃশ্যপট।
অতন্দ্রিত শিল্পিরাজ, ওগো স্রষ্টা, বিশ্বের নিদান,
দীক্ষা দাও শিষ্যে তব, পুত্রে তব পিতৃ-ব্যবসায়।
তব বিশ্ব-শিল্পাগারে একপ্রান্তে দাও মোরে স্থান,
দীক্ষা দাও সৃষ্টিকাম বেদনার শোণিত-টিকায়।
দাও ব্যথা অফুরন্ত রুদ্র পিতা, নিত্য নব নব,
আনন্দ-স্বরূপ দিব আমি তায় শিল্প-মহিমায়,
ব্যথার পাষাণে গড়ি শ্রীমন্দির পুরোহিত হবো,
সৃজিতে সৃজিতে স্রষ্টা একদিন লভিব তোমায়!

সৌন্দর্য-বোধ

সৌন্দর্যবোধ আমাদের জন্মগত। এর সঙ্গে আমাদের দৈনন্দিন জীবনেরও যোগ আছে। সুন্দর আমাদের তৃপ্ত করে, অসুন্দর মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। সৌন্দর্যবোধ নানা ছন্দেই অভিব্যক্ত হয় আমাদের প্রতিদিনকার জীবন-যাত্রাতেও।

নগর পথে যেতে যেতে হঠাৎ একস্থানে যদি দেখা যায় ভাঙাচুরা বাড়ীঘর, আবর্জনার স্তূপ, পচা নর্দ্দমা, তাহলে মনটা বড় অপ্রফুল্ল হয়ে ওঠে। আবার

বহুদিন পরে সেদিক দিয়ে যাবার সময় যদি দেখা যায়—সে স্থানে সুপরিচ্ছন্ন পরিবেষে একখানি সুন্দর গৃহ নির্মিত হয়েছে, তা হলে মনটা কতই না প্রফুল্ল হয়! এর কারণ কি? এই পরিবর্তনে আমাদের ক্ষতি বৃদ্ধি কি? বাড়ী কার তা তো জানা নেই। তবু আনন্দ হয় কেন? কারণ, যা কিছু অসুন্দর তা আমাদের মনকে পীড়িত করে।

সৌন্দর্য্যই লক্ষ্মী। সৌন্দর্য্যবোধ যার নেই, সৌন্দর্য্যের প্রতি যার অনুরাগ নেই, সেই তো লক্ষ্মীছাড়া, ধনীর পুত্র হলেও সে লক্ষ্মীছাড়া। আগে গ্রামের লোকে ব্যক্তিবিশেষকে শাস্তি দিত ধোপা নাপিত বন্ধ ক'রে। ধোপা নাপিত লক্ষ্মীরই অনুচর অর্থাৎ এরা দেহের কেশবেশের শ্রী সম্পাদন করে। নাপিতের একটি প্রতিশব্দ নরসুন্দর—আর ধোপার প্রতিশব্দ রজক। এর রাজকীয় অবদানই আমাদের পরিচ্ছদকে রাজকীয় করে তোলে। ধোপানাপিত বন্ধ করার নামই লক্ষ্মীছাড়া করে দেওয়া, শ্রীভ্রষ্ট করে দেওয়া।

শ্রীভ্রংশ সহজ শাস্তি নয়, ঋষিশাপে স্বর্গ শ্রীভ্রষ্ট হয়েছিল ব'লেই লক্ষ্মীকে ফিরিয়ে আপনার জন্য দেবতাদের সমুদ্রমন্থন করতে হয়েছিল।

ধনীর গৃহে লক্ষ্মী থাকেন। ধনীদের গৃহের সাজসজ্জা, তাদের বেশভূষা পরিচ্ছন্ন, সবই তাদের লক্ষ্মীশ্রী মণ্ডিত। সেজন্যই আগে সাধারণ লোকে তাদের শ্রদ্ধা করত, মর্যাদা দিত, এ শ্রদ্ধামর্যাদা ধনীদের কুবেরত্বের প্রাপ্য নয়। প্রাপ্য তাদের লক্ষ্মীশ্রীর। কারণ, লক্ষ্মীশ্রী তাদের চোখ জুড়িয়ে দিত, আনন্দ দিত। সেকালের লোকের সৌন্দর্যবোধ ছিল, তাই তারা লক্ষ্মীশ্রী দেখে হিংসাকে প্রশ্রয় দিত না। হিংসা অতি কুৎসিত বস্তু। ধনিগৃহের সুখসৌভাগ্য, আচার অনুষ্ঠান, উৎসব আমোদের বর্ণনায় কত লোককে আনন্দ পেতে দেখেছি। একালের লোকের তা শুনে হাসি পাবে। ধনিগৃহের লক্ষ্মীশ্রী দরিদ্রদের চিত্তকে প্রফুল্ল করত। আমার মনে হয় সৌন্দর্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক অনুরাগই ধনীদের শ্রদ্ধেয় করে তুলেছিল। এই ধনীদের প্রতি ঈর্ষ্যা জাগিয়ে তুলবার জন্য আজকে কি অসাধ্য সাধনই না করতে হচ্ছে! ধনীদের কাছে কোন প্রত্যাশা না ক'রেই লোকে ধনীদের দ্বারের কাছে ঘোরাঘুরি করেছে, তাদের প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্যবোধকে তৃপ্ত করার জন্য। একেই তারা একটা লাভ মনে করেছে। বরং কেউ সুখে শান্তিতে ছিল, হঠাৎ তার অবস্থাবিপর্যয় বা শোকতাপের কথা শুনলে আমরা ব্যথা পাই—এ ব্যথার সবটাই দরদ নয়, অশিবের রূপে তার গৃহে অসুন্দরের আবির্ভাব হয়েছে, এই কথা ভেবে আমাদের অন্তঃসুপ্ত সৌন্দর্যবোধে

আঘাত লাগে।

সকলের মুখের কথা শুন্‌তে আমাদের ভালো লাগে না। যাদের বাচন-ভঙ্গী সুন্দর, উচ্চারণ শ্রুতিমধুর, ভাষণ নির্দ্দোষ, যাদের কথায় সৌষম্য, পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা আছে তাদের কথাই আমাদের শুন্‌তে ভাল লাগে। প্রিয়জনের মুখের কথা যদি সুন্দর না হয়, তা হলে ভালবাসার দ্বারা তাকে শোধন ক'রে নিয়ে সহনীয় ও ক্ষমণীয় ক'রে তুলতে হয়। যার চরিত্রে, আচরণে, ভাষায়, ভূষায়, চালচলনে পরিচ্ছন্নতা ও সৌষ্ঠব আছে স্বতই সে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করে। ঔদ্ধত্যকে আমরা ভাল বাসি না, কারণ তা কুৎসিত। বিনয় ও ও লজ্জাশীলতা আমাদের চিত্তে তুষ্টি দান করে—কারণ বিনয় সুন্দর। লজ্জা-শীলতায় যে মাধুর্য আছে, প্রগল্‌ভতায় বা ধৃষ্টতায় তা নেই।

সৌন্দর্যের প্রতি আমাদের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। কালচার এই আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলে। কালচার থাকার জন্য দণ্ডভোগ কম করতে হয় না। সুন্দর যেমন তাকে তৃপ্তি দেয়, মুহুর্মুহুঃ অসুন্দর তেমনি তার মনে অস্বস্তির সৃষ্টি করে।

অনেক লেখা যে আমাদের ভালো লাগে না তার কারণ লেখার প্রকাশভঙ্গী সুন্দর নয়। বক্তব্য বিষয়ে কোন দোষ নেই, অঙ্গহানি নেই—কিন্তু বলবার ভঙ্গী অসুন্দর ব'লে তাকে সাহিত্য ব'লে আমরা স্বীকার করতে চাই না।

লেখার ভাষায় ব্যাকরণ ভুল, বানান ভুল, বাক্য গঠনের দোষ ইত্যাদিতে যে আমরা আপত্তি করি, তার কারণ কি? ভাবপ্রকাশে যে ত্রুটী ঘটছে তাত নয়। ঐ সকল দোষগুলি মুখে বসন্তের দাগের ন্যায় চোখে পীড়া দিয়ে, বাণীদেহের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়।

বিষয়বস্তু অপ্রীতিকর, অসুন্দর বা অরোচনীয় হ'লেও রচনায় যদি শৃঙ্খলাশ্রী থাকে এবং প্রকাশভঙ্গী সুন্দর হয় তাহলে তা আমাদের রোচনীয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যে এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে।

ভাষার অস্বচ্ছতা, জটিলতা বা ভুলভ্রান্তির দোষ ধরলে অনেকে মনে করেন অযথা পাণ্ডিত্য বা ছিদ্রান্বেষিতা দেখানো হচ্ছে। এগুলি রচনার অঙ্গে ক্ষতের মত প্রকট হয়ে অস্বস্তির সৃষ্টি করে সেইজন্যই লোকে দোষ ধরে। সৌন্দর্যবোধই এজন্য দায়ী।

সৌন্দর্যবোধ সুনীতির নিয়ামক। আমরা যে অনেক অপকর্ম থেকে স্বতই বিরত হই, তা ধর্মভয় বা পরলোকের ভয়ে নয়, আদালতের ভয়েও নয়। অপকর্ম

মাত্রই অসুন্দর ব'লে। সৌন্দর্যবোধ আমাদের অশ্লীল বা কুৎসিত বাচন থেকে যেমন বিরত করে, তেমনি কদর্যকর্ম থেকেও নিবৃত্ত করে।

ক্রোধ মানুষের মুখশ্রীকে বিকৃত করে দেয়, ক্রোধীর চেহারাকে কুৎসিত করে তোলে। সেজন্যই সৌন্দর্যবোধ আমাদের ক্রোধ সংবরণ করতে শিক্ষা দেয়।

আমরা যে দরিদ্র ভিখারীকে দেখে দয়া করি, তার সঙ্গেও সৌন্দর্যবোধের সম্পর্ক আছে। দরিদ্র ভিখারীর দীন-দশাটাই অসুন্দর। এ অসুন্দর দশা আমাদের সৌন্দর্যবোধকে আঘাত করে। তাতে মনে যে অস্বস্তির সৃষ্টি হয় তার সাময়িক মোচন-চেষ্টাই দয়া।

হিন্দুর ধর্মানুষ্ঠানপরম্পরাকে অনেকে অসভ্যতা বা কুসংস্কার মনে করেন; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে, এগুলি হিন্দু জাতির অসামান্য সৌন্দর্য-বোধেরই সৃষ্টি। হিন্দুদের প্রত্যেক উৎসব কবিত্বময়। আলিপনা, শঙ্খবাদন, পূর্ণঘট, ধূপ-ধুনা, পুষ্প-চন্দন, নৈবেদ্য ইত্যাদি সমস্ত উপচারই একটি সৌন্দর্যের আবেষ্টনী সৃষ্টির জন্য পরিকল্পিত। এজন্য হিন্দুদের উৎসব পার্বণের প্রায় সকল অঙ্গই সুন্দরের পরম পূজারী রবীন্দ্রনাথের কাব্যে স্থান পেয়েছে, খ্রীষ্টান মাইকেলও তাঁর কাব্যে বর্জন করতে পারেননি।

একজন সুস্থ-সবল দীর্ঘায়ত পুরুষ যখন দুর্বল খর্বকায় জনগণের মধ্যে বিচরণ করে, তখন আমরা তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকি সে স্বাস্থ্যশ্রীতে সুন্দর বলে। ঠিক একই কারণে লোকে সুবেশা সুন্দরীদের দিকে চেয়ে দেখে—এর মধ্যে লালসা অপেক্ষা সৌন্দর্যবোধই অধিকতর সক্রিয়। রাজহংস, ময়ূর, হরিণ ইত্যাদির ত কথাই নেই। চিক্কণগাত্র সুপুষ্ট সুবলয়িতাঙ্গ অশ্ব, ধেনু ইত্যাদিকেও বার বার চেয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়। স্বাস্থ্যই যে সৌন্দর্য। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় প্রিয়দর্শন যুবক যে সহজে নির্বাচিত হয় তার কারণ নির্বাচ-কমণ্ডলীর সৌন্দর্যানুরাগ। সব সময় পক্ষপাতিত্ব নয়।

সৌন্দর্যবোধ বা সৌষ্ঠববোধ ন্যায়-নিষ্ঠার রূপও ধরে। আমরা যদি যথাস্থানে যথাযোগ্য ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত দেখতে না পাই, তবে ব্যথা পাই। যদি দেখি অযোগ্য ব্যক্তি উচ্চাসনে বিরাজিত আর সুযোগ্য ব্যক্তি নিম্নাসনে থেকে তার হুকুম তামিল করছে, তাহলে আমাদের ন্যায়নিষ্ঠা আঘাত পায়। এই ন্যায়-নিষ্ঠা সৌন্দর্যবোধেরই রূপান্তর। প্রকৃতপক্ষে স্থানপাত্রের এই যে বিপর্যয় তা অসুন্দর। উচ্চৈঃশ্রবার পৃষ্ঠে অষ্টাবক্র মুনি শোভা পায় না—এমন কি ইন্দ্রের

আসনে বামনরূপী উপেন্দ্রও অসুন্দর। এই অসুন্দরকেই আমরা বলি অন্যায়। যার যেখানে স্থান সেখানেই সে সুন্দর, অন্যত্র সে অশোভন। সঞ্জীবচন্দ্র ঠিকই বলেছেন—বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

অযোগ্যকে যোগ্যতমের স্থানে বসালে বা অযোগ্যকে অযথা সম্মানিত করলে লোকে যে ধিক্কার দেয়—তা হিংসা বশতঃ নয়, অসুন্দর ব'লে। অযোগ্য মনে করে লোকে বুঝি তার অভ্যুদয়ে বুঝি হিংসা করছে।

সৌন্দর্যবোধ শিল্পীদের শিল্প-সৃষ্টিতে, বক্তাদের দেশকালপাত্রোচিত সুভাষণে ও গৃহলক্ষ্মীদের সুগৃহিণীপনায় প্রকট হয়। সাধারণ লোকের মিতভাষণে, মিষ্টভাষণে, রসনাশাসনে, সুন্দর হস্তাক্ষরে, মাত্রাজ্ঞানে, সামঞ্জস্যসাধনে, নিয়ম-নিষ্ঠতায় ও শৃঙ্খলাশ্রীতে পরিস্ফুট দেখা যায়।

প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা নয়, কালচার সুপ্ত সৌন্দর্যবোধকে শুধু প্রবুদ্ধই করে না, তাকে সুপরিণত করে তোলে। যাঁরা কালচার লাভ করেন তাঁরা নিজেদের চারিপাশে সৌন্দর্যের আবেষ্টনীর সৃষ্টি করেন। তাঁরা প্রত্যেক শিল্পের প্রতি অনুরাগী হন এবং কেবল বহিরঙ্গের সৌন্দর্যেই তাঁরা তৃপ্ত হন না। তাঁরা অন্তরের সৌন্দর্যও দেখতে এবং উপভোগ করতে পারেন। জরাজীর্ণ মহাপুরুষদের শ্রীহীন বহিরঙ্গের অন্তরালে মানস সৌন্দর্যে মহিমান্বিত যে সুন্দর পুরুষটি বিরাজ করেন, তিনিও তাঁদের চোখে দীপ্ত হয়ে ওঠেন। অনেক অসুন্দরের মধ্যে তাঁরা সুন্দরকে আবিষ্কার করতে পারেন। প্রকৃতির সৌন্দর্য তাঁরাই পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করেন। গর্ভস্থ শিশু যেমন মায়ের মহিমা উপলব্ধি করে না, তেমনি যারা প্রকৃতির অঙ্কে সঞ্জাত, লালিত ও বর্ধিত তারা প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারে না। কালচার মানুষকে প্রকৃতি থেকে দূরে নগরে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু এই ব্যবধানই তাকে প্রকৃতির প্রতি অনুরাগী ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যথার্থ উপভোক্তা করেও তোলে।
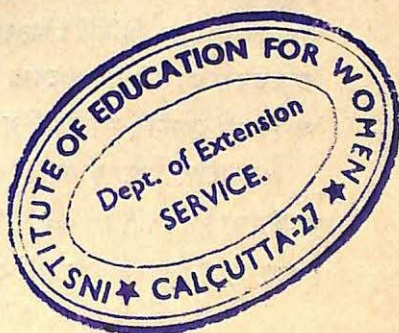
কাব্যের জগৎ

কাব্য হইতে ঐতিহাসিক বা বাস্তব তথ্যের উদ্ধার করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা —কাব্যের জগৎটাই স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলিতে হইলে বলিতে হয় কাব্যের মধ্যে তথ্য না খুঁজিয়া সত্য খুঁজিতে হইবে।

মেঘদূতের—

হস্তে লীলাকমলমলকম্ বালকুন্দানুবিদ্ধম্।
নীতা লোধ্রপ্রসবরজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ ॥
চূড়াপাশে নবকুবরকং চারুকর্ণে শিরীষম্।
সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্ ॥

এই শ্লোক হইতে যদি কেহ সিদ্ধান্ত করে—সেকালে একই সময়ে কমল, কুন্দ, লোধ্র, কুরবক, শিরীষ ও কদম্ব ফুটিত, তাহা হইলে যে ভুল হয়, কাব্যে বাস্তব সত্যের সন্ধান করিতে গেলে অনেক ক্ষেত্রেই সেই ভুল হয়। মনে রাখিতে হইবে, কালিদাসের স্বপ্নপুরীতে সব ফুলই একসঙ্গে ফুটিত। অন্যত্র তাহা সম্ভব নয়। আমাদের দেশের সাহিত্যে সোনার ছড়াছড়ি। সোনার তরী, সোনার খেলনা, সোনার খাট, সোনার থালা, সোনার সিংহাসন,—এমন কি স্বর্ণপুরীর উল্লেখ আছে। তা ছাড়া, ঘরে ঘরে সোনার চাঁদ। তাহাতেও কবিরা তুষ্ট হন নাই। স্পর্শমণির কল্পনা করিয়াছেন। যাহাতে তাহার ছোঁয়া লাগিত তাহাই সোনা হইয়া যাইত। ইহা হইতে গোটা ভারতবর্ষকে 'সোনার লঙ্কা' মনে করা কি চলে? বরং সোনা বড়ই দুর্লভ ছিল বলিয়াই সাহিত্যে সোনার এত আদর, সোনার এত স্বপ্ন। বলা বাহুল্য, স্পর্শমণি কবির স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে কোন বস্তুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু সোনার। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ জগতের বহুদেশকে বহু শিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য যোগাইত; বিনিময়ে অন্যদেশ হইতে তাহার বিশেষ কিছু লইবার ছিল না। ভারতবর্ষ তাহার পণ্য দ্রব্যের বদলে লইত কেবল সোনা। আমাদের দেশের অধিকাংশ সোনাই আসিয়াছিল রোম, মিসর. চীন ইত্যাদি দেশ হইতে।

আমাদের দেশের সাহিত্যে ও শিল্পে গোজাতির মত আর একটি পশুর আধিপত্য খুব বেশি। এই পশুটি সিংহ। সিংহ মহামায়ার বাহন। সিংহদ্বার, সিংহচূড়া, সিংহাসন ইত্যাদি তো আছেই। যেখানেই বিক্রম, তেজস্বিতা,

গৌরবের কথা সেখানেই সিংহ। যদিও এটা ব্যাঘ্রের দেশ; তবু সাহিত্যে ব্যাঘ্রের প্রতিপত্তি তেমন নাই। ক্ষত্রিয়েরা ব্যাঘ্র না হইয়া সিংহ হইতেই চাহিতেন। যাহাদের Royal Bengal Tiger হইবার কথা তাহারাও সিংহ হইয়াই জমিদারি করিয়াছেন। ভারতের বনে এখন সিংহ একেবারে নাই, আগে হয়ত অল্পসংখ্যক ছিল। এ দেশ এমন সিংহসঙ্কুল ছিল না যাহাতে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সিংহের পদচিহ্ন থাকিবে এবং গজেন্দ্রের মাথা চিরিয়া রাশি রাশি গজমুক্তা ছড়াইবে। 'পুংসি শ্রেষ্ঠার্থ বাচকঃ' যতগুলি পশুর নাম আছে তাহাদের মধ্যে সিংহটিই তাহার আকৃতি-গৌরবের ও বিক্রমাতিশয্যের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রাচীন কাব্যে নাট্যে অভিসারিকার কথা বড় বেশি বেশি আছে। ইহা হইতে কেহ যদি সিদ্ধান্ত করেন—ভারতের পুরনারীগণ রাত্রিকালে গৃহত্যাগ করিয়া পুরমার্গ দিয়া পরপুরুষের উদ্দেশে অন্যত্র গিয়া রাত্রি যাপন করিত——তাহা হইলে ভারতীয় নারীদের প্রতি অবিচারই করা হইবে। নদীমাতৃক ভারতবর্ষে কবিদের সবচেয়ে বেশি চোখে পড়িয়াছে—পর্বতগৃহ হইতে নদী-গুলির সাগরোদ্দেশে যাত্রা। তাহা হইতেই নারীদের অভিসারের কথা সাহিত্যের একটা অলঙ্কার ও উপজীব্য হইয়া উঠিয়াছে। কোনো নারী কখনও অভিসারে যাইত না তাহা নহে, তাহা লইয়া এত বেশি ফলাও করিয়া বর্ণনা সাহিত্যের রসশ্রী বর্ধনেরই জন্য। বৈষ্ণবযুগে অভিসার অভিনব অর্থলাভ করিয়াছিল—পরমাত্মার উদ্দেশে জীবাত্মার অভিযাত্রা। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তাহা অনন্তের উদ্দেশে সান্তের অভিগমন।

সাহিত্যে বিমানের উল্লেখ আছে—তাহা হইতে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন—সেকালে ভারতবর্ষে বিমান ছিল। মনে রাখিতে হইবে সাহিত্যেও বিমান মানুষের ছিল না। বিমান ছিল দেবতার, দেবতার শুধু বিমান কেন স্বর্গই তো ছিল, তাহা ছাড়া, তাহাদের জরামৃত্যু ক্ষুধাতৃষ্ণা রোগশোক কিছুই ছিল না। বিমান ছিল ইন্দ্রের। সেই বিমানে রাজারা স্বর্গে যাইতেন—দানব-দের জয় করিয়া ইন্দ্রের আধিপত্যকে নিষ্কণ্টক করিয়া দিতেন। বিমান ছিল কুবেরের, তাহার ভাই রাবণ কুবেরের কাছ হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। কাব্যের জন্যই বাল্মীকির প্রয়োজন হইয়াছিল এই বিমানখানির। রামচন্দ্রকে ২।১ দিনের মধ্যেই অযোধ্যায় প্রেরণ করার জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কালিদাসেরও এই বিমানখানির প্রয়োজন হইয়াছিল কাব্য সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য।

একই পথের ত দুইবার বর্ণনা দেওয়া চলেনা। কালিদাস বিমান হইতে দৃষ্ট লঙ্কা হইতে অযোধ্যার পথের বর্ণনা দিয়াছেন। রামায়ণে ইহার নাম পুষ্পক। ইহাতে কিষ্কিন্ধ্যার সব বানরবানরীর স্থান হইয়াছিল। এই পুষ্পক মানুষের মত কথা শুনিত এবং কথা বলিত। অতএব ইহার বাস্তবতা সম্বন্ধে কথা না তোলাই ভাল। বিমান কেন—ঘোড়ায় টানা রথও ত উড়িয়া যাইত, স্বর্গে উঠিত। এই সব ঘোড়া পক্ষিরাজ ঘোড়া। রাবণও যে রথে উড়িয়া সীতা হরণ করিতে গিয়াছিল—তাহা গাধার রথ। আকাশে যে সব রথ চলাচল করিত সে সব মনোরথ। জানিনা কেহ বলেন কিনা—সেকালে মর্তের মানুষ স্বর্গে যাতায়াতও করিত।

এইবার প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি॥

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে বাঙ্গালার বণিকদের সমুদ্রপথে বাণিজ্যের কথা আছে। সমুদ্রপথে বাঙ্গালী যে বাণিজ্যে যাইত না তাহা নয়, তবে মঙ্গলকাব্যে যে সমুদ্র-পথের কথা আছে তাহাতে বিন্দুমাত্র বাস্তবতা নাই। যে সব পণ্যদ্রব্যের কথা আছে সে সবও অবাস্তব। এই অবাস্তবতা চাঁদসদাগর বা ধনপতি শ্রীমন্তের বাণিজ্যকেও অবাস্তব করিয়া তুলিয়াছে। সাহিত্য হইতে এ দেশের বাণিজ্যের ইতিহাস উদ্ধার করা বিড়ম্বনা। মঙ্গল কাব্যের সিংহলও একটা কল্পরাজ্য মাত্র।

মঙ্গলকাব্যে সতীধর্মের যে সব পরীক্ষার কথা আছে, সেগুলি সবই সহস্রছিদ্র কলসীতে জল আনার মতই। ঐগুলি কাব্যালঙ্কার মাত্র। ঐগুলিতে বাস্তবতার সন্ধান বাতুলতা।

বিদ্যাবত্তার কথায় শ্রীচৈতন্যই হউক আর শ্রীমন্তই হউক সকলকেই সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত বানানো হইয়াছে। যতগুলি শাস্ত্রের নাম কবিরা জানিতেন—সবগুলিই কাব্যের নায়কের স্কন্ধে চাপাইতেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে ঐতিহাসিক সত্য কিছু নাই।

প্রাচীন কাব্যগুলিতে রাজপথে সুপুরুষদর্শনে নারীগণের পতিনিন্দার কথা আছে। তাহা হইতে কোন বিশ্বনিন্দুক যদি বলে—সেকালে বাঙ্গালী নারীদের যদি বা দৈহিক সতীত্ব থাকেও, মানসিক সতীত্ব একেবারেই ছিল না, তাহা হইলে বলিতে হয়—সেকালের কাব্যের রসবোধের সে অধিকারীই নয়। উহা একটা কাব্যের Convention মাত্র, সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই উহা পাওয়া। বাসু ঘোষ, নরহরিদাস ইত্যাদি কবিরা চৈতন্যের রূপ ও হাবভাব দেখিয়া নদীয়ানাগরীদের উন্মাদনার বর্ণনা করিয়াছেন। নদীয়ার কুলবধূদের সম্বন্ধে ইহা হইতে যদি মন্দ

ধারণা কেহ করেন—তবে তাঁহারও বৈষ্ণব সাহিত্যপাঠের অধিকার নাই বলিতে হইবে। এই নদীয়ানাগরীরা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের গোপীদের বাঙ্গালী রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। আধ্যাত্মিক অর্থ ছাড়া ইহার আর কোন অর্থ নাই।

মোটের উপর বক্তব্য—কাব্যের জগৎটাই পৃথক। এ জগতের প্রজাপতি স্বয়ং কবি। এই কাব্যজগতে শুধু মানুষ নয়, এখানে যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, নাগ, দেব, দানব, পরী, গর্ডন, গবলিন, মৎস্যনর, মৎস্যনারী, দেবদূত, ভূতপ্রেত ইত্যাদি বহুজাতীয় জীব আছে। এ জগতে সাপের মাথায় মাণিক জ্বলে, হাতীর মাথায় মুক্তা ফলে, স্বর্গে মর্তে পাতালে আসা যাওয়া চলে, ইতর জীবজন্তু কথা বলে, মানুষের মত আচরণ করে, তপোবনে সিংহেরা বিড়াল কুকুরের মতো অহিংস, বালক সিংহের দাঁত গণে, রাজহংস প্রেমিকপ্রেমিকার দূতের কাজ করে, এমনকি মেঘও দৌত্যভার বহন করে, পর্বতেরা বৈশাখের মেঘের মতো পক্ষভরে উড়িয়া বেড়ায়, বনের হাতী মন্ত্রবলে ধরা দিয়া পোষ মানে। একজন রথী একা সহস্র রথীকে পরাভূত করে, একজন বীর সম্মোহন অস্ত্রে সমস্ত বাহিনীকে নিদ্রামগ্ন করিয়া দিতে পারে, সতী যমরাজকে তর্কে পরাভূত করিয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করাইতে পারে—স্বামীর কঙ্কাল স্বর্গে লইয়া গিয়া দেবতার কৃপায় সতী স্বামীকে সুস্থ সবল দেহে ফিরাইয়া আনিতে পারে, দেবীর কৃপায় ব্যাধ সাতঘড়া সোনা পাইতে পারে, সমুদ্রে কমলে কামিনী আবির্ভূত হইয়া হাতী গিলিয়া উদ্‌গিরণ করিতে পারে, মালিনীর ঘর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত সুড়ঙ্গ কাটিয়া যাতায়াত করা যাইতে পারে—আরও অনেক কিছু হইতে পারে—এই সবের সঙ্গে আমাদের পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তবতার কোন যোগ নাই। কাব্যের রস উপভোগ করিতে হইলে উপকথানুরক্ত সরল বিশ্বাসী বিস্ময়ে বিস্ফারিত মুগ্ধ—শিশুমনটিকে ফিরাইয়া আনিতে হয়।

—শেষ—
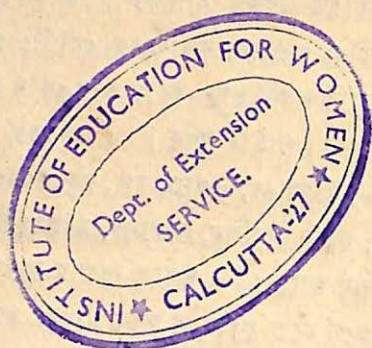
॥ লেখকের অন্যান্য সমালোচনা পুস্তক ॥

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য

বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়

শরৎ-সাহিত্য